ষোড়শ অধ্যায়

মানবাধিকার

অধিকার একটি সামাজিক ধারণা। অধিকার বলতে সেই সমস্ত নাগরিক সুযোগ-সুবিধাকে বোঝানো হয় যা রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত এবং সংরক্ষিত। যদিও স্বাভাবিক অধিকার তত্ত্বের প্রবক্তারা রাষ্ট্র সৃষ্টির পূর্বেই অধিকারের অস্তিত্বের কথা বলেন এবং অধিকার সম্বন্ধে ঐতিহাসিক মতবাদের প্রবক্তাদের মতে দীর্ঘকাল ধরে প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধাগুলিই অধিকার, বাস্তবক্ষেত্রে কিন্তু রাষ্ট্রীয় আইনের স্বীকৃতি ছাড়া কোনো সুযোগ-সুবিধাই অধিকারের মর্যাদা পায় না। অর্থাৎ অধিকারের ধারণার সঙ্গে রাষ্ট্র এবং তার আইনের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ এবং প্রকৃতপক্ষে অধিকার তখনই সংরক্ষণ করা সম্ভব যখন নাগরিকগণ তাদের কর্তব্য সম্বন্ধেও সচেতন এবং যত্নবান, যখন একজনের অধিকারভোগ অপরের অধিকারে হস্তক্ষেপ করে না বা খর্ব করে না।

অধিকারের ধারণাটি প্রাচীন হলেও রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে অধিকার সম্বন্ধে আলোচনা শুরু হয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিকে। ইউরোপ ও আমেরিকাতে মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম ঐ আলোচনার প্রেক্ষাপট হিসেবে কাজ করে। ১৭৮৯ সালের 'ফরাসী অধিকারের ঘোষণা'কে কেন্দ্র করে ব্যক্তি মানুষের অধিকার সংক্রান্ত আলোচনা ও বিতর্ক বৃদ্ধি পায়। উদারনৈতিক চিন্তাভাবনার জগতে ব্যক্তি স্বাধীনতা ও আনুষঙ্গিক অধিকারের ধারণা ক্রমশই কেন্দ্রীয় ধারণায় পরিণত হয়।

মানুষের অধিকারের কথা বলা আর মানবাধিকারের কথা বলা কিন্তু এক ব্যাপার নয়। যে মানবাধিকার নিয়ে বিগত প্রায় ষাট বছর ধরে সারা বিশ্বে বিতর্ক ও আলোচনা চলছে সেই মানবাধিকার বলতে সাধারণত মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাপন ও ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য অপরিহার্য কিছু বিশেষ সুযোগ-সুবিধাকে বোঝানো হয়। রাষ্ট্রীয় অত্যাচার বা অমানবিক আচরণের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত সাধারণ মানুষের মৌলিক অধিকারগুলিকেই বিশেষভাবে মানবাধিকার বলে উল্লেখ করা হয়। কোনো কোনো তাত্ত্বিকের মতে মানবাধিকার হল সাধারণ অধিকারের অন্তর্ভুক্ত কিছু বিশেষ অধিকার। আবার কেউ কেউ মনে করেন মানবাধিকার বলতে মানুষের সেই মৌলিক অধিকারগুলিকে বোঝায় যেগুলি একান্তই মানবিক এবং অন্যান্য সুনির্দিষ্ট, সীমিত এবং সংকীর্ণ অধিকারের থেকে পৃথক। ভারত সরকার কর্তৃক প্রণীত মানবাধিকার সংক্রান্ত আইনে বলা হয়েছে "মানবাধিকার হল ব্যক্তির জীবন, স্বাধীনতা, সাম্য ও মর্যাদা সংক্রান্ত অধিকার যা সংবিধান কর্তৃক স্বীকৃত অথবা আন্তর্জাতিক চুক্তির দ্বারা অনুমোদিত।"

Scanned with CamScanner

রাষ্ট্রীয় শোষণের বিরুদ্ধে নাগরিকদের বিভিন্ন পৌর ও রাজনৈতিক অধিকারের উল্লেখ পাওয়া যায় ইংলন্ডে ১২১৫ সালে গৃহীত 'ম্যাগনা কার্টা' (Magna Carta), ১৬২৭ সালের 'পিটিশন অফ্ রাইট্স্' (Petition of Rights) এবং ১৬৮৮ সালের 'বিল অফ্ রাইট্স্' (Bill of Rights)-এর মধ্যে। অনুরূপভাবে ১৭৮৭ সালে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ফিলাডেলফিয়াতে গৃহীত নাগরিকদের 'বিল অফ্ রাইট্স্' (Bill of Rights) এবং ১৭৯১ সালে ফ্রান্সের 'ডিক্লারেশন অফ্ দ্য রাইট্স্ অফ্ ম্যান এ্যান্ড সিটিজেন্স' (Declaration of the Rights of Man and Citizens) মানবাধিকারের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে।

ইউরোপে মানবাধিকারের ধারণাটি গড়ে ওঠে যুদ্ধবন্দীদের অধিকার সংরক্ষণের বিষয়টিকে কেন্দ্র করে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে পঞ্চদশ লুই ফন্তেনীর যুদ্ধের (১৭৪৫) পরে ঘোষণা করেন যে বিপক্ষের আহত সৈন্যদের প্রতিও যেন তাঁর নিজের সৈন্যদের মতই আচরণ করা হয়। কারণ আহত যুদ্ধবন্দীদের তিনি শত্রু বলে মনে করার বিরোধী ছিলেন। রেডক্রসের প্রতিষ্ঠাতা আঁরি দুনান্ত্ সালফারিনোর যুদ্ধে আহতদের কষ্ট দেখে ১৮৬৩ সালে একটি সম্মেলনের আয়োজন করেন যাতে ১৬টি দেশের প্রতিনিধি যোগ দেন। যুদ্ধবন্দীদের অধিকার সংরক্ষণের বিষয়টি ছাড়াও ধর্মীয় স্বাধীনতা রক্ষা এবং দাসপ্রথা বিলোপের জন্যও বিভিন্ন উদ্যোগ গৃহীত হয়েছিল। ১৬৪৮ সালের ওয়েস্টফালিয়া চুক্তির মাধ্যমে ধর্মীয় স্বাধীনতা স্বীকৃত হয়েছিল। ১৮১৫ সালে ভিয়েনা কংগ্রেসে দাসপ্রথার বিরোধিতা করা হয়। দাসপ্রথা বিলোপের ক্ষেত্রে ১৮৬২-র ওয়াশিংটন চুক্তি, ১৮৬৭ ও ১৮৯০-এর ব্রাসেল্স্ সম্মেলন এবং ১৮৮৫-র বার্লিন সম্মেলন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। ১৮৫৬ সালের পারি ঘোষণা, ১৮৬৪ সালের প্রথম জেনেভা সম্মেলন, ১৯০৬ সালের দ্বিতীয় জেনেভা সম্মেলন, ১৯০৭ সালের হেগ সম্মেলন প্রভৃতি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। জাতি সংঘ (League of Nations) বিভিন্নভাবে মানবাধিকার রক্ষার চেষ্টা করলেও কোনো সুস্পষ্ট ঘোষণার পথে যায়নি।

১৯৪৬ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারি সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের (UNO) অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের অধীনে মানবাধিকার সংক্রান্ত একটি কমিশন গঠন করা হয়। দুইবছরের অধিককাল ধরে আলাপ আলোচনার পর মানবাধিকার সংক্রান্ত খসড়া দলিলটি প্রস্তুত হয়। পরিবর্তন ও পরিমার্জনের পর ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ সভার তৃতীয় অধিবেশনে 'মানবাধিকারের বিশ্বজনীন ঘোষণা'টি (Universal Declaration of Human Rights) গৃহীত

Scanned with CamScanner

হয়। এই ঘোষণায় পশ্চিমী ঐতিহ্য অনুসরণ করে মানুষের সাবেকী ব্যক্তিগত অধিকারগুলি পুনরুচ্চারণের পাশাপাশি বিংশ শতাব্দীর বিশ্ব পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে কিছু বিশেষ অধিকারের দিকেও দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। জীবনের অধিকার, স্বাধীনতার অধিকার, ব্যক্তিগত নিরাপত্তার অধিকার, সম-মর্যাদার অধিকার, সম এবং ন্যায়সঙ্গত আইনী পদ্ধতি প্রয়োগের অধিকার, মতামত গঠন ও মতপ্রকাশের অধিকার, সংঘ গঠন এবং প্রতিনিধিত্বের অধিকারের পাশাপাশি নিপীড়ন ও নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে, অমানবিক ও অমর্যাদাকর ব্যবহার বা শাস্তিপ্রদানের বিরুদ্ধে, রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে এবং রাষ্ট্রের সীমানার বাইরে চলাচলের ক্ষেত্রে এবং রাষ্ট্র ত্যাগ করে বিদেশী রাষ্ট্রের কাছে আশ্রয় প্রার্থনার ক্ষেত্রে অধিকার প্রদান করে এই ঘোষণা মানবাধিকারের ধারণায় নতুন মাত্রা সংযোজিত করে। মানব কল্যাণের জন্য প্রয়োজনীয় বস্তুগত, মানসিক, মনস্তাত্ত্বিক এবং নৈতিক বিষয়গুলির দিকে নজর রেখে এই অধিকারগুলি ঘোষিত হয়। ঘোষণাতে খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, স্বাস্থ্য, সামাজিক নিরাপত্তা ও কর্মের অধিকার, উপযুক্ত পারিশ্রমিকের অধিকার, অবসরের অধিকার, শিক্ষার অধিকার, শ্রমিক সংঘ গঠনের অধিকার প্রভৃতি সেইসব অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক অধিকারের কথা বলা হয় যেগুলি দ্বিতীয় প্রজন্মের অধিকার রূপে পরিচিত। মা এবং শিশুদের জন্যও সুনির্দিষ্ট মানবাধিকারের সংস্থান রাখা হয়। 'মানবাধিকারের বিশ্বজনীন ঘোষণা'য় একদিকে যেমন উনবিংশ শতাব্দীর উদারনৈতিক চিন্তাভাবনার প্রভাব লক্ষ করা যায় তেমনি পাশাপাশি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সংঘটিত সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মুক্তি আন্দোলন এবং সমাজতান্ত্রিক আদর্শের মধ্যে নিহিত আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলনও দেখা যায়।

মানবাধিকারের ঘোষণা ছাড়াও ১৯৬৬ সালে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণসভা সর্বসম্মতভাবে দুটি আন্তর্জাতিক চুক্তিপত্র (Covenant) গ্রহণ করেন। একটি ছিল অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক অধিকার সংক্রান্ত, আর দ্বিতীয়টি ছিল পৌর এবং রাজনৈতিক অধিকার সংক্রান্ত। এছাড়াও সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ বিভিন্ন সময়ে মানবাধিকারের বিভিন্ন দিকের ওপর সম্মেলনের (Convention) আয়োজন করে। ১৯৫১ সালে আয়োজিত গণহত্যার (Genocide) অপরাধে অপরাধীদের শাস্তিবিধানের জন্য আয়োজিত সম্মেলন, বেশ্যাবৃত্তি (Prostitution) বন্ধের জন্য আয়োজিত সম্মেলন (১৯৫১), বাধ্যতামূলক শ্রমদান (Forced labour) বন্ধ করার লক্ষ্যে আয়োজিত সম্মেলন (১৯৫১), বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে আয়োজিত সম্মেলন (১৯৭৬), মহিলাদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণের বিরুদ্ধে সম্মেলন (১৯৮১), অত্যাচার এবং নিষ্ঠুর শাস্তিপ্রদানের বিরুদ্ধে সম্মেলন (১৯৮৪) এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার সংক্রান্ত সম্মেলন (১৯৮৬) এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

Scanned with CamScanner

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ঐ চুক্তিপত্র দুটির অংশীদার হতে এবং সম্মেলনগুলিতে অংশ নিতে অসম্মত হয়। যে সকল দেশ সম্মতি জানায় তারাও অধিকাংশ সময় এই সব অর্থনৈতিক সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক অধিকারগুলিকে কার্যকর করার ক্ষেত্রে ঔদাসীন্য দেখায়। ১৯৪৮ সালের মানবাধিকার ঘোষণার সময় থেকেই একটা পরিবর্তন লক্ষণীয়, যা চুক্তিপত্র এবং বিভিন্ন সম্মেলনের মধ্য দিয়েও প্রকাশিত—সমগ্র বিশ্বেই অধিকার আর শুধুমাত্র সুবিধাভোগী সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর অধিকার না হয়ে সাধারণ, নিপীড়িত, শোষিত ও প্রান্তিক মানুষের অধিকারে পরিণত হয়েছে। অধিকার এখন আর বৈষম্য ও শোষণ বজায় রাখার মাধ্যম নয়, শোষণ থেকে মুক্তির হাতিয়ারে পরিণত, যার লক্ষ্য বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের জন্য সুযোগ-সুবিধার সমতা প্রতিষ্ঠা।

মানবাধিকার রক্ষার ব্যাপারে ভারতের অতীত ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যাবে যে ১৯১৮ সালে বম্বেতে অনুষ্ঠিত ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে একটি অধিকারের ঘোষণা (Declaration of Rights) গৃহীত হয়। ঐ ঘোষণাতে বাক্ ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা, সমবেত হবার অধিকার, আইন অনুসারে বিচার পাবার অধিকার এবং বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে অধিকারের কথা বলা হয়। দাবিপত্রের আকারে এই ঘোষণাটি ব্রিটিশ পার্লামেন্টের কাছে পেশ করা হয় যাতে মন্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড সংস্কারের মাধ্যমে ভারতের জন্য যে নতুন সংবিধান রচিত হবে তাতে যেন ঐ অধিকারগুলি স্থান পায়। কংগ্রেসের 'অধিকারের ঘোষণার' উত্তরে জারি হয় দমনমূলক কুখ্যাত রাওলাট আইন। পাঞ্জাবে সামরিক আইন চালু করা হয় এবং জালিয়ানওয়ালাবাগে মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়। হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'নাইট' উপাধি ত্যাগ করেন। ১৯২৫ সালের এপ্রিল মাসে কংগ্রেস একটা নতুন 'ঘোষণাপত্র' গ্রহণ করে, যাতে অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার অধিকার, লিঙ্গসাম্য এবং বিবেক ও ধর্মাচরণের স্বাধীনতার কথা বলা হয়। এইভাবে রাজনৈতিক অধিকারের পাশাপাশি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারের দাবিও গুরুত্ব পায়। ১৯২৮-২৯-এ ভারতীয় সংবিধানের ওপর 'নেহরু প্রতিবেদনে' (Nehru Report) বিতর্কিত সম্পত্তির অধিকারের পাশাপাশি শ্রমিক সংঘ গঠনের অধিকারও স্থান পায়।

নেহরুর উদ্যোগে ১৯৩৬ সালের ২৪শে অগস্ট বম্বেতে 'দ্য ইন্ডিয়ান সিভিল লিবার্টিজ ইউনিয়ন' (ICLU) প্রতিষ্ঠিত হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ইউনিয়নের প্রথম সভাপতি, সরোজিনী নাইডু কার্যকরী সভাপতি এবং কে. বি. মেনন সাধারণ সম্পাদক হন। বম্বে, কলকাতা, মাদ্রাজ এবং পাঞ্জাবে ইউনিয়নের শাখা স্থাপিত হয়। সরকারের বিরোধিতা, রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের বিরোধিতাই ছিল ঐ সংগঠনের ঘোষিত

Scanned with CamScanner

লক্ষ্য। ঔপনিবেশিক শাসক এবং দেশীয় নৃপতিদের (Princely States) হাতে রাজনৈতিক কারণে বন্দী ব্যক্তিদের ব্যাপারে, পুলিশী অত্যাচারের বিরুদ্ধে, নাগরিক অধিকার সংকোচনের বিরুদ্ধে অনুসন্ধান করে প্রতিবেদন তৈরি করার মাধ্যমে মানবাধিকার রক্ষার ব্যাপারে চেতনা জাগ্রত করার ক্ষেত্রে ইউনিয়ন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ১৯৩৭ সালে নির্বাচনের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকার গঠনের পর নাগরিকদের পৌর অধিকার রক্ষার ব্যাপারে সচেতন থাকার জন্য কংগ্রেস একটি নির্দেশিকা পাঠায় যদিও কংগ্রেস শাসিত রাজ্যেও নাগরিক অধিকার ভঙ্গের ঘটনা ঘটতে থাকে।

স্বাধীন ভারতের সংবিধান প্রণয়নের সময় সংবিধানে মৌলিক অধিকারের অন্তর্ভুক্তির ব্যাপারে গণপরিষদের (Constituent Assembly) বিভিন্ন সভায় দীর্ঘ আলোচনা এবং বিতর্ক হয়। ফলস্বরূপ ১৯৫০ সালে যখন সংবিধান চালু হয় তখন একটি অধ্যায় জুড়ে মৌলিক অধিকারের কথা লিপিবদ্ধ করা হয়। স্বাধীনতা লাভের সময় দেশের সাধারণ মানুষ আশা করেছিলেন যে দীর্ঘ ঔপনিবেশিক শাসনের অবসানে তাদের মৌলিক চাহিদাগুলি পূরণ হবে, তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষাগুলি বাস্তবে রূপায়িত হবে। কিন্তু সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত দেশের কর্ণধাররা দেশের ঐক্য এবং অখণ্ডতা রক্ষার স্বার্থে নাগরিকদের একান্ত প্রয়োজনীয় অধিকারগুলিকেও প্রয়োজনে নিয়ন্ত্রণ করার কথা ভাবেন। মাদ্রাজে ১৯৪৯ সালে অনুষ্ঠিত 'সিভিল লিবার্টিজ কনফারেন্সে' সাধারণ মানুষের এই হতাশার ছবিটি ফুটে ওঠে। ব্রিটিশ শাসনকালে যেটুকু সীমিত অধিকার ভারতীয়রা ভোগ করতেন স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরে সেগুলির ব্যাপারেও অনিশ্চয়তা দেখা দেয়।

পশ্চিমবঙ্গে কমিউনিস্ট আন্দোলনের ওপর খড়্গ নেমে আসে। কমিউনিস্ট পার্টিকে নিষিদ্ধ করা হয়। দলীয় সদস্য এবং সমর্থকদের ওপর রাষ্ট্রীয় দমন-পীড়ন শুরু হয়। কমিউনিস্টদের উদ্যোগেই রাজ্যে 'সিভিল লিবার্টিজ কমিটি' (CLC) গঠিত হয়। কমিটি মেঘনাদ সাহা, শরৎচন্দ্র বসু, এন. সি. চ্যাটার্জী প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সমর্থন লাভ করে। রাষ্ট্রের স্বৈরতান্ত্রিক আচরণ এবং মানবাধিকার হরণের বিরুদ্ধে তাঁরা সোচ্চার হন। ১৯৬০-এর দশকের শেষদিকে ভারতের বিভিন্ন অংশে, বিশেষত পশ্চিমবঙ্গ ও অন্ধ্রপ্রদেশে নকশালবাড়ী আন্দোলনের সময় জঙ্গী আন্দোলন এবং রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস নতুন মাত্রা পায়। 'শ্রেণী শত্রু খতম' করার নামে এবং পুলিশের সঙ্গে মিথ্যা লড়াইয়ের অজুহাতে বহু ব্যক্তির জীবনের অধিকার ছিনিয়ে নেওয়া হয়। এই প্রেক্ষাপটে ১৯৭২ সালে কলকাতায় 'এ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য প্রোটেকশন অফ ডেমোক্র্যাটিক রাইট্‌স্' (APDR) এবং ১৯৭৪ সালে 'অন্ধ্রপ্রদেশ সিভিল লিবার্টিজ কমিটি' (APCLC) গঠিত হয়।

Scanned with CamScanner

মানবাধিকার ভঙ্গের ঘটনাগুলিকে জনসমক্ষে তুলে ধরা এবং তার বিরুদ্ধে যথাসম্ভব প্রচার সংগঠিত করার মধ্যেই ঐ সংগঠনগুলির কাজ সীমাবদ্ধ ছিল।

১৯৭৫ সালের ২৫শে জুন ভারতে জরুরী অবস্থা জারি হয়। ৫ই অগস্ট এ পি ডি আর নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। এ পি সি এল সি-কে নিষিদ্ধ করা না হলেও, সংগঠনের বহু সদস্যকে কারারুদ্ধ করা হয়। জরুরী অবস্থা চলাকালীন ভারতীয় নাগরিকদের মতপ্রকাশের স্বাধীনতার ওপর যে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয় তার ফলে বিভিন্ন দল ও মতের নাগরিকদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। মানবাধিকার রক্ষার প্রশ্নটি সর্বভারতীয় এবং জাতীয় রূপ পায়। গণতান্ত্রিক অধিকার সম্বন্ধে সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে চেতনা বৃদ্ধি পায়। ১৯৭৪ সালের ১৩ এবং ১৪ই এপ্রিল দিল্লিতে একটি সর্বভারতীয় সম্মেলনে আইন এবং শিক্ষা জগতের বহু মানুষ 'সিটিজেন্স ফর ডেমোক্র্যাসি' (CFD) নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। সংগঠনের নেতৃত্ব মূলত আইনী পথে গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার কথা ভেবেছিলেন, অথচ জরুরী অবস্থা চলাকালীন আইনী পথে সাফল্য লাভের সম্ভাবনা ছিল খুবই কম। কোনো রাজনৈতিক দলের সদস্যকে সি এফ ডি-র কোনো গুরুত্বপূর্ণ পদে বসতে দেওয়া হয়নি। সংগঠনের সীমাবদ্ধতা অচিরেই এক নতুন সর্বভারতীয় মঞ্চের জন্ম দেয়। ১৯৭৬ সালের অগস্ট মাসে জয়প্রকাশ নারায়ণের উদ্যোগে 'পিপল্‌স্ ইউনিয়ন ফর সিভিল লিবার্টিজ' (PUCL) গঠিত হয়। ভারতের প্রায় সমস্ত রাজ্যেই পি ইউ সি এল-এর শাখা খোলা হয়। বম্বেতে ১৯৭৭ সালে প্রতিষ্ঠিত 'কমিটি ফর দ্য প্রোটেকশন অফ ডেমোক্র্যাটিক রাইট্‌স্' (CPDR), ১৯৭৭ সালে পশ্চিমবঙ্গে পুনরুজ্জীবিত এ পি ডি আর এবং ১৯৭৮ সালে অন্ধ্রে পুনর্গঠিত এ পি সি এল সি-র সঙ্গে সহযোগিতায় পি ইউ সি এল নাগরিক অধিকার রক্ষায় সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে। জরুরী অবস্থা প্রত্যাহৃত হলে রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির লক্ষ্যে সংগঠনগুলি সরব হয়। পশ্চিমবঙ্গে 'বন্দীমুক্তি ও গণদাবি প্রস্তুতি কমিটি' নামে একটি পৃথক সংগঠন গড়ে ওঠে। দিল্লিতে পি ইউ সি এল ভেঙে 'পিপল্‌স্ ইউনিয়ন ফর ডেমোক্র্যাটিক রাইট্‌স্' (PUDR) গঠিত হয়। উত্তর-পূর্বাঞ্চলে নাগাল্যান্ডে 'নাগা পিপল্‌স্ মুভমেন্ট ফর হিউম্যান রাইট্‌স্' (NPMHR) আত্মপ্রকাশ করে। পশ্চিমবঙ্গের এ পি ডি আর, বম্বের সি পি ডি আর, অন্ধ্রের এ পি সি এল সি-র সঙ্গে এই নবগঠিত সংগঠনগুলি ১৯৮০-র দশকের শুরু থেকেই ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে মানবাধিকার ভঙ্গের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ওঠে। রাষ্ট্রের হাতে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হবার বিরুদ্ধে, পুলিশের হেফাজতে অত্যাচার এবং মৃত্যুর বিরুদ্ধে, বিনা বিচারে আটক করা বা গণ-আন্দোলনের ওপর পুলিশের গুলি চালনার প্রতিবাদে এই সময় বিভিন্ন আন্দোলন সংগঠিত হয় এবং

Scanned with CamScanner

আইনের পথেও সরকারের অন্যায় কাজকর্মের প্রতিবাদ করা হয়। জরুরী অবস্থার পরবর্তী সময়ে মানবাধিকার সংগঠনগুলি শুধুমাত্র নাগরিকদের রাজনৈতিক অধিকার রক্ষার ব্যাপারে মাথা না ঘামিয়ে গরিব মানুষ, ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, মহিলা এবং শিশুদের প্রতি সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়। ব্যক্তিগত অধিকারের পাশাপাশি সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীগত অধিকারের ব্যাপারেও সচেতনতা বৃদ্ধি পায়।

IPHRC

১৯৮৭ সালে 'দ্য ইন্ডিয়ান পিপ্‌ল্‌স্ হিউম্যান রাইট্‌স্ কমিশন' গঠিত হয়। কমিশন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিদের নিয়ে 'ট্রিবুনাল' গঠন করে বিভিন্ন মানবাধিকার ভঙ্গের ঘটনার অনুসন্ধানের ব্যবস্থা করে। ১৯৯৩ সালে অর্ডিন্যান্সের মাধ্যমে 'মানবাধিকার রক্ষা আইন' (The Protection of Human Rights Act) চালু করা হয়। ঐ বছরই ভারতের জাতীয় মানবাধিকার কমিশন (National Human Rights Commission) গঠিত হয়।

UNDP

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সদস্য দেশগুলির মধ্যে ১৭৩টি দেশকে নিয়ে প্রকাশিত ইউ এন ডি পি-র মানবাধিকার সূচক অনুসারে ভারতের স্থান ১২৩টি দেশের পরে। পাকিস্তানের অবস্থান ১৩৮ নম্বরে, ভুটান ১৪০, নেপাল ১৪২ এবং বাংলাদেশ ১৪৫ নম্বরে থাকলেও শ্রীলঙ্কার স্থান ৮৯ এ আর চীন ৯৬ নম্বরে। তালিকার প্রথম ২০টি দেশের অধিকাংশই ইউরোপের। সবার ওপরে রয়েছে নরওয়ে, তারপর সুইডেন, ক্যানাডা, বেলজিয়াম, অস্ট্রেলিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। আর তালিকার নীচের দিকের দেশগুলি মূলত আফ্রিকার, সবার শেষে রয়েছে সিয়েরা লিওন। এই তালিকা থেকে আর কিছু না হোক এটা পরিষ্কার বোঝা যায় যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের তুলনায় ভারতে মানবাধিকার রক্ষার ব্যাপারে যথেষ্ট ঘাটতি রয়েছে।

ভারতে আজকাল প্রায়শই মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ শোনা যায়। সর্বভারতীয় বা রাজ্যভিত্তিক মানবাধিকার কমিশনে অভিযোগ নথিভুক্ত হয়। সেই নিয়ে অনুসন্ধান কার্য চলে এবং কমিশনের মতামত প্রতিবেদন আকারে প্রকাশিতও হয়। অধিকাংশ সময়েই অভিযুক্ত হয় রাষ্ট্র, রাষ্ট্রের সরকার, সরকারের অধীনস্ত সৈন্যবাহিনী বা পুলিশ বাহিনীর কর্মীরা। রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস, রাষ্ট্রীয় অত্যাচার নিন্দনীয়। কিন্তু অনেক সময়েই অনুচ্চারিত থেকে যায় সাধারণ মানুষের অধিকার হরণের কাহিনী। যাঁর অধিকার হরণ করে রাষ্ট্রযন্ত্র দোষী, সেই ব্যক্তিই হয়ত রাজনৈতিক বা আদর্শগত কারণে অন্যব্যক্তির অধিকারে হস্তক্ষেপ করতে দ্বিধাবোধ করেননি। কে 'সন্ত্রাসবাদী' আর কে 'বিপ্লবী' হিসেবে চিহ্নিত হবে, নির্ভর করে দৃষ্টিভঙ্গির ওপর। কোন্‌টা সন্ত্রাস আর কোন্‌টা 'জিহাদ' বা ধর্মযুদ্ধ তা কে বলে দেবে?

Scanned with CamScanner

রাজনৈতিক কারণেই হোক বা ধর্মীয় কারণেই হোক মানবহত্যা মানবহত্যাই। মানুষের জীবনধারণের অধিকার তার প্রাথমিক অধিকার—নিরপেক্ষ বিচারে সেই অধিকার হরণের ছাড়পত্র কাউকেই দেওয়া যায় না। রাজনৈতিক কারণে খুন হয়ে যাওয়া সাধারণ গ্রাম্য কৃষকের মৃত্যু নিয়ে আমরা যতটা সরব, মানবাধিকার কমিশন যতটা চিন্তিত, তার চেয়ে অনেক বেশি আলোড়ন ওঠে রাজনৈতিক মতাদর্শের কারণে শহরে বুদ্ধিজীবীর উপর পুলিশী অত্যাচার হলে।

ইংরেজ আমলে সশস্ত্র বিপ্লবীদের আক্রমণে অত্যাচারী শাসকের পাশাপাশি অনেক নিরপরাধ, নিরীহ বিদেশী প্রাণ হারিয়েছেন। বিপ্লবী কর্মকাণ্ড পূজিত হয়েছে স্বাধীনতাকামী ভারতবাসীর ঘরে ঘরে, কিন্তু সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ হিসেবে নিন্দিত হয়েছে বিদেশী শাসকের চোখে। নকশাল আন্দোলনের সময় কলকাতার রাস্তায় নিরস্ত্র ট্র্যাফিক পুলিশের হত্যা কারুর কাছে হতে পারে প্রতীকী, হতে পারে শ্রেণী শত্রু খতম করার পরিকল্পনার অংশ বিশেষ, হতে পারে বিপ্লবের অঙ্গ, কিন্তু কে জানতে গেছে রাষ্ট্রযন্ত্রের অংশ বিশেষ পুলিশ কর্মীটির কাছে পুলিশের চাকরি নেহাতই একটা চাকরি, জীবন ধারণের উপায় মাত্র ছিল কি না। তার প্রাণ হরণ করে শুধু তার নয় তার নিকট আত্মীয় পরিজনের অধিকারেও কিন্তু হস্তক্ষেপ করা হল। তার শিশু পুত্রটির সুস্থ ভাবে বড় হয়ে ওঠার অধিকার কিন্তু খর্ব করা হল। তাই মানবাধিকারের আলোচনায়, মানবাধিকার রক্ষার প্রশ্নে দৃষ্টিকোণের প্রশ্নটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

Scanned with CamScanner

MDC/IDC
Human Rights

মানব পরিবারের সকল সদস্যের জন্য সার্বজনীন, সহজাত, অহস্তান্তরযোগ্য এবং অলঙ্ঘনীয় অধিকারই হলো মানবাধিকার। **মানবাধিকার** প্রতিটি মানুষের এক ধরনের অধিকার যেটা তার জন্মগত ও অবিচ্ছেদ্য। মানুষ এ অধিকার ভোগ করবে এবং চর্চা করবে। তবে এ চর্চা অন্যের ক্ষতিসাধন ও প্রশান্তি বিনষ্টের কারণ হতে পারবে না। মানবাধিকার সব জায়গায় এবং সবার জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য। এ অধিকার একই সাথে সহজাত ও আইনগত অধিকার। স্থানীয়, জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক আইনের অন্যতম দায়িত্ব হল এসব অধিকার রক্ষণাবেক্ষণ করা।[১] যদিও অধিকার বলতে প্রকৃতপক্ষে কি বোঝানো হয় তা এখন পর্যন্ত একটি দর্শনগত বিতর্কের বিষয়।[২] বিশ্বব্যাপী মানবাধিকারের বিষয়টি এখন আরো প্রকটভাবে অনুভূত হচ্ছে, যখন আমরা দেখছি যে, মানুষের অধিকারসমূহ আঞ্চলিক যুদ্ধ, সংঘাত, হানাহানির কারণে বার বার লংঘিত হচ্ছে। **প্রথমত** একটি পরিবার ও সমাজের কর্তারা তাদের অধিনস্তদের অধিকার রক্ষা করবে। **দ্বিতীয়ত** রাষ্ট্র এবং **তৃতীয়ত** আর্ন্তজাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ মানবাধিকার রক্ষায় ভূমিকা পালন করে থাকে।

মানবাধিকার হচ্ছে কতগুলো সংবিধিবদ্ধ আইন বা নিয়মের সমষ্টি, যা মানব জাতির সদস্যদের আচার আচরণ ও বিশেষ বৈশিষ্ট্যকে বুঝায় এবং যা স্থানীয় ও আর্ন্তজাতিক আইন সমষ্টি দ্বারা সুরক্ষিত যা মৌলিক অধিকারের অবিচ্ছেদ্য অংশ বিষয় হিসেবে ধর্তব্য।[৩] এতে কোন মানুষ এজন্য সংশ্লিষ্ট অধিকার ভোগ করবে যে, সে জন্মগতভাবে একজন মানুষ।[৪] অন্যকথায় বলা যায়, দৈনন্দিন জীবনে চলার জন্য মানুষের যেসকল অধিকার রাষ্ট্রের সংবিধান কর্তৃক স্বীকৃত তাদেরকে মানবাধিকার বলে
জাতিসংঘের Universal Declaration of Human Rights এর ১ম অনুচ্ছেদে লেখা রয়েছে যে,

All human beings are born free and equal in dignity and rights.

অর্থাৎ 'জন্মগতভাবে সকল মানুষ স্বাধীন এবং সমান সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী।'[৫] বর্তমান বিশ্বে Human Rights শব্দটি বহুল আলোচিত ও বহুল প্রচলিত একটি শব্দ। মানবাধিকারের বিষয়টি স্বতঃসিদ্ধ ও অলঙ্ঘনীয় হলেও সভ্যতার ঊষালগ্ন থেকেই এ নিয়ে চলছে বাক-বিতণ্ডা ও দ্বন্দ্ব-সংঘাত। একদিকে মানবাধিকারের সংজ্ঞা ও সীমারেখা নিয়ে বিতর্কের ঝড় তোলা হচ্ছে, অন্যদিকে মতাধর শাসকরা দেশে দেশে জনগণের স্বীকৃত অধিকারগুলো পর্যন্ত অবলীলায় হরণ ও দমন করে চলছে। আর দুর্বল জাতিগুলোর সাথে সবল জাতিগুলোর আচরণ আজকাল মানবাধিকারকে একটি উপহাসের বস্তুতে পরিণত করেছে।[৬]

মানবাধিকারের ক্রমবিকাশ

সাইরাস সিলিন্ডার

৫৩৯ খ্রিস্টপূর্বাব্দে পারস্যের রাজা দ্বিতীয় সাইরাস যিনি সাইরাস দ্য গ্রেট'নামে সমধিক পরিচিত ব্যাবিলন আক্রমণ করেন। ব্যাবিলন আক্রমণের পর তিনি ব্যাবিলনীয়দের দ্বারা নির্যাতিত দাস জনগোষ্ঠীকে মুক্ত করে দেন। তাদের নিজ নিজ দেশে প্রত্যাবর্তনেরও ব্যবস্থা করে দেন। অতঃপর সাইরাসের নির্দেশে একটি সিলিন্ডার তৈরি করা হয়। যা সাইরাস সিলিন্ডার নামে অভিহিত। এতে

সাম্রাজ্যজুড়ে ধর্মীয় স্বাধীনতা, সহিষ্ণুতা ও মানবাধিকার বাস্তবায়নের কথা বলা হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের দাবি, এটিই বিশ্বের প্রথম মানবাধিকার সনদ।

মদীনা সনদ

মানবাধিকারের প্রধান ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল ৬২২ খ্রিষ্টাব্দে মহানবী কর্তৃক মদীনা সনদ ঘোষণার মধ্য দিয়ে। মদীনা সনদকে পৃথিবীর প্রথম পূর্ণাঙ্গ লিখিত সংবিধান হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে। এ সনদে মোট ৪৭ টি অনুচ্ছেদ রয়েছে যেগুলোতে মানবাধিকারের বিষয়গুলো সর্বপ্রথম সুস্পষ্টভাবে বিবৃত করা হয়েছে। উল্লেখযোগ্য অনুচ্ছেদসমূহ:

- সনদে স্বাক্ষরকারী সকল সম্প্রদায় একটি সাধারণ জাতি গঠন করবে এবং সব সম্প্রদায় সমান নাগরিক অধিকার ভোগ করবে।
- সব নাগরিক পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা ভোগ করবে। কেউ কারো ধর্মে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না।
- নাগরিকদের অধিকার ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা রাষ্ট্র নিশ্চিত করবে।
- সকল প্রকার রক্তক্ষয়, হত্যা ও ধর্ষণ নিষিদ্ধ।
- কোনো লোক ব্যক্তিগত অপরাধ করলে তা ব্যক্তিগত অপরাধ হিসেবেই বিবেচিত হবে। তার কারণে অপরাধীর সম্প্রদায়কে দায়ী করা যাবে না।
- দুর্বল ও অসহায়দের সর্বোতভাবে সাহায্য সহযোগিতা করতে হবে।

ম্যাগনা কার্টা

মানবাধিকারের ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রে ম্যাগনা কার্টাকে একটি মাইলফলক হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। এটি মানবাধিকারের মহাসনদ হিসেবে ইতিহাসে অভিহিত। এটি ছিলো মূলতঃ ইংল্যান্ডের রাজা জন ও ধনী বিত্তশালী ব্যারনদের মধ্যে ১২১৫ সালে সম্পাদিত একটি চুক্তি। এতে নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছিলো যে, জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাউন্সিলের পূর্ব অনুমতি ব্যতিরেকে খামখেয়ালীভাবে জনগণের উপর কর আরোপ করা যাবেনা। রাজকর্মকর্তারা যথেচ্ছভাবে জনগণের ভূ-সম্পত্তি অধিগ্রহণ করতে পারবে না।ব্যাবসায়ীরা রাজ্যের মধ্যে ইচ্ছেমতো একস্থান হতে অন্য স্থানে চলাফেরা করতে পারবে। কোনো স্বাধীন মানুষকে বিচারিক রায় বা দেশীয় আইনানুযায়ী ব্যতীত গ্রেপ্তার, কারারুদ্ধকরণ, সম্পত্তিচ্যুত, দীপান্তরিত বা নির্বাসিত কিংবা হয়রানির শিকার করা যাবে না।

এই ম্যাগনা কার্টা চুক্তির মধ্য দিয়েই সংসদীয় গণতন্ত্রের পাশাপাশি আইনের শাসনের ধারণার যাত্রাও শুরু হয়। এই ঐতিহাসিক সনদেই বিশ্ব ইতিহাসে সর্বপ্রথম ঘোষণা করা হয় কোনো দেশের রাজাসহ সে দেশের সকলেই রাষ্ট্রীয় আইনের অধীন, কেউই আইনের ঊর্ধ্বে নন। প্রজাদের অধিকার ও রাজার ক্ষমতা হ্রাসের যৌক্তিক এ দলিল পরবর্তীতে যুক্তরাষ্ট্রসহ বহুদেশে মানবাধিকার ও জনগণের ক্ষমতায়নে গুরুত্বপূর্ণ পথনির্দেশক হিসেকে কাজ করেছে।

পিটিশন অব রাইটস

১৬শ শতকে ব্রিটিশ জনগণের আন্দোলনের ফলে প্রথম যে তাৎপর্যপূর্ণ দলিলের সৃষ্টি হয় তা পিটিশন অব রাইটস নামে অভিহিত। ১৬২৮ সালে পিটিশন অব রাইটস সংসদ কর্তৃক আইনের আকারে গৃহীত হয়েছিলো। পার্লামেন্টের সম্মতি ছাড়া করারোপ, বিনা অপরাধে কারারুদ্ধকরণ, ব্যক্তিগত বাসস্থানে স্বেচ্ছাচারী অনুপ্রবেশ এবং সামরিক আইনের প্রয়োগ থেকে জনগণকে সুরক্ষা প্রদান করেছিলো মানবাধিকারের এ গুরুত্বপূর্ণ দলিলটি।

বিল অব রাইটস

১৬৮৯ সালে বিল অব রাইটস ব্রিটিশ পার্লামেন্টে গৃহীত হয় ও বিধিবদ্ধ আইনে রূপান্তরিত হয়। মানুষের মৌলিক মানবাধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দলিল। প্রখ্যাত ফরাসী দার্শনিক ভল্টেয়ারের মতে, বিল অব রাইটস প্রত্যেক মানুষকে সেই সমস্ত প্রাকৃতিক অধিকার পুনরুদ্ধার করে দিয়েছে যেগুলো থেকে তারা যুগ যুগ ধরে বিভিন্ন শাসক থেকে বঞ্চিত ছিলো। যেমনঃ জীবন ও সম্পত্তির পূর্ণ স্বাধীনতা, লেখনী দ্বারা জাতির নিকট কথা বলার অধিকার, স্বাধীন লোকদের দ্বারা গঠিত জুরি ছাড়া আর কারো দ্বারা ফৌজদারী অভিযোগে বিচারের সম্মুখীন না হওয়ার স্বাধীনতা এবং শান্তিপূর্ণভাবে যেকোনো ধর্ম পালনের স্বাধীনতা। শুধু তাই নয়, বিল অব রাইটস ঘোষণা করে, পার্লামেন্টের পূর্বানুমতি ব্যতিরেকে রাজা যদি কোনো আইনকে স্থগিত বা ভঙ্গ করেন অথবা রাজা তার খরচের জন্য ইচ্ছেমত করারোপ করেন বা রাজ-কমিশন বা রাজ-আদালত গঠন করেন তাহলে এগুলো হবে বেআইনি ও ধ্বংসাত্মক।

মানবাধিকার মানবাধিকারের ধারণাটি আঠারো শতকে প্রযুক্তি ও বিজ্ঞানের বিকাশকালের ফসল। তবে সমসাময়িক মানবাধিকারের ধারণার উদ্ভব ঘটেছে সাম্প্রতিক কালে। মৌলিক অধিকারের ধারণার বিকাশ ঘটে মূলত 'সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্র' (ইউডিএইচআর)-এর মাধ্যমে, যা ১৯৪৮ সালের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর ধ্বংসযজ্ঞের অভিজ্ঞতা থেকে জাতিসংঘ কর্তৃক একটি সনদ হিসেবে গৃহীত হয়। তবে মানবাধিকারের আলোচনা বিশ্বব্যাপি প্রসার লাভ করে বিশ শতকের চল্লিশ থেকে নব্বইয়ের দশকের মধ্যবর্তী কোনো এক সময়ে। বর্তমানে যেকোন বিচার প্রাপ্তির ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে মানবাধিকারের ধারণা একটি প্রাথমিক কাঠামোগত ভিত্তি হিসেবে সর্বজনস্বীকৃত।

প্রাকৃতিক অধিকার থেকে মানবাধিকার মানব ইতিহাসের ব্যাপক পরিসরে দেখা যায় যে, কোনো ব্যক্তির ব্যক্তিগত ও সামাজিক অধিকার, দায়িত্ব এবং কর্তব্যবোধ রূপলাভ করে সমাজের সদস্য হিসেবে কোনো নির্দিষ্ট দল বা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এবং সে প্রতিষ্ঠান হতে পারে পরিবার, সম্প্রদায়, ধর্ম, পেশাগত গ্রুপ ইত্যাদি। ব্যক্তি হিসেবে প্রতিটি মানুষ তার মানব অস্তিত্বের ভিত্তিতে নিশ্চিতভাবে মানবাধিকার পাওয়ার যোগ্য, এ ধারণাটি সাম্প্রতিক হলেও বহুপূর্ব থেকে প্রচলিত বিভিন্ন প্রথা এবং প্রধান ধর্মীয় অনুশাসনের মূলে এর অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়।

ঐতিহাসিক কাল থেকেই সর্বজনীন মানবাধিকারের ভিত্তিমূল হিসেবে প্রাকৃতিক আইনকে বিবেচনা করা হয়। প্রকৃতপক্ষে প্রাকৃতিক নিয়মাবলি বজায় রাখার ক্ষেত্রে যেসব সংগঠক রয়েছে তা বিভিন্ন সময়ে এবং পরিসরে ধর্মীয় এবং নৈতিক অবস্থান হতে জৈবিক ও সামাজিক রীতিনীতির স্থিরতা দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল। প্রাচীন গ্রীক দার্শনিকগণ প্রাকৃতিক অধিকার এবং ন্যায়নীতি প্রসঙ্গে পরিষ্কার ধারণা দেন, যা মূলত প্রাকৃতিক আইন হতে উদ্ভূত এবং বিশ্বে বিদ্যমান প্রাকৃতিক নিয়ম-শৃঙ্খলা থেকে বিকাশ লাভ করেছিল। এই প্রাকৃতিক শৃঙ্খলার একটি ঐশ্বরিক ভিত্তি ছিল যা

সৃষ্টিকর্তা বা বিধাতার ইচ্ছা হিসেবে ধরা হয়। এ ব্যাপারে একটি পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যায় সার্বভৌম প্রাকৃতিক অধিকারের ধারণা হতে, যা সতেরো এবং আঠারো শতকের ইউরোপের বহু দার্শনিক তাদের লেখার মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। এখানে তাঁরা মত প্রকাশ করেন যে, অধিকার এবং বাধ্যবাধকতা ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট উদ্যোগে সমষ্টিগতভাবে রাষ্ট্রে প্রকাশ পেয়েছে। সামাজিক চুক্তি মতবাদের প্রণেতা তত্ত্ববিদগণ প্রাকৃতিক আইনের বিভিন্ন ব্যাখ্যা দেয়ার মাধ্যমে একে বিস্তৃত করে মানব সম্প্রদায়ের প্রাকৃতিক অধিকারকে আরো সহজভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন।

আঠারো শতকের দার্শনিক জন লকের সামাজিক চুক্তি মতবাদের বিস্তৃতির দ্বারা সামাজিক চুক্তি মতবাদের যে নতুন ধারা তৈরি হয় তা পরবর্তীতে মানবাধিকার তত্ত্বের উন্নয়নে ভূমিকা রাখে। লকের সামাজিক চুক্তি মতবাদে রাষ্ট্র কর্তৃক সম্পাদিত দ্বিতীয় চুক্তিতে (১৬৮৯) তিনি যুক্তি প্রদর্শন করেন যে, বিধাতার বা প্রকৃতির সৃষ্টি হিসেবে প্রতিটি মানবসত্তা প্রকৃতিগতভাবে স্বাধীন এবং সমঅধিকার সম্পন্ন। সুতরাং জনগণের প্রাকৃতিক অধিকার ছিল, এবং প্রাকৃতিক আইন ব্যবহার করে তারা জীবনের এবং সম্পত্তির স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা ভোগ করত। কাল্পনিকতা সত্ত্বেও লকের প্রাকৃতিক অধিকারের ধারণা আধুনিক ধারার অধিকারের ধারণার উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। এক্ষেত্রে ১৭৭৬ সালের যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা ঘোষণাপত্রের উল্লেখ করা যায় যেখানে প্রাকৃতিক অধিকারের মতবাদ গ্রহণ করে বলা হয়েছিল, সকল মানুষ সমভাবে সৃষ্ট হয়েছে এবং সেই সাথে প্রকৃতিগতভাবে অখন্ডযোগ্য কিছু অধিকার লাভ করেছে যার মধ্যে রয়েছে জীবন, স্বাধীনতা এবং সুখের অনুসন্ধানের মতো অধিকার।

সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্র আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ অভিজ্ঞতা লাভের অল্প কিছুদিনের মধ্যে ১৯৪৮ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণার প্রাথমিক ভিত্তির দলিলটি গৃহীত হয়। বাধ্যবাধকতাহীন এই দলিলে আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার একনায়ক সুলভ ক্ষমতার ব্যবহার থেকে ব্যক্তিকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে মানবাধিকারের রূপরেখা তৈরি করা হয়েছিল। বিশ্বের সবগুলো মহাদেশের এবং ধর্মের প্রতিনিধিদের মধ্য থেকে আন্তর্জাতিকভাবে নির্বাচিত বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে গঠিত একটি কমিটির দ্বারা গবেষণার মাধ্যমে এবং প্রতিটি অধিকার আলাদা অংশে বিভক্ত করে সর্বজনীন মানবাধিকার তত্ত্বটি প্রস্তুত হয়। সর্বজনীন মানবাধিকার তত্ত্বে মৌলিক অধিকার এবং স্বাধীনতার কথা বলা হয়েছে, যা সমগ্র মানব সত্তার সাথে জড়িত। ইউডিএইচআর-এর ১ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে যে, সকল মানুষই স্বাধীন অবস্থায় সম-মর্যাদা ও অধিকার নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। এর সাথে যোগ করা হয়েছে অর্থনীতি, সামাজিক-সাংস্কৃতিক অধিকার এবং নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার। সব অধিকারের সমন্বয়ে প্রণীত ইউডিএইচআর-এ আশা করা হয়েছিল যে, মৌলিক অধিকারসমূহ অবিচ্ছেদ্য এবং অলঙ্ঘনীয় ভাবে তৈরী। ইউডিএইচআর-এ ঘোষিত মানবাধিকারের ধারণা পশ্চিমা দেশগুলোর কাছ থেকে কখনও পূর্ণ সমর্থন পায়নি, এমনকি পরবর্তীতে এ ধারণার বিপক্ষে তাদের কাছ থেকে আপত্তিও এসেছে।

বছর পরিক্রমায় বিভিন্ন কভেন্যান্টস এবং সনদ দ্বারা ইউডিএইচআর-এ বর্ণিত মানবাধিকারের ধারণার পরিসর বৃদ্ধি পেয়ে কাঠামোগতভাবে আরো বিস্তৃত হয়েছে বিভিন্ন যৌথ অধিকার এবং অ-রাষ্ট্রীয় সংগঠক বিশেষ করে বহুজাতিক কর্পোরেশন সমূহের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্তদের অধিকারের স্বীকৃতির মাধ্যমে।

সর্বজনীন মানবাধিকারের ঘোষণার দ্বারা কে অধিকার ভোগ করবে এবং সেটা কোন প্রকার অধিকার তা নির্ধারণ করা হয়নি। বিশ শতকের চল্লিশের দশকে উপনিবেশিকতাবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী কঠোর আন্দোলন চলাকালীন সময়ে এ প্রশ্নও উঠে আসে যে অধিকার কার, এবং কোনো নারী বা পুরুষ কী ধরণের অধিকার লাভ করবে। ফলে এ সময়ে অধিকারের এই

দুই ধরণের ধারণার সমন্বয়ে নতুন একটি ধারা তৈরী হয় (Lauren-in-Cimel)। কোনো একটি মৌলিক মানবাধিকার কিভাবে অর্জিত হয় এবং কোন অংশটি অহস্তান্তরযোগ্য, এই দুটির মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ অবস্থা সৃষ্টি হয় উপনিবেশিকতাবাদ বিরোধী আন্দোলন চলাকালীন সময়ে। মূলত এ আন্দোলন জাতিগোষ্ঠী এবং সাম্রাজ্যবাদের মধ্যকার বিরোধকে উদারমতাবলম্বী অধিকারের আন্দোলনের ধারণা দ্বারা সুদৃঢ় করে তোলে।

মানবাধিকার সংশ্লিষ্ট বিতর্কে জাতীয়তাবাদীরা ব্যক্তি অধিকারের চেয়ে কোনো জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারকে বেশী প্রাধান্য দেন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, উপনিবেশবাদ বিরোধী কর্মী নাইজেরিয়ার মবোনু ওজিক দাবি করেন যে, মাতৃভূমিতে নিজেদের শাসন প্রতিষ্ঠা করা ব্যক্তির একটি প্রাকৃতিক অধিকার। হো চি মিন ভিয়েতনামের স্বাধীনতা ঘোষণাকালে যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতার ঘোষণায় বিধৃত জনগণের অনন্য-সমর্পনীয় অধিকারের উদ্ধৃতি দেন। পশ্চিমা দেশগুলোর আপত্তি সত্বেও ১৯৫২ সালে এশিয়া, আফ্রিকা এবং ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলো জাতিসংঘের মানবাধিকার কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রনাধিকারের বিষয়টির প্রতি আনুষ্ঠানিক সম্মান প্রদর্শন করে। ইউরোপের দেশগুলো এবং নেতৃস্থানীয় বুদ্ধিজীবীরা জীবন ধারনের অধিকার, স্বাধীনতা, মত প্রকাশের অধিকারের মতো মৌলিক মানবাধিকার ধারণার সাথে আত্মনিয়ন্ত্রনের অধিকারকে সমমর্যাদায় স্বীকৃতি দিতে দ্বিমত পোষণ করেন। বিরোধীদের মধ্যে বেশিরভাগই তৃতীয় বিশ্বের জাতীয়তাবাদের ধারণার প্রতি সন্দেহ ও অসন্তোষ প্রকাশ করেন।

বিশ্বায়ন, এনজিও এবং নতুন আত্যান্তিশালী মানবাধিকার শাসনকাল উনিশ শতকের সত্তুরের দশকে স্নায়ুযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে মানবাধিকারের বিষয়সূচী এবং ক্ষমতার ধারণার ক্ষেত্রে এক নতুন পরিবর্তন আসে। পশ্চিমের বাজার অর্থনীতির নিরীখে কমিউনিজম প্রবর্তনের দ্বারা মানবাধিকার চরমভাবে লঙ্ঘিত হয়েছে। এ সময়ে উনিশ শতকের চল্লিশের দশকের মানবাধিকারের অবিচ্ছেদ্য অংশগুলোর ধারণাকে পাশ কাটিয়ে পশ্চিমা রাষ্ট্রগুলো নাগরিক এবং রাজনৈতিক অধিকারকে (যা প্রথম প্রজন্মের অধিকার বলে বিবেচিত) মৌলিক অধিকার হিসেবে গ্রহণ করে। অন্যদিকে তারা অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক অধিকারকে (যা দ্বিতীয় প্রজন্মের অধিকার বলে বিবেচিত) অনুরূপ স্বীকৃতি দিতে অস্বীকৃতি জানায়। এ বিভাজনই মূলত তৃতীয় বিশ্ব ও সমাজতান্ত্রিক ব্লক এবং পশ্চিমের ধনতান্ত্রিক ব্লকের মধ্যে একটি বিভাজক রুটিরেখা হিসেবে দেখা দেয়। অধিকারের এই ধারণা দ্বারা এ সময়ে বিশ্বব্যাংকের বাজার প্রসারের বিরোধিতাকারী এজেন্ডার আলোচনাকে সামনে নিয়ে আসা হয়।

একইভাবে মানবাধিকার রক্ষার যে মূল কার্যক্রম জাতিসংঘের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছিল তা আন্তর্জাতিক এনজিওসমূহ এবং অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের মতো মানবাধিকার সংগঠনগুলোর কাছে স্থানান্তরিত হয়। মানবাধিকারের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক আইনের তুলনায় এনজিও কার্যক্রম মৌলিক ভূমিকা পালন করতে শুরু করে। ক্ষুদ্রতর পরিসরে হলেও মানবাধিকারের আন্তঃদেশীয় শক্তিশালী একটি সমর্থক গ্রুপ তৈরি হয়, যারা নিজ নিজ সরকারকে চাপের মধ্যে রেখে যেকোন ধরনের রাজনৈতিক ও নাগরিক অধিকার লঙ্ঘনের প্রতিবাদ করে। এই গোষ্ঠী অধিকারের কার্যক্রমের ফলে শাসক কর্তৃক ব্যক্তিগত অধিকার রক্ষার উপর বেশি গুরুত্বারোপ করা হয়।

স্নায়ুযুদ্ধ সমাপ্তির পর মানবাধিকার কার্যক্রমের ভাষা এবং অর্থ দুটোই পরিবর্তিত হয়েছে। সমাজতন্ত্রের পতনের পর ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার একমাত্র ভাষা হয়ে দাঁড়িয়েছে মানবাধিকার। বিশ শতকের শেষ দ'ুদশকে বসনিয়া এবং রুয়ান্ডার নির্বিচার হত্যাকান্ড, বিশ্বায়ন, স্থানীয় এবং আন্তর্জাতিক এনজিওসমূহের শাখা প্রশাখার বিস্তৃতির প্রভাবের সাথে সাথে নতুন করে সৃষ্ট সুশাসনের ভাষা এবং উন্নয়নের ক্ষেত্রে অধিকারের ধারণার অনুপ্রবেশ মানবাধিকারের ধারণাকে

বিশ্বব্যাপি প্রসারিত করেছে। অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশের প্রেক্ষিতেও এটি একটি বাস্তব ঘটনা। জাতিসংঘের বেশ কয়েকটি সম্মেলনে, বিশেষ করে নারীদের নিয়ে অনুষ্ঠিত সম্মেলনগুলোতে শুধু নারী অধিকার সংরক্ষণ হয়নি বরং মানবাধিকারের বিষয়টি গুরুত্বের সাথে প্রচারিত হয়েছে। এক্ষেত্রে ১৯৯৩ সালের মানবাধিকার বিষয়ক জাতিসংঘের ভিয়েনা সম্মেলনে মানবাধিকারের বিষয়টি আরও সুনির্দিষ্টভাবে প্রতিফলিত হতে দেখা যায়।

এ সময় দেখা যায়, দক্ষিণের বহুমুখি এনজিওগুলো জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে মানবাধিকার সংগঠন হিসেবে বিভিন্নভাবে গুরুত্বপূর্ণ সব কাজ করে যাচ্ছে। এদের কোনটি পশ্চিমা অর্থায়নে স্থাপিত এবং তাদের অর্থায়নের উপর নির্ভর করেই চলছে, আবার কিছু এনজিও সম্পূর্ণভাবে জাতীয় পর্যায়ে সৃষ্টি হয়েছে। যৌথভাবে এরা অধিকারের ধারণার বিশ্ব দৃশ্যপটকে পরিবর্তন করছে, মানবাধিকারের বিষয়টি ব্যাপকতর করছে এবং পরিবেশের অধিকারের ইস্যু থেকে স্বাস্থ্যের অধিকারের ইস্যু, অর্থনৈতিক ন্যায়নিষ্ঠতা, বহুজাতিক দায়দায়িত্ব প্রভৃতি ইস্যুকে অন্তর্ভুক্ত করেছে।

বাস্তবক্ষেত্রে দেখা যায় যে, উপনিবেশিক এবং প্রাচ্যের কাঠামো ভিত্তিক জ্ঞানের দ্বারা প্রভাবিত ও সংগঠিত হয়ে কতগুলো সামাজিক প্রথার স্বীকৃতির ফলে অন্যান্য মানবাধিকার যথেষ্ট উপেক্ষিত রয়ে গেছে। সমালোচকগণ অভিযোগ করেন যে, ঐতিহাসিকভাবে বিদ্যমান বৈশ্বিক শক্তির সম্পর্ককে যথাযথ বিবেচনা ব্যতিরেকে সর্বজনীনতাবাদ বনাম সাংস্কৃতিক-বাস্তববাদ বির্তক উপলব্ধি করা যাবে না। এই ইস্যু শুধু সংস্কৃতি ভিত্তিক মানবাধিকার চর্চাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে না, বরং সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলে ক্ষমতার অনুশীলনের রাজনৈতিক রূপকেও সামনে নিয়ে আসে।

এটা নিয়ে প্রায়ই বিতর্ক দেখা যায় যে, সর্বত্র স্বীকৃত কতগুলো কারণ নারী অধিকার লঙ্ঘনের জন্য দায়ী, এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিস্তৃতি রোধে কোনো সংস্কৃতিতে সার্বজনীন অধিকারের দাবিতে এমন সব বিরোধ ও উত্তেজনা সৃষ্টি করা হয় যার দ্বারা মানবাধিকারের ধারণাটিকে একটি নির্দিষ্ট কাঠামোয় আবদ্ধ করা সম্ভব হচ্ছে না। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, আফ্রিকার নারীদের বিশেষ অঙ্গ কর্তনের (এফজিসি) মতো বিষয়ের প্রচলন তাদের মৌলিক মানবাধিকার লঙ্ঘনের অন্যতম কারণ হলেও তা পিছিয়ে পড়া আফ্রিকার সংস্কৃতিগত প্রথা বলে গণ্য করা হয়। অন্যদিকে আমেরিকা ও ইউরোপে দীর্ঘকাল ধরে বহুল প্রসারিত স্বামী-স্ত্রী বিরোধ এবং জীবনসঙ্গী হত্যার মতো বিষয় 'সংস্কৃতিগত অপরাধ' বলে গণ্য হয়, যা ইউরোপ-আমেরিকার সাংস্কৃতিক মূল্যবোধে প্রতিফলিত হয় না। একইভাবে সার্বজনীনতাবাদ বনাম সাংস্কৃতিক-আপেক্ষিকতা সংশ্লিষ্ট দ্বৈত মতবাদ থেকে এটা সুস্পষ্ট নয় যে, কোনো একজন ককেসাস নারীকে তার পুরুষসাথী কর্তৃক হত্যার পরও সেটাকে আমেরিকায় কেন গৃহবিবাদ হিসেবে ধরা হয়, অথচ একজন আরব নারীকে তার স্বামী হত্যা করলে সমস্যাটি গুরুত্বপূর্ণ অপরাধ বলে গণ্য হয়, যা তাদের সংস্কৃতিতে একটি সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

সর্বজনীনতাবাদ বনাম সাংস্কৃতিক-বাস্তববাদ বিতর্ক ১৯৮৫ সালে নাইরোবিতে অনুষ্ঠিত নারী বিষয়ক জাতিসংঘের তৃতীয় বিশ্ব সম্মেলনে চূড়ান্ত রূপ লাভ করে। ইউরো-আমেরিকান নারীবাদীগণ এফজিসিকে মানবাধিকারের লঙ্ঘনের প্রধান কারণ বলে চিহ্নিত করেন, যা আফ্রিকার নারীদের ভোগ করতে হয়। আফ্রিকার নারীবাদীগণ যেখানে আলোচনার বিষয়সূচী হিসেবে অগ্রাধিকারের ক্ষেত্রে কাঠামোগত সমন্বয়মূলক নীতির প্রতিক্রিয়া হিসেবে পানি এবং জ্বালানীর মতো প্রয়োজনীয় জিনিস বহনের অধিকারের বিষয়ে আলোচনা করে তখন তারা তার বিরোধিতা করে। আফ্রিকার নারীবাদীগণ অভিযোগ করেন যে, এফজিসি'র প্রতি অসামঞ্জস্যমূলক গুরুত্বারোপ করার পিছনে ইউরো-আমেরিকান নারীবাদীদের দুই ধরনের কারণ রয়েছে: (১) সাম্প্রতিক সময়ের জটিল বিশ্ব অর্থনৈতিক রাজনীতিতে আফ্রিকানদের প্রভাব বিস্তার করতে না দেয়া এবং তাদের প্রাপ্য সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা, যার মধ্যে আফ্রিকান নারীদের বিষয়টিও অন্তর্ভুক্ত; (২) এর সাথে রয়েছে ইউরো-আমেরিকান সংস্কৃতির প্রসারের উপনিবেশিক প্রবণতা, এবং আফ্রিকান

নারীদের অধিকারের রক্ষাকর্তা হিসেবে নিজেদের জাহির করা। সবগুলো দিকের বিশ্লেষণে তাই বলা যায় যে, সার্বজনীনতাবাদ বনাম সাংস্কৃতিক-বাস্তববাদের মধ্যে দৃষ্টিগোচর হবার মতো বিষয়ের বাইরেও মতবাদগত বিতর্ক বিদ্যমান রয়েছে। ক্ষমতার হস্তান্তরের বৈশ্বিক পরিবর্তনের দ্বারা আন্তর্জাতিক নারীবাদীগণ সময়ের ব্যবধানে দুই দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে বিদ্যমান পার্থক্য আংশিকভাবে দূর করতে কিছুটা সক্ষম হয়েছেন। ১৯৯৩ সালে ভিয়েনায় অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের মানবাধিকার সম্মেলনে দক্ষিণের এনজিওগুলো এবং নারীবাদীগণ বলিষ্ঠভাবে মানবাধিকারের কথা বলে, যা পরবর্তীতে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন ফোরামে দৃঢ়তার সাথে মানবাধিকারের বিষয়টিকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। বলা যায়, এই সময়ের পর থেকেই মানবাধিকারকে একটি নির্দিষ্ট সংজ্ঞায় কাঠামোবদ্ধ করা অসম্ভব ব্যাপার হয়ে গিয়েছে। বর্তমানে মানবাধিকারের ব্যাপারটি সংজ্ঞায় সীমাবদ্ধ না করে বরং প্রধান কিছু নীতিগত উপাদান দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে।

ভিয়েনা ঘোষণা এবং কর্মসূচী বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বলা হয়েছিল যে, নারীর অধিকার মানবাধিকারের অংশ। এর সঙ্গে মানবাধিকারকে আরও নিশ্চিত করা হয়েছে গণতন্ত্র, উন্নয়ন ও মানবাধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং মৌল স্বাধীনতার পারস্পরিক নির্ভরশীলতা শক্তিশালী করে নিজেদের মধ্যে চালু রাখার উপর জোর দেয়ার মধ্য দিয়ে।

MDC
Human Rights

তিন প্রজন্ম অধিকারের বিবরণ দাও (**Give an account of Three Generation of Rights**)

অথবা

তিন প্রজন্মের অধিকারের ধারণার মুল্যায়ণ কর (**Make an assesment of Three Generation of Rights**)

বর্তমান যুগে অধিকার বা মানবাধিকার একটি বিশ্বায়িত আলোচ্য বিষয় । পূর্বে যদিও বিষয়টি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় ছিল , বর্তমানে কিন্তু এটি একটি স্বতন্ত্র মতাদর্শ অথবা একটি বিশ্বায়িত কর্মসূচী হিসাবে স্বীকৃত । স্বভাবতই এই মতবাদের প্রবক্তা আছেন এবং এই কর্মসূচী বাস্তবায়িত করার জন্য কর্মীও আছেন । কর্মীরা এই মহৎ মতাদর্শটিকে কতটা সততার সঙ্গে কার্যকরী করবেন তার উপরেই এর সাফল্য নির্ভর করছে । মানবাধিকার ধারণাটির মূলে আছে প্রত্যেক মানুষকে যথার্থ মর্যাদা দানের অঙ্গীকার । এই ধারণা অনুযায়ী প্রত্যেক মানুষের অধিকার অন্তর্নিহিত , সার্বজনীন ও অবিচ্ছেদ্য । এই অর্থে মানবাধিকার নির্মাণের পেছনে স্বাভাবিক অধিকারের ধারণাটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে । মানবাধিকারের পূর্ণাঙ্গ ধারণার মধ্যে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত । এর যে কোন একটিকে স্বীকৃতি না দিলে মানবাধিকার যথার্থ হয় না । বর্তমানে এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সাংস্কৃতিক ও পরিবেশগত অধিকারের ধারণাটিও ।

অনেক বিশেষজ্ঞ মানবাধিকারকে ইতিবাচক ও নেতিবাচক এই দুই ভাগে ভাগ করার পক্ষপাতী । কিন্তু এছাড়াও মানবাধিকারের আর একটি বিভাজন আছে , তা হল প্রজন্ম ভিত্তিক বিভাজন - প্রথম প্রজন্মের অধিকার, দ্বিতীয় প্রজন্মের অধিকার ও তৃতীয় প্রজন্মের অধিকার । এই 'তিন প্রজন্ম অধিকার' এর ধারণাটির জনক হলেন ক্যারেল ভাসাক (Karel Vasak)। তাঁর রচিত একটি বিখ্যাত প্রবন্ধ থেকে এই ধারণাটি আন্তর্জাতিক আঙিনায় প্রবেশ করে । ভাসাকের মতে, এই তিন প্রজন্মের অধিকার মিলে মানবাধিকারের পূর্ণাঙ্গ কাঠামোটি নির্মিত হয় । তৃতীয় প্রজন্মের অধিকার গুলি যথাযথভাবে কার্যকরী হলে তবে প্রথম ও দ্বিতীয় প্রজন্মের অধিকারগুলি অর্থপূর্ণ হয় এবং পাশ্চাত্য জগতের গন্ডী থেকে বেরিয়ে এসে অধিকারগুলি যথাযথ জায়গায় প্রতিষ্ঠিত হতে পারে ।

প্রথম প্রজন্মের অধিকার (First Generation Rights) :-

শিল্প বিপ্লবের পর সপ্তদশ শতাব্দীতে নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণী তথা বুর্জোয়ারা উদারনৈতিক আন্দোলনের সাথে যুক্ত থেকে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যে পৌর ও রাজনৈতিক অধিকারের দাবি জানায় সেগুলোকেই

প্রথম প্রজন্মের অধিকার বলে । এগুলি হল জীবনের অধিকার, স্বাধীনতার অধিকার, মত প্রকাশের অধিকার, চলাফেরা করার অধিকার, ব্যবসা বাণিজ্য করার অধিকার, সম্পত্তির অধিকার, সরকারের সমালোচনা করার অধিকার, ভোটাধিকার, নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করার অধিকার ইত্যাদি । এই অধিকারগুলির মূল প্রবক্তা ছিলেন জন লক, রুশো, জেমস মিল প্রমুখরা । এই অধিকারগুলি রাষ্ট্রের বলপ্রয়োগ থেকে ব্যক্তিকে রক্ষা করে । সার্বজনীন মানবাধিকারের ঘোষণায় (UDHR) ৩ - ২১ নম্বর ধারায় এই অধিকারগুলির উল্লেখ রয়েছে ।

বৈশিষ্ট :- ১) প্রথম প্রজন্মের অধিকারগুলি স্বাধীনতার ধারণাকে বিধৃত করে ; ২) প্রথম প্রজন্মের অধিকারগুলি উদারনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ; ৩) রাষ্ট্র ও সমাজের বিরুদ্ধে এগুলি নেতিবাচক অধিকার ; ৪) এই অধিকারের প্রবক্তারা হলেন জন লক , রুশো, জেমস মিল প্রমুখরা ; ৫) ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশের ক্ষেত্রে এই অধিকারগুলি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ; ৬) এই অধিকারগুলি রাষ্ট্রের অতিরিক্ত ক্ষমতাকে সীমিত করে ; ৭) এই অধিকারগুলি গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করে এবং ৮) এই অধিকারগুলি প্রত্যেক ব্যক্তিকে সমান মর্যাদা ও মূল্য প্রদান করে ।

সীমাবদ্ধতা :- ১) এই অধিকারগুলি নেতিবাচক , শুধুমাত্র আছে এই যা ; ২) মানুষের মৌল প্রয়োজন তথা অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকারের স্বীকৃতি ছাড়া এই অধিকারগুলি অর্থহীন ; ৩) এই অধিকারগুলি পুঁজিবাদের বিকাশ ও সংরক্ষণে বিশেষভাবে সহায়তা করে ; ৪) সামাজিক সংহতি ও সহযোগিতার ধারণাকে এখানে খাটো করে দেখা হয় ; ইত্যাদি ।

দ্বিতীয় প্রজন্মের অধিকার (Second Generation Right) :-

উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে মার্কসীয় মতাদর্শের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠা সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের মাধ্যমে যে অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকারের ধারণা প্রসার লাভ করে সেগুলিকেই দ্বিতীয় প্রজন্মের অধিকার বলা হয় । এই অধিকারগুলির মূল প্রবক্তারা হলেন মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন প্রমুখরা । এই অধিকার গুলি হল শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার, কাজের অধিকার , অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উপযুক্ত মজুরীর অধিকার, অবকাশের অধিকার, শিক্ষার অধিকার, বার্ধক্য অবস্থায় রাষ্ট্র কর্তৃক প্রতিপালিত হওয়ার অধিকার প্রভৃতি । এই অধিকার প্রদানের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্র নাগরিকের প্রতি তার দায়িত্ব পালন করে । সার্বজনীন মানবাধিকারের ঘোষণায় ২২ - ২৭ নম্বর ধারায় এই অধিকারের উল্লেখ রয়েছে । {

বৈশিষ্ট :- ১) অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকারগুলিকেই একসঙ্গে দ্বিতীয় প্রজন্মের অধিকার বলা হয় ; ২) এই অধিকারগুলি উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের মাধ্যমে গড়ে উঠে ; ৩) দ্বিতীয় প্রজন্মের অধিকারগুলি সাম্যের ধারণাকে বিস্তৃত করে ; ৪) এই অধিকারগুলি ইতিবাচক । এর মাধ্যমে রাষ্ট্রের কার্যাবলী প্রসারিত হয় এবং রাষ্ট্রকে কাজকর্ম করতে উৎসাহিত করে ; ৫) এই অধিকারের মূল প্রবক্তারা হলেন মার্কস , এঙ্গেলস, লেনিন প্রমুখরা ; ৬) এই অধিকারগুলি অনুশীলন বা প্রয়োগ সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতে তথা সোভিয়েত ইউনিয়ন, চীন, কিউবা প্রভৃতি দেশে লক্ষ্য করা যায় ; ৭) এই অধিকারগুলি সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা করে ; ৮) এই অধিকারগুলির স্বীকৃতির মধ্য দিয়ে অধিকারের পরিধি আগের তুলনায় বিস্তৃত হয় ; ইত্যাদি ।

সীমাবদ্ধতা :- এই অধিকারগুলির স্বীকৃতির মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রের কাজের পরিধি বা ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় ; ২) রাষ্ট্রের কর্ম পরিধির বিস্তৃতির ফলে ব্যক্তি স্বাধীনতা সংকুচিত হয়ে পড়ে ; ৩) এখানে সর্ব নিয়ন্ত্রণবাদী বা কর্তৃত্ববাদী রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটে ; ৪) এখানে বহুত্ববাদী সংস্কৃতি ও বহুত্ববাদী মূল্যবোধকে ছোট করে দেখা হয় ; ইত্যাদি ।

তৃতীয় প্রজন্মের অধিকার (Third Generation Right) :-

বিংশ ও একবিংশ শতাব্দীতে পরিবেশ আন্দোলন ও বহুত্ববাদী সাংস্কৃতিক সচেতনতার ফলে যে সাংস্কৃতিক ও পরিবেশগত অধিকারের ধারণা গড়ে উঠে তাকে তৃতীয় প্রজন্মের অধিকার বলে । এই অধিকারের মূল প্রবক্তা হলেন ক্যারেল ভাসাক । তৃতীয় প্রজন্মের অধিকারগুলি তুলনামূলকভাবে সাম্প্রতিক সংযোজন । বিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে এবং একবিংশ শতাব্দীতে এই অধিকারের ধারণা জনপ্রিয়তা লাভ করে । ১৯৮৪ সালে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ কর্তৃক ঘোষিত জনগণের শান্তির অধিকার (Declaration of the Rights of Peoples to Peace) এই প্রজন্মভুক্ত অধিকার । তৃতীয় প্রজন্ম অধিকারে ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের সঙ্গে 'সমুহ'(collectivity)র ধারণাটি যুক্ত । এখানে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার (Right to Self determination) , উন্নয়নের অধিকার (Right to Development) , সুস্থ পরিবেশে বসবাসের অধিকার , সাংস্কৃতিক সংখ্যালঘুদের সংস্কৃতি, ভাষা, ঐতিহ্য ও প্রথা সংরক্ষণের অধিকার , বিশুদ্ধ বায়ু, মাটি ও জলের অধিকার প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য ।

বৈশিষ্ট :- ১) সাংস্কৃতিক ও পরিবেশগত অধিকারগুলিকে একযোগেই তৃতীয় প্রজন্মের অধিকার বলা হয় ; ২) এই অধিকারগুলি বহুত্ববাদী সাংস্কৃতিক সচেতনতা ও পরিবেশ আন্দোলনের সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত ; ৩) এই অধিকারের ধারণা একেবারে নতুন, এগুলি বিংশ ও একবিংশ শতাব্দীতে গড়ে উঠে ; ৪) এই অধিকারগুলিকে সমষ্টিগত অধিকারও বলে অর্থাৎ এই অধিকারগুলি ব্যক্তি একা একা ভোগ করতে পারে না, এগুলো সকলে মিলে বা একযোগে ভোগ করতে হয় ; ৫) এই অধিকারগুলি ভ্রাতৃত্ব বা সহযোগিতার ধারণাকে বিস্তৃত করে ; ৬) এই অধিকারগুলি বহুত্ববাদী সংস্কৃতিবাদ ও বহুত্ববাদী মূল্যবোধকে স্বীকার করে নেয় ; ৭) সর্বপরি এই অধিকারগুলি ভবিষ্যৎমুখী ।

সীমাবদ্ধতা :- ১) এই অধিকারের স্বীকৃতির ফলে আত্ম নিয়ন্ত্রণের অধিকারের দাবি সোচ্চার হয়, যার ফলে সমাজটা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে ; ২) অতিরিক্ত পরিবেশগত আন্দোলন দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় ।

যাইহোক, পরিশেষে বলা যায় যে প্রথম প্রজন্মের অধিকার স্বাধীনতা , দ্বিতীয় প্রজন্মের অধিকার সাম্য ও তৃতীয় প্রজন্মের অধিকার ভ্রাতৃত্বের ধারণাগুলিকে বিধৃত করে এবং তিন প্রজন্মের অধিকার মিলে মানবাধিকারের পূর্ণাঙ্গ কাঠামো নির্মিত করে ।

-০-

*** জাতির আত্ম নিয়ন্ত্রণের অধিকার বলতে কী বোঝ ?**

যখন কোন আত্ম সচেতন জাতীয় জনসমাজ নিজেদের পৃথক সত্তা ও জাতীয় বৈশিষ্ট বা সংস্কৃতি রক্ষার জন্য একটি নিজস্ব রাষ্ট্র বা পৃথক রাষ্ট্র গঠনের দাবি জানায় তখন তাকে জাতির আত্ম নিয়ন্ত্রণের অধিকার বলে ।

Reference :-

1) O.P.Gauba , Politcal Ideas & Ideolgies

চতুর্থ অধ্যায়

মানবাধিকার ও ভারত (Human Rights and India)

অধ্যায়ের বিষয়বস্তু

মানব অধিকার প্রত্যয়টি মূলত পশ্চিমি দুনিয়ায় বিকশিত। এর প্রভাব সারা বিশ্বে অনুভূত হয়। ভারতও এ প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়। বিশেষত মানবাধিকার সম্পর্কে জাতিপুঞ্জের ঘোষণায় ভারত এক বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করে।

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার ঘোষণার সঙ্গে তাল মিলিয়ে ভারতে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন এবং রাজ্যে রাজ্যে রাজ্য মানবাধিকার কমিশন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মানব অধিকার—লঙ্ঘিত হলে মানবাধিকার কমিশন তা প্রতিরোধে সতত প্রয়াসী।

৪.১ ভূমিকা (Introduction)

প্রতিটি ব্যক্তি সমাজ সদস্য হিসাবে তার ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ ঘটাতে আগ্রহী। এজন্য তার প্রয়োজন কিছু সুযোগ সুবিধার। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে ব্যক্তিত্ব বিকাশের এই সুযোগ সুবিধাগুলিকে অধিকার বলা হয়। প্রখ্যাত রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এইচ. জে. ল্যাস্কি বলেন, "অধিকার হল সমাজজীবনের সেই সকল শর্তাবলি যাকে বাদ দিয়ে কোনো মানুষ সাধারণভাবে তার ব্যক্তিত্বের চরম বিকশে সচেষ্ট হতে পারে না।" এই সকল শর্তাবলি লাভের জন্য অনুকূল সামাজিক অবস্থা গড়ে তোলা জরুরি। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ এই উদ্দেশ্যে কাজ করে কারণ এই সংস্থারও মূল উদ্দেশ্য হল আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করে সারা বিশ্বে মানবসমাজের বিকাশের অনুকূল পরিবেশ বজায় রাখা। ফলত এই উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়িত করার জন্য তথা বিশ্ববাসীর অধিকারের স্বীকৃতি তথা মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা করার জন্য সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ সতত ক্রিয়াশীল তথা **Universal Declaration of Human Rights** তথা সর্বজনীন মানবাধিকারের ঘোষণাপত্র হল এরই নিদর্শন।

৪.২ মানবাধিকার সম্পর্কে জাতিপুঞ্জের ঘোষণা (UN Declaration of Human Rights)

প্রকৃত অর্থে মানবাধিকারের ইতিহাস স্বল্প দিনের। অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে ১৭৮৯ সালে ফরাসি বিপ্লবের সময়ে মানবাধিকার প্রসঙ্গে আন্তর্জাতিক স্তরের চিন্তাভাবনার প্রথম সূচনা ঘটে। তবে এ বিষয়ে গুরুত্ব লাভ করে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর বিভিন্ন শান্তি চুক্তিতে। বস্তুত, মানবাধিকারের গুরুত্ব ব্যাপকতা লাভ করে অমানবিক নাৎসি অত্যাচারের ফলশ্রুতি হিসাবে। লক্ষ লক্ষ ইহুদিদের গ্যাস চেম্বারে ঢুকিয়ে হত্যা তথা মানবতার উপর নিষ্ঠুর অত্যাচার সমগ্র বিশ্বমানবকে স্তম্ভিত করে। সারা বিশ্ব মানুষের অধিকার রক্ষায় উদ্বুদ্ধ হয়। তারা একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়ে মানুষের অধিকার সুনিশ্চিত করতে সংকল্প গ্রহণ করে। ১৯৪৪ সালে ডামবারটন ওক্‌স সম্মেলনে বিশ্বের রাষ্ট্রনেতারা এ ব্যাপারে সহমত পোষণ করেন। পরবর্তীতে এর ফলশ্রুতি হিসাবে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ গড়ে ওঠে।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রস্তাবনায় মানুষের মৌলিক অধিকার, মর্যাদা, মূল্যবোধ এবং ছোটো বড়ো সকল জাতির স্ত্রী-পুরুষের সমানাধিকারের কথা ধ্বনিত হয়েছে। বলা হয়েছে, "We, the people of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war, ... to reaffirm faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of human person, in the equal rights of men and women and of nations large and small ......"

মানবাধিকার সম্পর্কে শুধু সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রস্তাবনায় নয়, সনদের বিভিন্ন ধারা-উপধারায় একে কার্যকর রূপ দেবার কথা ঘোষিত হয়েছে। বিশেষত সনদের ১, ১৩, ৫৫, ৫৬, ৬২, ৬৮ ও ৭৬ নং ধারা মানবাধিকার সম্পর্কে আলোকপাত করে। এগুলি একে একে আলোচনা করলে বিশ্বজনীন প্রতিষ্ঠান সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ কর্তৃক স্বীকৃত মানবাধিকারের গুরুত্ব উপলব্ধি করা যাবে।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রথম অধ্যায়ের ১ ও ২নং ধারায় উদ্দেশ্য ও নীতিসমূহ বর্ণিত হয়েছে। এই উদ্দেশ্যগুলির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য ১(৩) নং ধারায় বর্ণিত হয়েছে তা হল—"To achieve international co-operation in solving international problems of an economic, social, cultural, or humanitarian character, and in promoting and encouraging respect for human rights and for fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, language or religion; ......" তথা "অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অথবা মানবিক ধরনের সমস্ত আন্তর্জাতিক সমস্যার সমাধানে এবং বর্ণ, স্ত্রী-পুরুষ, ভাষা এবং ধর্ম নির্বিশেষে মানবিক অধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের ক্ষেত্রে উন্নতিসাধন এবং উৎসাহদানের জন্য আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সহযোগিতা অর্জন করা।" বস্তুত, আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মানবতাবোধের সঙ্গে বিভিন্ন সমস্যা জড়িয়ে রয়েছে। এই সমস্ত সমস্যার মোকাবিলা না-করলে মানবাধিকারের মহান আদর্শ বলবৎ হবে না এবং তা করার জন্য আন্তর্জাতিক সহযোগিতা জরুরি।

দ্বিতীয়ত, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদের ১৩(১) নং ধারায় সাধারণ সভাকে জাতি, ধর্ম, ভাষা ও স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলে যাতে মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা অর্জনের বিষয়ে সহায়তা দানে উদ্যোগী হতে পারে তা বলা হয়েছে। তাই প্রতিধ্বনিত হয়েছে ".......and assisting in the realization of human rights and fundamental freedom for all without distinction as to race, sex, language or religion." Art. 13(1) (b).

তৃতীয়ত, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ৫৫নং ধারায় মানব অধিকার প্রতিষ্ঠায় সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের কী কী প্রয়াস নেওয়া আবশ্যক তাও উল্লিখিত হয়েছে। তাই ৫৫নং ধারায় বলা হয়েছে—"সমান অধিকার ও সমস্ত জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের নীতির প্রতি সম্মানের ভিত্তিতে বিভিন্ন দেশের মধ্যে শান্তিপূর্ণ ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের জন্য প্রয়োজনীয় স্থিতিশীলতা ও কল্যাণের অবস্থা সৃষ্টির প্রতি লক্ষ রেখে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ চেষ্টা করবে :

(ক) উন্নতর পর্যায়ের জীবনমান, পূর্ণ কর্মসংস্থান এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রগতি ও উন্নতির পরিবেশ ;

(খ) আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক, সামাজিক, স্বাস্থ্য সম্পর্কিত এবং সংশ্লিষ্ট সমস্যাবলির সমাধান; আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাগত সহযোগিতা ; এবং

(গ) জাতি, স্ত্রী-পুরুষ, ভাষা অথবা ধর্ম নির্বিশেষে মানবিক অধিকার এবং মৌলিক স্বাধীনতার প্রতি বিশ্বজনীন সম্মান প্রদর্শন এবং সেগুলি পালনের জন্য।

সনদের ৫৬নং ধারায় বলা হয়েছে ৫৫নং ধারায় উল্লিখিত উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়িত করার জন্য সমস্ত সদস্যরাষ্ট্র যৌথ ও এককভাবে পদক্ষেপ নেওয়ার অঙ্গীকার।

চতুর্থত, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের উপর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার মূল দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়েছে। মানবাধিকার ও মানুষের মৌল স্বাধীনতার কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি আছে এবং এই নীতিগুলি সকল রাষ্ট্রের মেনে চলা প্রয়োজন। এই মূলনীতিগুলি যথাযথভাবে যাতে পালিত হয় সেজন্য প্রয়োজনীয় সুপারিশ করার ক্ষমতা অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদকে দেওয়া হয়েছে। সনদের ৬২(২) নং ধারায় বলা হয়েছে—"It may make recommendations for the purpose of promoting respect for, and observance of, human rights and fundamental freedoms for all." সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদকে এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ৬৮নং ধারাতে বলা হয়েছে—"মানবাধিকার উন্নয়নের জন্য অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ কমিশনসমূহ গঠন করবে" ("The Economic and Social Council shall set up commissions in economic and social fields and for promotion of human rights....")। ১৯৪৭ সালে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের উদ্যোগে তাই মানবাধিকার কমিশন গঠিত হয়।

পঞ্চমত, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অছি পরিষদেরও অন্যতম মূল উদ্দেশ্য হল মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করা। সনদের ৭৬(গ) নং ধারায় তাই ঘোষিত হয়েছে—"জাতি, স্ত্রী-পুরুষ, ভাষা ও ধর্ম নির্বিশেষে সকলের জন্য মানবিক অধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতার প্রতি সম্মান প্রদর্শনকে উৎসাহ প্রদান করবে এবং বিশ্বের বিভিন্ন জাতির মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরতার স্বীকৃতিকে উৎসাহ প্রদান করবে;..."

এক কথায় বলা যায় সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রস্তাবনা থেকে মূল সনদের বিভিন্ন ধারায় মানবাধিকারের মহান আদর্শের প্রতি ব্যাপক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে শ্রীমতী বীণাপাণি পাণ্ডের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি *International Perspective on Human Rights* গ্রন্থে বলেন, "One of the most striking development in International Law since the end of the Second World War is its concern with the protection of human rights."

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বিভিন্ন ধারা-উপধারায় সকলের জন্য মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতার কথা ব্যক্ত হয়েছে ; কিন্তু মানবাধিকার বা মৌলিক স্বাধীনতা বলতে সঠিক কী বোঝায় তা কোনো ধারাতেই কিন্তু স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বিভিন্ন সংস্থা মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত এবং তারা ক্রিয়াশীলও বটে কিন্তু সেরকম উল্লেখযোগ্য তৎপরতা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সবকটি সংস্থার মধ্যে লক্ষ করা যায় না। তবে এ ব্যাপারে ব্যতিক্রম হল অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ। এই পরিষদের উদ্যোগ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই দেখা যায়। অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ ১৯৪৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের ১৬ মানবাধিকার কমিশন (**Commission of Human Rights**) গঠন করে। শ্রীমতী এলেনর রুজভেল্ট (Mrs. Eleanor Roosevelt) এই কমিশনে প্রথম সভানেত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এই কমিশনের প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব ছিল মানবাধিকার সম্পর্কিত ঘোষণার খসড়া প্রণয়ন করা। এ ছাড়া এই কমিশনকে রাজনৈতিক ও পৌর স্বাধীনতা, আর্থ-

সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার এবং জাতি, ধর্ম, ভাষা বৈষম্য, লিঙ্গ বৈষম্য প্রতিরোধে মানবগোষ্ঠীর নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্পর্কেও প্রস্তাব ও প্রতিবেদন রচনা করার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়।

প্রকৃতপক্ষে, ১৯৪৫ সালে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রস্তুতি কমিশন সর্বপ্রথম অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদকে "মানবাধিকার কমিশন" গঠনের নির্দেশ দেয় এবং ১৯৪৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সাধারণ সভা কর্তৃক "মানবাধিকার কমিশন" গঠনের অনুমোদন অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ লাভ করে। ১৯৪৬ সালে এই কমিশনের সদস্যসংখ্যা ছিল প্রথমে ৯ জন এবং পরে তা ১৮ জনে দাঁড়ায়। কালক্রমে এই কমিশনের সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৬২ সালের সদস্যসংখ্যা ছিল ২১ জন এবং ১৯৬৬ সালে ৩২ জন এবং ১৯৮০ সাল হতে এর সদস্যসংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৪৩ জনে।

১৯৪৭ সালের জানুয়ারি মাসে মানবাধিকার কমিশনের প্রথম অধিবেশন বসে এবং দায়িত্ব ছিল অধিকারের আন্তর্জাতিক বিল (International Bill of Rights) রচনা করা। ৮টি দেশের প্রতিনিধি যথা অস্ট্রেলিয়া, চিলি, চিন, ফ্রান্স, লেবানন, ইংল্যান্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতিনিধিরা এই খসড়া কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। শ্রীমতী এলেনের রুজভেল্টের নেতৃত্বে এই "বিল" সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ সভায় উপস্থিত ৫৮ সদস্যের মধ্যে ৪৮ জন সদস্যের ভোটে গৃহীত হয়। অন্য সদস্যরা ভোটদানে বিরত ছিলেন। সর্বজনীন মানবাধিকারের ঘোষণা বা মানবাধিকার সংক্রান্ত বিশ্বজনীন ঘোষণা (UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS) গৃহীত হয়। এটা ছিল সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ২১৭(৩) নং সিদ্ধান্ত। তবে এই সিদ্ধান্ত সকল রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে আইনগতভাবে বাধ্যতামূলক বলে ঘোষিত হয়নি। এই ঘোষণাপত্রের লক্ষ্য ছিল "...as a common standard of achievement for all people and all nations, to the end that every individual and every organ of society, keeping this Declaration constantly in mind,..." অবশ্য ১৯৬২ সালে সাধারণ সভায় সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হয়—"All states shall observe faithfully and strictly the provisions of the Charter of U. N., the Universal Declaration of Human Rights and..."। সারা বিশ্বে মানবাধিকারের ঘোষণা আজ এক বাস্তবতা। ১৯৫০ সাল হতে প্রতি বছর ১০ ডিসেম্বর **"মানবাধিকার দিবস"** হিসাবে পালিত হয়। ১৯৬৮ সালকে "আন্তর্জাতিক মানবাধিকার বছর" হিসাবে পালন করা হয়। উ-থান্ট বলেন, "পৃথিবীর প্রায় ৪৩টি দেশের সংবিধানে বিশ্বজনীন মানবাধিকারের স্পষ্ট প্রভাব পরিলক্ষিত হয়, যা এই ঘোষণাপত্রের গুরুত্বকে-ই নির্দেশ করে।"

সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্র একটি প্রস্তাবনা সহ ৩০টি ধারায় বিস্তৃত। এই ঘোষণাপত্রে মানুষের বিভিন্ন অধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতার কথা উল্লিখিত আছে। এগুলি একে একে আলোচনা করা যায়।

সর্বজনীন মানবাধিকারের ঘোষণাপত্রের প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে—"মানব পরিবারের সকল সদস্যের সহজাত মর্যাদা এবং অভিন্ন ও অপরিহার্য অধিকারের স্বীকৃতি হল স্বাধীনতা, ন্যায়বিচার এবং বিশ্বশান্তির মূলভিত্তি।" অর্থাৎ মানুষের অন্তর্নিহিত মর্যাদাবোধ এবং সমগ্র মানব পরিবারের জন্য সমান ও অহস্তান্তরযোগ্য অধিকারের স্বীকৃতিই হল বিশ্বে স্বাধীনতা, ন্যায়-নীতি ও শান্তির ভিত্তি। সুতরাং এমন এক জগতের উন্মেষ ঘটাতে হবে যেখানে মতপ্রকাশ ও বিশ্বাসের স্বাধীনতা বিরাজ করবে এবং সাধারণ মানুষ ভীতি ও অভাব থেকে মুক্ত হবে। বস্তুত, এই প্রত্যাশাই ব্যক্ত হয়েছে যে নাৎসি জার্মানিতে যে

ব্যাপক মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয় বা নৃশংস ঘটনা ঘটে তার আর পুনরাবৃত্তি আগামী দিনে কোথাও যেন না ঘটে। মানবাধিকারের ঘোষণাপত্রে এই কথাগুলিই প্রস্তাবনায় উল্লেখিত হয়েছে।

মানবাধিকারের ঘোষণাপত্রের তিনটি মূল অংশ আছে। যথা—প্রথমাংশ যা ১নং ধারায় সন্নিবেশিত, দ্বিতীয়াংশ ২-২১নং ধারা পর্যন্ত বিস্তৃত এবং তৃতীয়াংশ ২২-৩০নং ধারা নিয়ে গড়ে উঠেছে। ১নং ধারায় স্বাভাবিক অধিকারের তত্ত্বকে স্বীকার করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে প্রত্যেকে স্বাধীনভাবে জন্মগ্রহণ করে এবং অধিকার ও মর্যাদার ভিত্তিতে সকলেই সমান।

২ থেকে ২১নং ধারায় পৌর ও রাজনৈতিক অধিকারগুলির উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এই অংশে বর্ণিত অধিকারগুলি পশ্চিম উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক দেশগুলির, বিশেষত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিল অব রাইট্‌স অনুসরণে রচিত। যেগুলি এখানে বর্ণিত হয়েছে তা হল :

জীবনের অধিকার,
স্বাধীনতা ও নিরাপত্তার অধিকার,
স্বৈরাচারী গ্রেপ্তার ও আটকের বিরুদ্ধে অব্যাহতির অধিকার,
নিরপেক্ষ আদালতের দ্বারা ন্যায়বিচারের অধিকার,
মতপ্রকাশের অধিকার,
চিন্তা, বিবেক ও ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার,
গমনাগমন ও বসবাসের অধিকার,
বাসস্থান ও চিঠিপত্রের গোপনীয়তার অধিকার,
শান্তিপূর্ণভাবে সমবেত হবার অধিকার,
সংস্থা গঠনের অধিকার,
সম্পত্তির অধিকার,
ভোটাধিকার ও সরকারে যোগদানের অধিকার,
জাতীয়তার অধিকার—ইত্যাদি।

মানবাধিকারের ঘোষণাপত্রের তৃতীয়াংশে তথা ২২-২৭ নং ধারায় বর্ণিত অধিকারগুলি প্রকৃতিতে আর্থ-সামাজিক এবং সংস্কৃতিমূলক। একটি সুস্থ সমাজে এই অধিকারগুলি অপরিহার্য বলে বিবেচিত হয়। এই অধিকারগুলি মূলত সমাজতান্ত্রিক ভাবধারায় রচিত। এই অধিকারগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল :

কর্মের অধিকার,
উপযুক্ত জীবনযাত্রার মানের অধিকার,
সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার,
সাংস্কৃতিক জীবনে যোগ দেওয়ার অধিকার,
শিক্ষার অধিকার—ইত্যাদি।

ঘোষণাপত্রের ২৮নং ধারায় বলা হয়েছে উপরোক্ত অধিকার ও স্বাধীনতা পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করার জন্য সুষ্ঠু আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার দাবি সকলে করতে পারে কারণ এটা তাদের অধিকার।

মানবাধিকার ঘোষণার আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল সমাজের প্রতি নাগরিকদের কর্তব্য সম্পর্কে নির্দেশনামা। এই ঘোষণার ২৯নং ধারায় উল্লিখিত হয়েছে যে "সমাজের প্রতিটি ব্যক্তির কর্তব্য আছে,

কারণ সমাজেই প্রতিটি ব্যক্তি তাদের ব্যক্তিত্বের সর্বোচ্চ বিকাশ ঘটাতে পারে।'' সুতরাং সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের উদ্দেশ্য ও নীতির বিরোধিতা করে কোনো নাগরিক এই অধিকার ও স্বাধীনতা ভোগ করতে পারে না।

ন্যূনতম মানব অধিকার হিসাবে জীবনের অধিকার, স্বাধীনতার অধিকার ও নিরাপত্তার অধিকার চিহ্নিত হয়েছে। ১৯৭৬ সাল হতে এই সমস্ত অধিকার কার্যকর রূপ লাভ করে চলেছে। মানবাধিকার সংরক্ষণের দায়িত্ব সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ৬টি সংস্থার উপরেই মূলত ন্যস্ত।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায় সাধারণ সভার একটি সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও মানবিক কমিটি আছে। এই কমিটি মানবাধিকার সম্পর্কিত বিষয়গুলি পর্যালোচনা করে থাকে। দক্ষিণ আফ্রিকা, ইজরায়েল ও হাঙ্গেরিতে ব্যাপক মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ দেখা দিলে সাধারণ সভা এবিষয়ে তথ্যানুসন্ধান কমিটি নিয়োগ করে। ১৯৯৩ সালে মানবাধিকার রক্ষার জন্য আর একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করে তা হল সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মানবাধিকার বিষয়ক হাই কমিশনারের (United Nations High Commissioner for Human Rights) নিয়োগ। এই পদাধিকারীর মূল দায়িত্ব হল সমগ্র বিশ্বে মৌল মানবিক স্বাধীনতার যথাযথ প্রসার ঘটানো।

দ্বিতীয়ত, মানবাধিকার লঙ্ঘনের কোনো ঘটনা বিশ্বশান্তির পরিপন্থী প্রতিভাত হল নিরাপত্তা পরিষদও সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রে হস্তক্ষেপ করতে পারে। ১৯৬৬ সালে রোডেশিয়ায় ব্যাপকভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘন হলে নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করার নজির মেলে।

তৃতীয়ত, সচিবালয়ের একটি মানবাধিকার সম্পর্কিত বিভাগ আছে। এই বিভাগের মাধ্যমে মহাসচিব পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মানবাধিকার যাতে রক্ষিত হয় সে ব্যাপারে তীক্ষ্ণ নজর রাখেন।

চতুর্থত, আন্তর্জাতিক আদালত মানবাধিকার রক্ষায় একটি বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করে থাকে। মানবাধিকার সংক্রান্ত কোনো প্রশ্নে বিরোধ দেখা দিলে আন্তর্জাতিক বিচারালয় তার মীমাংসা করে থাকে।

পঞ্চমত, অছি পরিষদের অর্থই হল প্রতিটি জাতিকে শোষণের হাত থেকে রক্ষা করা, অনুন্নত জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে আত্মনিয়ন্ত্রণের ও স্বাধিকারের স্বীকৃতি দান এবং বৈষম্য নির্মূল করা। সুতরাং ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্ত করে মানুষকে স্ব-শাসনের মানবিক অধিকার প্রদান করাই হল এই সংস্থার লক্ষ্য। সূচনাতে ১১টি অঞ্চল অছি পরিষদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। অছি পরিষদের তৎপরতার জন্য একে একে ১১টি অছি অঞ্চলই আজ মুক্ত।

ষষ্ঠত, মানবাধিকার রক্ষায় সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের যে সংস্থা তা হল অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ। এই পরিষদ মানবাধিকার ও আনুষঙ্গিক বিষয়ে বেশ কয়েকটি কমিটি ও কমিশন গঠন করেছে। এদের মাধ্যমে প্রতিনিয়ত মানবাধিকারের মহান আদর্শ সুউচ্চে প্রতিষ্ঠায় এই সংস্থা সদা তৎপর। প্রকৃত অর্থে মানবাধিকারের ঘোষণা অর্থবহ হয়ে উঠেছে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদেরই মাধ্যমে।

মানবাধিকারের ঘোষণাকে বাস্তবায়িত করতে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ফলশ্রুতিতে পরবর্তীকালে নারী নির্যাতন দূরীকরণের অথবা শিশুর অধিকার সংক্রান্ত প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে এবং তা সারা বিশ্বে সমাদৃত হয়ে চলেছে।

৪.২.১ মানবাধিকার সম্পর্কিত বিশ্বজনীন ঘোষণার মূল্যায়ন (Evaluation of Universal Declaration of Human Rights)

১৯৪৮ সালে মানবাধিকার সংক্রান্ত বিশ্বজনীন ঘোষণা কার্যকর হবার পর দীর্ঘ ৬১ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। এ সময়ে পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রের ব্যাপক পরিবর্তন ঘটছে তাও স্পষ্ট। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতিকে অতিক্রম করে বহু নতুন দেশ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে। অপরদিকে রাজনীতিতে যে দ্বি-মেরুকরণ ঘটেছিল তারও অবসান হয়েছে। একদা শক্তিধর রাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়নের অস্তিত্ব আজ বিলুপ্ত। সমাজতন্ত্র যে শক্তি নিয়ে অগ্রসর হয়েছিল তা আজ ক্ষয়িষ্ণু। এই প্রেক্ষাপটে মানবাধিকার সংরক্ষণের বিষয়টি অত্যন্ত তাৎপর্যবহ এবং সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অভিপ্রেত সাফল্য অর্জন করা দুরূহ একথা স্বীকার করে নেওয়াই ভালো। সুতরাং সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণার অভিপ্রেত সাফল্য না-আসার নানাবিধ কারণ আছে। তন্মধ্যে মূল কারণগুলি উল্লিখিত হল—

প্রথমত, এইচ. জি. নিকোলাসের বক্তব্য দিয়েই শুরু করা যায়। তিনি বলেন যে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ঘোষিত মানবাধিকারের বাস্তব মূল্য নেই। কারণ এই অধিকারগুলিকে সংরক্ষণ করা বা মেনে চলার ক্ষেত্রে কোনো আইনগত বাধ্যবাধকতা নেই। ফলে সদস্যরাষ্ট্রগুলি এ সমস্ত অধিকারগুলি বলবৎ করতে আগ্রহ প্রকাশ করে না। বিশেষত সদস্যরাষ্ট্রগুলি জাতীয়তাবাদের নাম করে তথা রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব অক্ষুণ্ণ রাখার নামে দেশের অভ্যন্তরে বহুভাবে মানবাধিকার পদদলিত করে থাকে।

দ্বিতীয়ত, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ মানবাধিকারের কোনো নির্দিষ্ট মান স্থির করতে পারেনি। মানবাধিকার প্রশ্নে বিভিন্ন রাষ্ট্র ভিন্ন ভিন্ন মনোভাব গ্রহণ করে। ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে শ্রমিক শোষণ মানবাধিকারকে লঙ্ঘন করে বলে মনে করা হয় না, অপরদিকে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে স্বাধীনতার নামে কোনো দাবি আদায়ের আন্দোলন করলে তাকে নির্মমভাবে দমন করলেও তা মানবাধিকার বিরোধী বলে চিহ্নিত হয় না। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদে মানবাধিকার বা মৌলিক স্বাধীনতার কোনো সুস্পষ্ট সংজ্ঞা দেওয়া হয়নি।

তৃতীয়ত, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদে ২(৭) নং ধারায় বলা হয়েছে রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ হস্তক্ষেপ করতে পারে না। এই অভ্যন্তরীণ বিষয়ের নামে বহু রাষ্ট্র স্বীয় দেশের নাগরিকদের অধিকার ও মৌল স্বাধীনতা হরণ করে থাকে; কিন্তু সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ এরূপ ঘটনা ঘটলে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রকে বিরত করতে পারে না।

চতুর্থত, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের কাছে কোনো ব্যক্তি তার লঙ্ঘিত অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সরাসরি আবেদন করার কোনো সুযোগ নেই। ফলে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সামনে ব্যক্তি মানুষের মানবাধিকার লঙ্ঘিত হলেও নির্বাক দর্শকের ভূমিকা পালন করা ছাড়া তার আর গত্যন্তর নেই।

পঞ্চমত, ইভান লুয়ার্ড (Evan Luard)-এর বক্তব্য অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। তিনি *The United Nations: How it Works and What it Does* গ্রন্থে বলেন যে মানবাধিকার সংক্রান্ত ঘোষণা বহু ক্ষেত্রেই অস্পষ্ট এবং সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ মানবাধিকার লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে কোনো প্রকৃত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে না, ফলে সাধারণ মানুষের এই ঘোষণার প্রতি আস্থাহীনতাই প্রতীয়মান হয়েছে। বর্ণবিদ্বেষী বোথা সরকার কর্তৃক একদা কৃষ্ণাঙ্গদের ওপর অত্যাচার, শ্রীলঙ্কায় ভারতীয় বংশোদ্ভূতদের হত্যা, লস এঞ্জেলসের কৃষ্ণাঙ্গদের নিধন অথবা গণপ্রজাতন্ত্রী চিনে তিয়েন আন মেন স্কোয়ারে ছাত্রদের উপর চরম নিপীড়ন হওয়া সত্ত্বেও সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ কোনো কার্যকর পদক্ষেপ নিতে পারেনি।

মানবাধিকারের বিশ্বজনীন ঘোষণার নানা সীমাবদ্ধতা ও ব্যর্থতা থাকা সত্ত্বেও এর তাৎপর্য কিন্তু কম নয়। প্রথমত, মানবাধিকার সংক্রান্ত বিশ্বজনীন ঘোষণা সমগ্র বিশ্ববাসীকে গভীরভাবে আন্দোলিত করেছে। এর ফলশ্রুতি আমরা বিভিন্ন দেশের সংবিধানে প্রতিফলিত হতে দেখি। ১৯৬৮ সালে তৎকালীন মহাসচিব উ-থান্ট তেহরানে মানবাধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সম্মেলনে বলেন, "...there are no fewer that forty three constitutions adopted in recent years which are clearly inspired by the Universal Declaration, and that examples of legislation expressly quoting or reproducing provisions of the declaration can be found in all continents." দ্বিতীয়ত, মানবাধিকার সংক্রান্ত বিশ্বজনীন ঘোষণাপত্র আরও নতুন ঘোষণাপত্রের পথকে প্রশস্ত করেছে। ফলে মানবাধিকারের ক্ষেত্র আরও প্রসারিত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ ১৯৮১ সালে নারী নির্যাতন দূরীকরণ সংক্রান্ত ঘোষণাপত্র বা ১৯৯০ সালে শিশুর অধিকার সংক্রান্ত ঘোষণাপত্র বিশ্বজনীন মানবাধিকারের প্রেক্ষাপটেই ঘোষিত হয়। এগুলি হল মানবাধিকার সংক্রান্ত ঘোষণাপত্রেরই সমৃদ্ধতর রূপের প্রতিফলন। পরিশেষে, এটা স্বীকার করতেই হয় যে বিশ্বে দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা এবং সন্ত্রাসবাদের মতো সমস্যা থাকায় মানবাধিকার বাস্তবায়ন দুরূহ। রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে অর্থনৈতিক শোষণ ও বৈষম্য থাকলে সর্বজনীনভাবে মানবাধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করা যায় না। অথচ বাস্তব পৃথিবীতে তা আজও বিরাজমান। বিশেষত উন্নত দেশগুলির সঙ্গে অনুন্নত দেশের মধ্যে ব্যাপক অর্থনৈতিক বৈষম্য থাকায় অনুন্নত দেশের মানুষগুলি প্রতিনিয়ত নিঃস্বতা বা দারিদ্র্যের শিকার হচ্ছে। অর্থনৈতিকভাবে প্রাধান্যকারী দেশগুলি বিশেষত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মানবাধিকারের নামে গরিব দেশগুলির অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করতে সতত উদ্যত। এমনকি অন্য দেশগুলির সার্বভৌম অধিকারের উপর সে হস্তক্ষেপ করছে—যা একান্তভাবে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মহান আদর্শের পরিপন্থী। সাম্প্রতিককালে আর একটি অশুভ ইঙ্গিত স্পষ্ট হয়ে দেখা দিয়েছে তা হল অর্থনৈতিক দিক থেকে প্রাধান্যকারী দেশগুলি নিজেদের জন্য মানবাধিকারের অভিভাবকত্ব দাবি করে চলেছে।

সুতরাং মানবাধিকারের পতাকা ঊর্ধ্বে তুলে ধরতে হলে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জকে আরও অনেক বেশি সক্রিয় হয়ে বিশ্ব জনমত গড়ে তুলতে হবে এটা আজ অনস্বীকার্য।

৪.৩ ভারতে মানবাধিকার (Human Rights in India)

আঠারো শতকে দুটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা হল যথাক্রমে—(১) ফরাসি বিপ্লব ও (২) আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম। কারণ এ দু'টি ঘটনা সমগ্র বিশ্বে মানুষের অধিকার সম্পর্কে নতুন দিগন্তের সূচনা করে। ভারতেও এর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। বস্তুত সমাজসংস্কারকদের লেখনী ও নানান দাবিদাওয়ার মধ্য দিয়ে মানুষের অধিকার চেতনা ক্রমশ জাগ্রত হতে থাকে। তবে প্রকৃত অর্থে বলা যায় ব্রিটিশ ভারতেই মানবাধিকার প্রত্যয়টি ভারতে বিকশিত হয়।

১৮৯৫ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস মানবাধিকারের একটি রূপরেখা রচনা করে। তবে তা বেশি দূর অগ্রসর হতে পারেনি। বিশ শতকে ১৯১৮ সালে বোম্বাই কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে ভারতীয় জনগণের জন্য একটি "অধিকার-ঘোষণাপত্র" (Decleration of Rights) গৃহীত হয়। এতে বাক্ স্বাধীনতা, মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা, আইনানুগ বিচার প্রাপ্তি, জাতিগত বৈষম্যের অবসান প্রমুখ অধিকার দাবি করা হয়। বলা হয় মন্টেগু-চেমসফোর্ট সংস্কারের মধ্যে এগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। ব্রিটিশ শাসকবৃন্দ ঐ দাবি প্রত্যাখ্যান করে। ১৯২৭ ও ১৯২৮ সালে কংগ্রেস পার্টি অধিকারের একটি

আনুষ্ঠানিক নথি প্রকাশ করে কিছু এবারেও তা প্রত্যাখ্যাত হয়। ১৯৩১ সালে করাচি কংগ্রেস ভারতের জাতীয় কংগ্রেস অধিকার সংক্রান্ত একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে। ১৯৩৬ সালে জওহরলাল নেহরু পৌর স্বাধীনতা সংক্রান্ত সংগঠন গড়ে তোলেন এবং তা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নেতৃত্বে 'ইন্ডিয়ান সিভিল লিবার্টিস ইউনিয়ন' নামে পরিচিত হয়। এই সংগঠনে ২১ জন সদস্য ছিলেন যাঁরা প্রায় সকলেই ছিলেন উল্লেখযোগ্য শিল্পী, সাহিত্যিক বা রাজনীতিবিদ। পরিশেষে ১৯৪৫ সালে তেজবাহাদুর সাপ্রু মৌলিক অধিকারের গুরুত্বকে যথাযথ মর্যাদা দিয়ে একটি শাসনতান্ত্রিক প্রস্তাব গ্রহণ করেন যা পরবর্তীকালে ভারত সংবিধানে মৌলিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত হয়।

ভারত সংবিধানে মানবাধিকার স্বীকৃতি দেওয়া হয়। সংবিধানের প্রস্তাবনা ও বিভিন্ন ধারার মধ্যে তা ব্যক্ত হয়। গণপরিষদ ভারতীয় সংবিধান রচনা কালে আন্তর্জাতিক মানবাধিকারের বিশ্বজনীন ঘোষণাকে প্রায় পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করে। ফলত সংবিধানের প্রস্তাবনায় সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার, চিন্তা ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, বিশ্বাস ও ধর্মাচরণের ও উপাসনার স্বাধীনতা এবং মর্যাদা ও সুযোগসুবিধা ক্ষেত্রে সাম্য প্রতিষ্ঠা করার কথা ঘোষিত হয়।

দ্বিতীয়ত, সংবিধানের তৃতীয় অংশে (১২-৩৫ ধারা) সাম্যের অধিকার, স্বাধীনতার অধিকার, শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার, স্বাধীন ধর্মাচরণের অধিকার, সাংস্কৃতিক ও শিক্ষার অধিকার ও সাংবিধানিক প্রতিবিধানের অধিকার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে।

তৃতীয়ত, সংবিধানের চতুর্থ অংশে রাষ্ট্রীয় নির্দেশমূলক নীতির মাধ্যমে বহু অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকার প্রদানের কথা বলা হয়েছে।

চতুর্থত, ৩২৬ নম্বর ধারায় প্রতিটি প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিককে ভোটাধিকারে ভূষিত করা হয়েছে।

এ ছাড়া, সংখ্যালঘু তপশিলি জাতি ও তপশিলি উপজাতিদের বিশেষ অধিকার প্রদানের কথা ভারত সংবিধানে উল্লেখিত হয়েছে এবং প্রকৃত অর্থে ভারতীয় জনগণ এই অধিকার ভোগ করছে কিনা তা দেখার জন্য সংখ্যালঘুদের জন্য জাতীয় কমিশন, তপশিলি জাতি ও উপজাতিদের জন্য জাতীয় কমিশন, মহিলাদের জন্য জাতীয় কমিশন, প্রতিবন্ধীদের জাতীয় কমিশন ইত্যাদি গঠিত হয়েছে।

পাশাপাশি ভারতের জনগণ যাতে মানবাধিকার ভোগ করতে পারেন তার জন্য জাতীয় স্তরে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন এবং রাজ্যস্তরে রাজ্য মানবাধিকার কমিশন গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করে নাগরিক অধিকারকে প্রসারিত করেছে।

৪.৩.১ জাতীয় মানবাধিকার কমিশন (National Human Rights Commission in India)

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ সভায় তৃতীয় বার্ষিকী অধিবেশন ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর "মানবাধিকার সম্পর্কিত বিশ্বজনীন ঘোষণার" খসড়া গৃহীত হয়। এই অধিবেশনে ৫৮টি সদস্যরাষ্ট্র উপস্থিত ছিল এবং ৪৮টি রাষ্ট্র ভোট দিয়ে এই ঘোষণাকে বাস্তব রূপ দেয়। ভারত-রাষ্ট্র এই খসড়ার সপক্ষে ভোট দেয়।

স্বাভাবিকভাবে ভারত সরকার মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় সতত উন্মুক্ত থাকে। ১৯৯৩ সালে "মানবাধিকার সংরক্ষণ আইন" (Protection of Human Rights Act 1993) রচিত হয়। এই আইন অনুসারে বলা হয় জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সদর দপ্তর প্রতিষ্ঠিত হবে নতুন দিল্লিতে এবং এর চরিত্র হবে সর্বভারতীয়। অর্থাৎ ভারতের কোনো অঞ্চলে মানবাধিকার লঙ্ঘিত হলে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

তাতে হস্তক্ষেপ করতে পারবে। এছাড়া, সরকারের অনুমতি সাপেক্ষে কমিশন অন্যত্রও তার দপ্তর প্রতিষ্ঠা করতে পারে।

মানবাধিকার কমিশনের গঠন

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সদস্য সংখ্যা হল ৮। একজন সভাপতি পাঁচজন সদস্য যার ৩ জন পদাধিকার বলে এরই কমিশনের সদস্য হবেন। এম. জি. বালাকৃষ্ণান বর্তমানে এই সংস্থার সভাপতি (২০১০)। সদস্যদের যোগ্যতা সম্পর্কে উল্লেখিত হয়েছে যে—

(১) একজন সদস্য সুপ্রিমকোর্টের কর্মরত বা অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি হবেন।
(২) একজন সদস্য সুপ্রিমকোর্টের কর্মরত বা অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি হবেন।
(৩) একজন সদস্য হাইকোর্টের কার্যরত বা অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি হবেন।
(৪) দু'জন মানবাধিকার কর্মী হিসাবে সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব।
(৫) তিন জন পদাধিকার বলে সদস্য যথা—
(ক) সংখ্যালঘুদের জাতীয় কমিশনের সভাপতি,
(খ) তপশিলি জাতি ও তপশিলি উপজাতিদের জন্য জাতীয় কমিশনের সভাপতি,
(গ) মহিলাদের জন্য জাতীয় কমিশনের সভাপতি।

এ ছাড়া জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের একজন মহাসচিব থাকেন তিনি হবেন ভারত সরকারের সচিব পর্যায়ের আধিকারিক। তিনিই হবেন প্রশাসনিক আধিকারিক।

নিয়োগ পদ্ধতি

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সভাপতি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন। তবে এই নিযুক্তির পূর্বে রাষ্ট্রপতিকে একটি কমিটির কাছ থেকে সুপারিশ গ্রহণ করতে হয় তথা কমিশনের সভাপতি নিয়োগের জন্য একটি কমিটি থাকে এবং এই কমিটি নিম্নবর্ণিত পদাধিকারীদের নিয়ে গঠিত। যথা—(১) প্রধানমন্ত্রী—তিনি হলেন এই কমিটির সভাপতি; (২) লোকসভার স্পিকার; (৩) ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী; (৪) লোকসভার বিরোধী দল নেতা; এবং (৫) রাজ্যসভার সহ-সভাপতি। শুধু এদের পরামর্শক্রমেই রাষ্ট্রপতি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সদস্যদের নিযুক্ত করতে পারেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য রাষ্ট্রপতি যদি কোনো কর্মরত সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতি বা হাইকোর্টের বিচারপতিকে কমিশন সদস্য হিসাবে নিয়োগ করতে যান তাহলে তাঁকে ভারতের প্রধান বিচারপতির পরামর্শ নিতে হবে।

কার্যকালের মেয়াদ

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সভাপতি ও সদস্যবৃন্দরা পাঁচ বছরের জন্য নিয়োগপ্রাপ্ত হন। তবে কার্যকালের মেয়াদ অতিক্রান্ত হবার পূর্বে তিনি সত্তর বছর বয়স্ক হলে তাঁকে পূর্বেই অবসর গ্রহণ করতে হয়। সদস্যদের সত্তর বছর বয়স পর্যন্ত পুনঃনিযুক্তির অবকাশ আছে। প্রসঙ্গত এটা মনে রাখা দরকার সভাপতি ও নিযুক্ত সদস্যরা অবসর গ্রহণের পর কেন্দ্রীয় সরকার বা রাজ্য সরকারের অধীনে অন্য কোনো পদে নিযুক্ত হতে পারেন না।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সদস্য ও সভাপতিকে রাষ্ট্রপতি পদচ্যুত করতে পারেন। তবে পদচ্যুত করার ক্ষেত্রে দু'টি বিষয়ে তাঁকে মূলত বিবেচনা করতে হয় যথা—(১) সদস্যের প্রমাণিত অসদাচরণ বা দুর্নীতিমূলক কর্মে লিপ্ত থাকতে হবে এবং (২) সদস্যের কার্যপরিচালনায় অসামর্থ্য প্রমাণিত হতে হবে।

বস্তুত কমিশনের কোনো সদস্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকলে তখন সুপ্রিমকোর্টের কোনো বিচারপতিকে দিয়ে অনুসন্ধান করাতে হয়। সুপ্রিমকোর্ট অনুসন্ধান করে দোষী সাব্যস্ত করলেই তবে রাষ্ট্রপতি সংশ্লিষ্ট

কমিশন সদস্যকে অপসারিত করতে পারেন। এ ছাড়া আরও কয়েকটি কারণে রাষ্ট্রপতি এককভাবে কমিশনের সভাপতি বা কোনো সদস্যকে অযোগ্য বলে বিবেচিত করে অপসারণ করতে পারেন। সেই কারণগুলি হল ঃ

(ক) কোনো সদস্য দেউলিয়া বলে ঘোষিত হলে ;

(খ) কোনো সদস্য কমিশন সদস্য থাকাকালীন অন্য চাকরি গ্রহণ করলে ;

(গ) কোনো সদস্য শারীরিক বা মানসিক ভাবে অসমর্থ হয়ে পড়লে ;

(ঘ) কোনো সদস্য আদালত কর্তৃক বিকৃত মস্তিষ্ক সম্পন্ন বলে ঘোষিত হলে ;

(ঙ) কোনো সদস্য নৈতিক কারণে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলে।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ভারতীয় বিচার বিভাগের সমান্তরাল কোনো বিভাগ নয়। দেওয়ানি আদালতের সম পর্যায়ভুক্ত হলেও এই কমিশন কোনো অভিযোগের চূড়ান্ত বিচার, রায় বা দণ্ড দিতে পারে না। কমিশনের ক্ষমতা হল সুপারিশমূলক (recommendatory)। মানবাধিকার লঙ্ঘন হলে এই কমিশন সরকার বা অন্যান্য কর্তৃপক্ষকে পরামর্শ নির্দেশ দিতে পারে। এই পরামর্শ বা নির্দেশ বা সুপারিশ বাধ্যতামূলক নয়। মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটলে কমিশনকে সুপ্রিমকোর্ট বা হাইকোর্টের কাছে আবেদন করার মধ্য দিয়ে প্রতিকার করতে হয়।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের ক্ষমতা ও কার্যাবলি (Powers and functions of National Human Rights Commission)

ভারতে ১৯৯৩ সালে গৃহীত মানবাধিকার সংরক্ষণ সংক্রান্ত আইনের তৃতীয় অধ্যায়ে ১২ নম্বর থেকে ১৬ নম্বর অনুচ্ছেদে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের ক্ষমতা ও কার্যাবলি সম্পর্কে নির্দেশ মেলে। তবে ১২ নম্বর অনুচ্ছেদ সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এই অনুচ্ছেদে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের মূল কাজগুলি উন্মোচিত হয়েছে। যথা—

১. মানবাধিকার লঙ্ঘন বা এরূপ কাজে অপসহায়তা (abetment) বা প্রতিরোধের ক্ষেত্রে অবহেলা করলে কমিশন স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে অথবা অভিযোগের ভিত্তিতে বা প্রাপ্ত আবেদনের ভিত্তিতে অভিযোগ সম্পর্কে অনুসন্ধান করা।

২. কোনো আদালতে মানবাধিকার সংক্রান্ত বিচারাধীন মামলার শুনানিতে কমিশন অংশগ্রহণ করে মধ্যস্থতা করতে পারে। তবে এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট আদালতের অনুমোদন আবশ্যক।

৩. দণ্ডপ্রাপ্ত বা আটক ব্যক্তিদের জীবনযাপনের অবস্থা বা মান নিরীক্ষণের জন্য জাতীয় মানবাধিকার কমিশন কারাগারসমূহ পরিদর্শন করতে পারে এবং মানোন্নয়নের জন্য সুপারিশ করতে পারে।

৪. মানবাধিকার সংরক্ষণের ক্ষেত্রে সংবিধান বা আইন অনুসারে যথাযথ পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে কিনা তা মানবাধিকার কমিশন পুনঃনিরীক্ষণ করতে পারে এবং পদক্ষেপগুলি অধিক সক্রিয় ও উন্নত করার জন্য প্রয়োজনীয় সুপারিশ করতে পারে।

৫. মানবাধিকার ভোগের ক্ষেত্রে বা সংরক্ষণের ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান প্রতিবন্ধক হল সন্ত্রাসবাদী বা জঙ্গি কার্যকলাপ। এই প্রতিবন্ধকতা দুর করার ব্যাপারে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন প্রয়োজনীয় সুপারিশ করতে পারে।

৬. মানবাধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক চুক্তিপত্রসমূহ কমিশন পর্যালোচনা করতে পারে এবং তা যাতে ভারতে রূপায়িত হয় সে ব্যাপারে সুপারিশ করতে পারে।

৭. মানবাধিকার সংক্রান্ত গবেষণা কার্য যাতে বিস্তৃতি লাভ করে সে ব্যাপারে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন উদ্যোগ নিতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলেছে মানবাধিকার বিষয়ক আলোচনাচক্র, সেমিনার বা পাঠক্রম চালু করতে পারে।

৮. মানবাধিকার ও তার সম্ভাব্য রক্ষাকবচসমূহ সম্পর্কে নাগরিকদের সচেতন করার জন্য জাতীয় মানবাধিকার কমিশন উদ্যোগী হতে পারে।

৯. মানবাধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে কারবারি সংগঠনের প্রচেষ্টাকে ভারতের জাতীয় মানবাধিকার কমিশন উৎসাহিত করতে পারে।

১০. মানবাধিকার বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্যোগ নিতে পারে।

এ ছাড়া ভারতে মানবাধিকার কমিশন মানবাধিকার সম্পর্কিত বিদ্যমান অবস্থা সম্পর্কে একটি বার্ষিক প্রতিবেদন তৈরি করে এবং তা নিয়মিতভাবে কেন্দ্রীয় বা সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারের কাছে প্রেরণ করে। কেন্দ্রীয় সরকার পার্লামেন্টে এবং রাজ্য সরকার রাজ্য আইনসভায় তা উপস্থাপন করে এবং তা গ্রহণ করতে না-পারলে কারণ ব্যাখ্যা করতে হয়।

বস্তুত জাতীয় মানবাধিকার কমিশন মানবাধিকার ভঙ্গের কোনো অভিযোগ খতিয়ে দেখার জন্য দেওয়ানি আদালতের যাবতীয় ক্ষমতা ও মর্যাদা লাভ করেছে। দেওয়ানি কার্যপদ্ধতি বিধি (Code of Civil Procedure) অনুসারে জাতীয় কমিশন—

(১) সাক্ষীদের সমন করতে ও উপস্থিত হতে বাধ্য করতে পারে।

(২) অধিকার ভঙ্গ সংক্রান্ত নথিপত্র খুঁজে বের করা ও সেগুলিকে অধিকার রক্ষার প্রয়োজনে দেখা করতে পারে।

(৩) বাদী-বিবাদীপক্ষের শপথপত্রের ভিত্তিতে সাক্ষ্য গ্রহণ করা।

(৪) সরকারি নথিপত্র ও তার অনুলিপি চেয়ে পাঠাতে পারে।

(৫) ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে ক্ষতিপূরণ দেবার জন্য সরকার বা প্রতিষ্ঠানকে সুপারিশ করতে পারে।

(৬) জাতীয় মানবাধিকার কমিশন সাক্ষী বা নথি পরীক্ষার জন্য কমিশন নিয়োগ করতে পারে।

এ ছাড়া, ভারতে মানবাধিকার কমিশন মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকার বা রাজ্য সরকারের সম্মতিক্রমে তাদের অধীনে কর্মরত কোনো আধিকারিক বা তদন্তকারী সংস্থার সাহায্য নিতে পারে।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের মূল্যায়ন : ভারতে বহু মানুষ আছেন যাঁরা আজও নিরক্ষর। বিচার-বুদ্ধিহীন মানুষের সংখ্যা খুব কম নয়। ফলে মানবাধিকার পালিত হচ্ছে কি হচ্ছে না তা বোঝার মতো লোকের অভাব আছে। যাই হোক, রাজনৈতিক দলগুলি ও কিছু স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা মানবাধিকারকে বর্ম করে মানব অধিকার লঙ্ঘনকে প্রতিরোধ করতে আগ্রহী। উদাহরণস্বরূপ টাডা [Terrorist and Disruptive Activities (Prevention) Act—TADA] নিয়ে সরকার ও মানবাধিকার কমিশনের মধ্যে মতপার্থক্য হয়।

পাশাপাশি জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ভারতীয় জনগণের অধিকার রক্ষার অন্যতম হাতিয়ার হিসাবে বেশকিছু নজির মেলে কারণ জাতীয় মানবাধিকার কমিশন গঠিত হবার পর প্রথম ৬ মাসে ৫০০টি মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাকে এককভাবে তদন্ত করে।

তবে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের পক্ষে ভারতের মতো বিশাল জনবহুল দেশে এককভাবে মানবাধিকার রক্ষা করা সম্ভব নয় সে কথা বলার আর অপেক্ষা রাখে না।

৪.৩.২ রাজ্য মানবাধিকার কমিশন (State Human Rights Commission)

১৯৯৩ সালে মানবাধিকার সুরক্ষা আইন রচিত হয়। এই আইনে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন রাজ্য মানবাধিকার কমিশন ও মানবাধিকার আদালত (Human Rights Courts)-এর আলোচনা মেলে। রাজ্য মানবাধিকার কমিশনের আলোচনার জন্য ঐ আইনের পঞ্চম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

মানবাধিকার আইনের ২১ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে যে কোনো রাজ্য সরকার নিজ রাজ্যের জন্য রাজ্য মানবাধিকার কমিশন গঠন করতে পারে। এই আইন অনুসারে ২০০০ সালের মধ্যে ৪টি রাজ্য তথা পশ্চিমবঙ্গ, মধ্যপ্রদেশ, হিমাচল প্রদেশ এবং আসাম রাজ্য মানবাধিকার কমিশন গঠন করে। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মানবাধিকার কমিশন ১৯৯৫ সালের ৩১ জানুয়ারি গঠিত হয়।

রাজ্য মানবাধিকার কমিশনের গঠন প্রায় জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সমতুল। এতে শুধু পদাধিকার বলে তিন কমিশনের সভাপতিরা থাকেন না। রাজ্য মানবাধিকার কমিশনের সদস্যরা হলেন—

(১) একজন সভাপতি যিনি কোনো হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারক।

(২) একজন হাইকোর্টের কর্মরত বা অবসরপ্রাপ্ত বিচারক।

(৩) একজন বর্তমান বা প্রাক্তন জেলা জজ।

(৪-৫) দু'জন মানবাধিকার বিশেষজ্ঞ বা অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তি।

রাজ্য মানবাধিকার কমিশনের একজন সচিব থাকেন। তিনিই এই সংস্থার প্রধান কার্যনির্বাহী আধিকারিক। উদাহরণস্বরূপ পশ্চিমবঙ্গে প্রথম রাজ্য মানবাধিকার কমিশনের সভাপতি ছিলেন চিত্ততোষ মুখার্জী এবং সদস্যরা ছিলেন—(১) সামসুদ্দিন আহমেদ, (২) রমাপ্রসাদ সমাদ্দার (৩) রবীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এবং (৪) উমা আহমেদ। বর্তমানে (২০১০) শ্যামল সেন হলেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মানবাধিকার কমিশনের সভাপতি। মানবাধিকার সুরক্ষা আইন, ১৯৯৩ অনুসারে রাজ্য মানবাধিকার কমিশনের সদস্যদের নিয়োগ করেন রাজ্যপাল। তবে রাজ্যপালকে কেন্দ্রের ন্যায় রাজ্যেও মুখ্যমন্ত্রী, রাজ্য বিধানসভার স্পিকার, রাজ্য স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ও বিধানসভায় বিরোধী দলনেতা নিয়ে গঠিত কমিটির সুপারিশ মোতাবেক এই নিয়োগ রতে হয়। এ ছাড়া, যে রাজ্যে বিধানপরিষদ আছে সে রাজ্যে বিধানপরিষদের সভাপতি ও পরিষদের বিরোধী নেতাকে এই কমিটির সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

২২(১) নম্বর ধারায় আরও বলা হয়েছে যে রাজ্যের হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির সঙ্গে পরামর্শ ব্যতিরেকে কোনো কর্মরত বিচারক বা জেলা জজকে রাজ্য মানবাধিকার কমিশনের সদস্য করা যাবে না।

রাজ্য মানবাধিকার কমিশনের সদস্যদের রাজ্যপাল অপসারণ করতে পারেন না। এই আইনের ২৩ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের ন্যায় রাজ্যে রাজ্য মানবাধিকার কমিশনের সভাপতি ও সদস্যদের রাষ্ট্রপতি অপসারণ করতে পারেন। প্রমাণিত অসদ আচরণ বা অক্ষমতার কারণেই এদের অপসারণ করা যাবে। তবে অপসারণের পূর্বে সুপ্রিমকোর্টকে উক্ত বিষয়ে তদন্ত করতে বলা হবে এবং তদন্ত রিপোর্টে অভিযুক্ত সভাপতি বা সদস্য সম্পর্কে নেতিবাচক সুপারিশ থাকলে তবেই তাকে অপসারণ করা যাবে।

এ ছাড়া রাষ্ট্রপতি এককভাবে রাজ্য কমিশনের সভাপতি বা সদস্যকে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সভাপতি ও সদস্যদের ন্যায় নিম্নোক্ত কারণে অপসারিত করতে পারেন। যথা—

(১) দেউলিয়া বলে প্রমাণিত হলে,

(২) কমিশনের কর্মরত থাকাকালীন অন্য কোনো চাকরি গ্রহণ করলে,
(৩) শারীরিক বা মানসিক অক্ষম বলে বিবেচিত হলে,
(৪) আদালত কর্তৃক উন্মাদ বলে ঘোষিত হলে, অথবা
(৫) নৈতিক অপরাধে দণ্ডিত হলে।

রাজ্য মানবাধিকার কমিশনের সভাপতি ও সদস্যদের কর্মভার হল সাধারণভাবে ৫ বছর। তবে সত্তর বছরের বেশি বয়সে এই সদস্যপদ থাকবে না। সভাপতিকে পুনঃনিযুক্ত করা যায় না। সদস্যদের পুনরায় নিযুক্ত হবার সুযোগ আছে কিন্তু ইতিমধ্যে, ৭০ বছর বয়স হয়ে গেলে পুনঃনিযুক্তি হয় না।

অবসর গ্রহণের পর কেন্দ্রীয় বা কোনো রাজ্য সরকারের অধীনে কোনো কাজ করতে পারবেন না। বেতন, ভাতা ও কাজের শর্তাদি রাজ্য সরকার স্থির করে।

রাজ্য মানবাধিকার কমিশনের ক্ষমতা ও কার্যাবলি সম্পর্কে মূল আইন তথা মানবাধিকার সুরক্ষা আইন, ১৯৯৩-তে আলাদা কোনো আলোচনা নেই। বলা আছে এই আইনের ৯, ১০ এবং ১২-১৮ নম্বর ধারায় বর্ণিত আইন অনুসারে রাজ্য কমিশন তার কার্যাবলি কার্যকর করবে। রাজ্য মানবাধিকার কমিশন দেওয়ানি আদালতের ন্যায় ক্ষমতায় বলীয়ান হবে তবে কোনো সমান্তরাল আদালত হিসাবে কাজ করবে না।

রাজ্য মানবাধিকার কমিশনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল রাজ্যে আইন লঙ্ঘনের প্রতিবিধান করা শুধু নয় বরং প্রতিবছর রাজ্য সরকারের কাছে একটি বার্ষিক প্রতিবেদন পেশ করা। রাজ্য সরকার আবার এই প্রতিবেদন ও এই প্রতিবেদন ভিত্তিক কী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে তা বিধানসভায় পেশ করে। রাজ্য কমিশনের কোনো সুপারিশ রাজ্য সরকার গ্রহণ না-করলে তার কারণও রাজ্য আইনসভাকে জানাতে হয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য মানবাধিকার ভঙ্গের ব্যাপারে কোনো অভিযোগ জানাতে হলে ঘটনার পূর্ণ বিবরণ লিখিতভাবে স্বয়ং বা তার পক্ষে কোনো ব্যক্তি রাজ্য কমিশনের নিকট দাখিল করে। অভিযোগ দাখিল করার জন্য কোনো কোর্ট ফি স্ট্যাম্প বা খরচ লাগে না এবং মানবাধিকার লঙ্ঘন হলে সেদিন থেকে এক বছরের মধ্যে অভিযোগ দাখিল করতে হয়।

পশ্চিমবঙ্গের অভিজ্ঞতার নিরিখে বলা যায় রাজ্য সরকার মানবাধিকার কমিশন প্রদত্ত অধিকাংশ সুপারিশ কার্যকর করে থাকে।

নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি

১. Pandey, V. P. : *International Perspectives of Human Rights*, Mohit Publications, New Delhi, 1999.

২. —— : United Nations World Conference on Human Rights: *The Vieana Declaration and Programme of Action*, New York, 1993.

৩. Vincent, R. J. : *Human Rights and International Reletions*, Cambridge University Press, Cambridge, 1987.

৪. চক্রবর্তী, রাধারমণ : *সমকালীন আন্তর্জাতিক সম্পর্ক*, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, ১৯৯৯।

অধ্যায় ৬

মৌলিক অধিকার ও কর্তব্যসমূহ
[Fundamental Rights and Duties]

অধ্যায়সূচী

|| ১ মৌলিক অধিকারের অর্থ ও প্রকৃতি ২ ভারতীয় সংবিধানের মৌলিক অধিকারের পটভূমি ৩ ভারতীয় সংবিধানে মৌলিক অধিকারগুলি লিপিবদ্ধ করার কারণ ৪ ভারতীয় সংবিধানে সন্নিবিষ্ট অধিকারগুলির বৈশিষ্ট্য ৫ মৌলিক অধিকার এবং সংবিধান সংশোধন ৬ ভারতীয় নাগরিকদের মৌলিক অধিকার সমূহ ৭ সাম্যের অধিকার ৮ স্বাধীনতার অধিকার ৯ শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার ১০ ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার ১১ সংস্কৃতি ও শিক্ষাগত অধিকার ১২ সম্পত্তির অধিকারের পরিবর্তন ও বিবর্তন ১৩ শাসনতান্ত্রিক প্রতিবিধানের অধিকার ১৪ মৌলিক অধিকারসমূহের সমালোচনা ও মূল্যায়ন ১৫ ভারতীয় নাগরিকদের মৌলিক কর্তব্যসমূহ ||

৬.১ মৌলিক অধিকারের অর্থ ও প্রকৃতি (Meaning and Nature of Fundamental Rights)

বর্তমান বিশ্বের অধিকাংশ দেশেই গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত আছে। নাগরিকদের ব্যক্তিত্বের সর্বাধিক বিকাশ সাধনই হল গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার মুখ্য উদ্দেশ্য। ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধনের জন্য প্রয়োজন হল স্বাধীনতার পরিবেশ। বিভিন্ন প্রয়োজনীয় অধিকারের সমাহারে সৃষ্টি এই স্বাধীনতার পরিবেশ। তাই বলা হয় যে স্বাধীনতা হল অধিকারের ফল (Liberty is the product of rights)। এই কারণে ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধনের জন্য গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে কতকগুলি প্রয়োজনীয় অধিকার স্বীকার ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়।

মৌলিক অধিকারের ধারণা : নাগরিকদের বিশেষ অধিকার গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে স্বীকার ও সংরক্ষণের প্রয়োজন আছে। গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার মূল ভিত্তি হল মৌলিক অধিকার। জাতিপুঞ্জের মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণায় (Universal Declaration of Human Rights)-ও মৌলিক অধিকারের উল্লেখ আছে। বলা হয়েছে যে, প্রত্যেক মানুষেরই জীবনের, স্বাধীনতার, নিরাপত্তার ও দাসত্ব থেকে মুক্তির অধিকার সমেত কতকগুলি অধিকার ভোগের অধিকার আছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রেও অনুরূপ উল্লেখ আছে। বলা হয়েছে যে, পৃথিবীতে সকলে সমান হয়ে জন্মেছে। জীবন, স্বাধীনতা এবং সুখ অন্বেষণের উদ্দেশ্যে সকলেই কতকগুলি অধিকারযুক্ত। এই সমস্ত অধিকার হস্তান্তরের অযোগ্য।

অপরিহার্য অধিকার : মানুষের জীবন ও ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য কতকগুলি সুযোগ-সুবিধা বা অধিকার দরকার। এই সমস্ত অধিকারের মধ্যে কতকগুলি দেশ ও কালের আপেক্ষিক এবং পরিবর্তনশীল। আবার মানুষের জীবন ও ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধনের ক্ষেত্রে সকল অধিকারের গুরুত্বও সমান নয়। কিন্তু কতকগুলি অধিকার সুস্থ ও সভ্য জীবনযাপনের পক্ষে একান্তভাবে অপরিহার্য। তাই অধিকারগুলি প্রায় সকল দেশেই স্বীকৃত। এই সমস্ত অধিকারকে অস্বীকার করলে নাগরিকের সহজ ও স্বাভাবিক ব্যক্তিত্ব বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হয়। এই অপরিহার্য অধিকারগুলিই মৌলিক অধিকার হিসাবে গণ্য হয়। ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ এবং ব্যক্তির জীবনকে সুন্দর করার ক্ষেত্রে মৌলিক অধিকার অপরিহার্য।

অপরিহার্যতাই মাপকাঠি নয় : তবে অপরিহার্যতাই মৌলিক অধিকারের একমাত্র মাপকাঠি নয়। মৌলিক অধিকারগুলি অবশ্যই দেশের উচ্চতর আইনের দ্বারা সংরক্ষিত হবে। জোহারী (J. C. Johari) বলেছেন: "A fundamental right may be defined as an interest protected by the higher law of land." এই সমস্ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধিকার রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত ও সংরক্ষিত হয়। এবং সাধারণতঃ এই সমস্ত অধিকার সংবিধানে লিখিতভাবে সংরক্ষিত থাকে। অধিকারগুলি লিপিবদ্ধ থাকে বলে জনগণ তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন থাকে। মৌলিক অধিকারের উপর যদি কোন রকম হস্তক্ষেপের ঘটনা ঘটে তাহলে সর্বোচ্চ আদালতের মাধ্যমে তার পুনঃপ্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করা যায়।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানে সাংবিধানিক অর্থে মৌলিক অধিকারকে ব্যবহার করা যায়। কতকগুলি সুযোগ-সুবিধাকে মৌলিক অধিকার বলা হয় এই অর্থে যে এগুলি মানুষের মৌল প্রয়োজন পূরণ করে। মৌলিক অধিকারের

উদাহরণ হিসাবে জীবনের অধিকার, স্বাধীনতার অধিকার প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। সংবিধানে লিপিবদ্ধ মৌলিক অধিকারগুলি সকল দেশেই অত্যন্ত পবিত্র ও গুরুত্বপূর্ণ বলে গণ্য হয়।

বিচারপতি পাতঞ্জলী শাস্ত্রীর অভিমত : এ. কে. গোপালন বনাম মাদ্রাজ রাজ্য মামলায় (১৯৫০) রায় প্রদান প্রসঙ্গে বিচারপতি পাতঞ্জলি শাস্ত্রী (Patanjali Shastri)-র অভিমত এক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য। তাঁর মতানুসারে মৌলিক অধিকার শাসন ও আইন-বিভাগের কর্তৃত্বের বাইরে থাকে। জনগণই হল চরম সার্বভৌম কর্তৃত্বের অধিকারী। তাই জনগণ এই অধিকারগুলিকে নিজেদের হাতে রাখে। এবং তাই এগুলি মৌলিক অধিকার। মৌলিক অধিকার হল সেই সমস্ত অধিকার যার সাহায্যে মানুষের অন্তর্নিহিত গুণাবলীর বিকাশ ঘটে, যে সমস্ত অধিকার সংবিধানে সংরক্ষিত থাকে, সে সমস্ত অধিকার শাসন-বিভাগ ও আইন-বিভাগের নিয়ন্ত্রণ মুক্ত থাকে এবং সে সমস্ত অধিকার রাজনৈতিক ভাগ্য পরিবর্তনের ঊর্ধ্বে।

সাধারণ অধিকারের সঙ্গে পার্থক্য : সাধারণ অধিকারের সঙ্গে মৌলিক অধিকারের পার্থক্য আছে। (১) সাধারণ অধিকারগুলি দেশের সাধারণ আইনের দ্বারা সংরক্ষিত ও রূপায়িত হয়। কিন্তু মৌলিক অধিকারগুলি দেশের মৌলিক আইন অর্থাৎ সংবিধানের দ্বারা স্বীকৃত ও সংরক্ষিত হয়। ভারতীয় সংবিধান বিশেষজ্ঞ দুর্গাদাস বসু বলেছেন: "A fundamental right is one which is protected and guaranteed by the written constitution of the state." (২) মৌলিক অধিকার আইন-বিভাগ ও শাসন-বিভাগের নিয়ন্ত্রণ মুক্ত। কিন্তু অন্যান্য অধিকার তা নয়। (৩) মৌলিক অধিকারগুলি আদালত কর্তৃক বিশেষভাবে বলবৎযোগ্য; অন্যান্য অধিকারগুলি তা নয়। (৪) সংবিধানের সংশোধন ছাড়া কোন মৌলিক অধিকার পরিবর্তন করা যায় না। কিন্তু সাধারণ অধিকারগুলি সাধারণ আইন পাসের পদ্ধতির মাধ্যমেই সংশোধন করা যায়।

এই কারণে গুরুত্বপূর্ণ অধিকারগুলি দেশের মৌলিক আইন হিসাবে সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সংবিধানে লিপিবদ্ধ মৌলিক অধিকার হল ক্ষমতাসীন সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে সর্বশ্রেষ্ঠ রক্ষাকবচ। গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য এই মৌলিক অধিকার অপরিহার্য। এখনকার রাষ্ট্রব্যবস্থাসমূহ সাধারণতঃ মানবতাবাদী, সমাজতান্ত্রিক ও প্রজাতান্ত্রিক ভাবাদর্শ অনুসারে পরিচালিত হয়। এই সমস্ত রাষ্ট্রব্যবস্থায় অধিক সংখ্যায় মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত সাংবিধানিক বন্দোবস্ত গ্রহণের প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়।

ভারতের সংবিধানে গণতান্ত্রিক রীতিনীতির উপর জোর দেওয়া হয়েছে। এবং মৌলিক অধিকার হল এর মূল ভিত্তি [**সজ্জন সিং বনাম রাজস্থান সরকার (১৯৬৫)**]। আবার **মানেকা গান্ধী বনাম ভারত সরকার** (১৯৭৮) মামলায় রায় দান প্রসঙ্গে বিচারপতি ভগবতীর অভিমত অনুযায়ী মৌলিক অধিকারের মাধ্যমে এ দেশের মানুষের সনাতন মূল্যবোধের অভিব্যক্তি ঘটেছে। ব্যক্তি-মানুষের ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ ও মানুষের মর্যাদা রক্ষার জন্য মৌলিক অধিকার অপরিহার্য। মৌলিক অধিকারের ভিত্তিতে মানবাধিকারের মূল কাঠামো বজায় থাকে। তা ছাড়া মৌলিক অধিকার ব্যক্তি স্বাধীনতার উপর রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ রোধ করে। ভারতের সংবিধানের তৃতীয় অধ্যায়ে মানবাধিকার সম্পর্কিত বিষয়াদির উল্লেখ আছে। ভারতের সংবিধানে মানবাধিকার সম্পর্কে অধিকতর বিশদ ব্যাখ্যা বর্তমান। মানবাধিকার সম্পর্কিত সর্বজনীন ঘোষণাপত্র প্রকাশিত হওয়ার পর ভারতের সংবিধানের মৌলিক অধিকার সম্পর্কিত অধ্যায়টি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ভারতের সংবিধান রচয়িতারা মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণার মূল নীতিগুলিকে সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রদানের ব্যাপারে বিশেষভাবে আগ্রহী ও আন্তরিক ছিলেন। সমকালীন গণতান্ত্রিক ও মানবিক ধ্যান-ধারণা এ ক্ষেত্রে এদেশের সংবিধান প্রণেতাদের অনুপ্রাণিত করেছে। ভারতের সংবিধানের প্রস্তাবনায় ব্যক্তির মর্যাদা সম্পর্কিত উল্লেখ মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণার মূলমন্ত্র হিসাবে পরিগণিত হয়। প্রস্তাবনায় এই উল্লেখ মৌলিক অধিকার ও নির্দেশমূলক নীতির মধ্যে অধিকতর বিকশিত রূপ লাভ করেছে। তা ছাড়া সংখ্যালঘুদের বিশেষ সমস্যাদির মোকাবিলা এবং তাদের অধিকারের সুরক্ষার ব্যাপারেও মৌলিক অধিকারের অধ্যায়টি গুরুত্বপূর্ণ। **পশ্চিমবঙ্গ বনাম সুবোধগোপাল (১৯৫৪)** মামলায় রায় দান প্রসঙ্গে প্রধান বিচারপতি পাতঞ্জলি শাস্ত্রী মন্তব্য করেছেন যে, সংবিধান স্বীকৃত স্বাধীনতা ও অধিকারকে রাষ্ট্রের স্বৈরাচারী আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করাই হল সংবিধানের তৃতীয় অধ্যায়ের মূল লক্ষ্য।

বৈশিষ্ট্য : উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে মৌলিক অধিকারের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা যায়। (১) মৌলিক অধিকার হল ব্যক্তিজীবনের প্রয়োজন পূরণের ক্ষেত্রে মৌলিক এবং সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অধিকার। (২) দেশের সংবিধান কর্তৃক এই অধিকারগুলি স্বীকৃত ও সংরক্ষিত হয়। (৩) মৌলিক অধিকার আইন-বিভাগ ও শাসন-বিভাগের নিয়ন্ত্রণ মুক্ত। (৪) মৌলিক অধিকার রাজনৈতিক ভাগ্য পরিবর্তনের ঊর্ধ্বে। (৫) মৌলিক অধিকার আদালত কর্তৃক বলবৎযোগ্য। (৬) মৌলিক অধিকার পরিবর্তনের জন্য

বিশেষ সাংবিধানিক পদ্ধতি অনুসরণ করতে হয়। (৭) রাষ্ট্র ও সমাজের চোখে মৌলিক অধিকারের মর্যাদা ও তাৎপর্য অধিক।

৬.২ ভারতীয় সংবিধানের মৌলিক অধিকারের পটভূমি (Background of the Fundamental Rights of the Indian Constitution)

ভারতের বর্তমান সংবিধানই প্রথম অধিকারের সনদ গৃহীত হয় : স্বাধীন ভারতের নতুন সংবিধান প্রণীত হওয়ার আগে দেশবাসীর জন্য কোন অধিকারের সনদ ছিল না। ব্রিটিশ সরকারের ভারত শাসনের অন্যতম বৈশিষ্ট্যই ছিল নাগরিক অধিকারের অস্বীকৃতি। ব্রিটিশ-ভারতে বিভিন্ন সময়ে ভারতীয় জনগণের অধিকারের দাবি ব্রিটিশ সরকারের কাছে পেশ করা হয়েছে। বস্তুতঃ ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে পরিচালিত বিভিন্ন জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মধ্যে ভারতবাসীর নাগরিক অধিকারের দাবি-দাওয়া অন্তর্ভুক্ত ছিল। ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে ঔপনিবেশিকতাবাদ-বিরোধী জাতীয়তাবাদী আন্দোলন পরিচালনার প্রাক্কালেই ভারতীয় জনগণের অধিকারসমূহ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা শুরু হয়। এই চিন্তা-ভাবনাকে গণপরিষদের সদস্যরা গভীর বিচার বিবেচনার পর সুস্পষ্ট ও সংগঠিত রূপ দেন। ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন যাঁদের বিচক্ষণ নেতৃত্বে পরিচালিত হয়েছিল তাঁরাই পরবর্তীকালে সংবিধান রচনার ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। দেশবাসীর নাগরিক অধিকার সম্পর্কিত দাবি-দাওয়া ব্রিটিশ সরকার কর্তৃত্ব প্রত্যাখ্যাত হওয়ার তিক্ত অভিজ্ঞতা এই সব নেতাদের ছিল। দেশের সংবিধান রচনার সুযোগ পেয়ে তাঁরা যে ভারতীয়দের মৌলিক অধিকার বিধিবদ্ধ করার ব্যাপারে যথেষ্ট যত্নবান হবেন তা ছিল নিতান্তই স্বাভাবিক।

নাগরিক অধিকার সম্পর্কিত বিভিন্ন পদক্ষেপ : ভারতের জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৮৫ সালে। ভারতের জনগণের নাগরিক অধিকারের স্বীকৃতি সম্পর্কিত দাবি-দাওয়ার প্রশ্নে জাতীয় কংগ্রেস বিভিন্ন বিক্ষোভ আন্দোলন সংগঠিত করে। এই সংস্থা ১৯১৭ থেকে ১৯১৯ সালের মধ্যে ভারতবাসীর জন্য ইংরেজদের সমান মর্যাদা ও নাগরিক অধিকারের ব্যাপারে বিভিন্ন প্রস্তাব গ্রহণ করে। এক্ষেত্রে ১৮৯৫ সালের ভারতের সংবিধান বিল (Constitution of Indian Bill, 1895)-এর কথা উল্লেখ করা দরকার। এই বিলের ১৬ ধারায় কতকগুলি অধিকারের উল্লেখ করা হয়। তার মধ্যে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, কেবলমাত্র উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গ্রেপ্তারের ব্যবস্থা, বিনা বেতনে শিক্ষা প্রভৃতি অধিকারের কথা বলা দরকার। এর পর কমনওয়েলথ অব ইণ্ডিয়া বিল, ১৯২৫ (Commonwealth of India Bill, 1925)-এর উল্লেখ আবশ্যক। এই বিলে নাগরিক অধিকার সম্পর্কিত জাতীয় কংগ্রেসের প্রস্তাবের প্রতি সমর্থন পরিলক্ষিত হয়। এই বিলের ৮ ধারায় কতকগুলি উল্লেখ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই সমস্ত অধিকারের মধ্যে আইনের দৃষ্টিতে সাম্য, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, শান্তিপূর্ণভাবে নিরস্ত্র হয়ে সমবেত হওয়ার অধিকার, বিবেক ও ধর্মাচরণের অধিকার, সম্পত্তির অধিকার প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। জাতীয় কংগ্রেসের ৪৩তম বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় ১৯২৭ সালে মাদ্রাজে। এই অধিবেশনে দেশবাসীর অধিকার সম্বলিত সংবিধানের খসড়া প্রণয়নের জন্য একটি কমিটি গঠনের প্রস্তাব করা হয়। মতিলাল নেহরুর নেতৃত্বে ১৯২৮ সালের মে মাসে এই কমিটি গঠন করা হয়। নেহরু কমিটির প্রতিবেদনের উপর কমনওয়েলথ অব ইণ্ডিয়া বিলের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অধিকার সংরক্ষণের ব্যাপারে এই প্রতিবেদনে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। অনেকের মতানুসারে এই প্রতিবেদনই হল ভারতের বর্তমান সংবিধানের তৃতীয় অধ্যায়ের মৌলিক অধিকারের পূর্বসূরী। ১৯৩১ সালে কংগ্রেসের করাচী অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এই অধিবেশনে মৌলিক অধিকারের উপর বিশেষভাবে জোর দেওয়া হয়। সঙ্গে সঙ্গে আর্থ সামাজিক পরিবর্তনের উপরও গুরুত্ব আরোপ করা হয়। নেতিবাচক রাজনৈতিক অধিকারের সঙ্গে সঙ্গে ইতিবাচক আর্থ-সামাজিক অধিকারের দাবিও গুরুত্ব সহকারে উত্থাপিত হয়। ভারতের জাতীয়তাবাদী নেতারা লণ্ডনের গোলটেবিল বৈঠকেও মৌলিক অধিকার সম্পর্কিত দাবিদাওয়া পেশ করেছিলেন।

সপ্রু কমিটির প্রতিবেদন : ভারতের জনগণের জন্য মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত ভারতীয় নেতাদের যাবতীয় প্রস্তাব ব্রিটিশ সরকার কার্যত উপেক্ষা করেছে। তবে পরবর্তীকালে স্বাধীন ভারতের সংবিধানের মৌলিক অধিকার সম্পর্কিত অধ্যায়টি প্রণয়নের প্রাক্কালে এই সমস্ত প্রস্তাব প্রভাব বিস্তার করেছে। ১৯৪৪-৪৫ সালে একটি সর্বদলীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে সপ্রু কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটির প্রতিবেদনে নানা দিক থেকে মৌলিক অধিকারের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এই প্রতিবেদনে দু ধরনের অধিকারের কথা বলা হয়। বলা হয় যে কতকগুলি অধিকার হবে আদালত কর্তৃক বলবৎযোগ্য এবং কতকগুলি অধিকার আদালত কর্তৃক বলবৎযোগ্য হবে না। সপ্রু কমিটির প্রতিবেদনের প্রস্তাব সংবিধানের তৃতীয় অধ্যায়ের মৌলিক অধিকার এবং চতুর্থ অধ্যায়ের নির্দেশমূলক

নীতির প্রণয়নকে প্রভাবিত করেছে। স্বাধীন ভারতের সংবিধানে বিধিবদ্ধভাবে মৌলিক অধিকার সন্নিবিষ্ট করার গুরুত্ব ১৯৪৬ সালের ক্যাবিনেট মিশনও স্বীকার করে।

গণপরিষদে দুটি মতাদর্শের ধারা এবং মৌলিক অধিকারের বিন্যাস : স্বাধীন ভারতের নতুন সংবিধান প্রণয়ন করে ভারতের গণপরিষদ। ভারতের গণপরিষদ গঠনের এক প্রস্তাব ঘোষিত হয় ১৯৪৬ সালের ১৬ই মে। এই ঘোষণায় মৌলিক অধিকারসমূহ বিধিবদ্ধ করার ব্যাপারে একটি পরামর্শদাতা কমিটি গঠন করার প্রস্তাব করা হয়। গণপরিষদে মৌলিক অধিকার সম্পর্কে বিচার-বিবেচনার প্রাক্কালে দুটি পৃথক ধারার অনুগামী দুটি পৃথক গোষ্ঠীর অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয়। মতাদর্শগত বিচারে একটি ধারার সমর্থকরা সমাজতান্ত্রিক নীতি ও আদর্শের ভিত্তিতে সংবিধান প্রণয়নের পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁরা আর্থ-সামাজিক অধিকার ও ন্যায় বিচারের উপর জোর দিতে চেয়েছিলেন। এই ধারার প্রবক্তাদের মধ্যে কে. টি. শাহ, ডঃ বি. আর. আম্বেদকর, ডি. ডি. ত্রিপাঠী প্রমুখ ব্যক্তির নাম উল্লেখযোগ্য। আর একটি ধারার প্রবক্তারা পাশ্চাত্যের উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক মতাদর্শের অনুগামী ছিলেন। তাঁরা ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদের সমর্থক ছিলেন। এই ধারার প্রবক্তারা হলেন আল্লাদি কৃষ্ণস্বামী আয়ার, কে. এম. মুন্সী প্রমুখ ব্যক্তি। তাঁরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেট ব্রিটেন প্রভৃতি দেশের উদারনৈতিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার রীতিনীতির ভিত্তিতে ভারতের মৌলিক অধিকারের ব্যবস্থাকে বিন্যস্ত করার পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁরা মৌলিক অধিকার ও ব্যক্তি-স্বাধীনতা সম্পর্কিত আলাপ-আলোচনার ক্ষেত্রে ব্রিটিশ ও মার্কিন সাংবিধানিক ঐতিহ্যের অভিজ্ঞতাকে অধিক গুরুত্ব দেন। তাঁরা রাজনৈতিক ও আইনানুগ অধিকারের উপর বেশী জোর দেন। এই পশ্চিমী উদারপন্থী গণতান্ত্রিক ধারাটি গণপরিষদে প্রাধান্য পায়। ভারতীয় সংবিধানের তৃতীয় অধ্যায়ের মৌলিক অধিকারের বিষয়বস্তু এই ধারার প্রবক্তাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়।

বিভিন্ন সংবিধান ও তত্ত্বের প্রভাব : মৌলিক অধিকার প্রণয়নের প্রাক্কালে সংবিধান প্রণেতাদের উপর বিভিন্ন সংবিধান ও মতবাদের প্রভাব পড়েছে। এ ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধিকারের সনদ (Bill of Rights), মার্কিন সংবিধানের পঞ্চম ও চতুর্দশ সংশোধন, মানবাধিকার সম্পর্কে ফরাসী ঘোষণা, মানবাধিকার সম্পর্কে আন্তর্জাতিক ঘোষণা, ১৯৩৫ সালের আয়ারল্যাণ্ডের সংবিধান, ডাইসির আইনের অনুশাসন তত্ত্ব, গান্ধীবাদ প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

মৌলিক অধিকার সম্পর্কিত উপ-সমিতি : ভারতের গণপরিষদে ১৯৪৭ সালের ২২শে জানুয়ারি তারিখে সংবিধানের উদ্দেশ্য সম্পর্কে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ অধিকার এই প্রস্তাবের অন্তর্ভুক্ত ছিল। উল্লিখিত অধিকারগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ন্যায় বিচার; চিন্তা, বিশ্বাস, মতপ্রকাশ ও সংগঠনের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা; মর্যাদা ও সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে সমানাধিকার, আইনের দৃষ্টিতে সাম্য প্রভৃতি। এই প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার দু'দিন বাদে গণপরিষদ একটি পরামর্শদাতা কমিটি নিয়োগ করে। এই কমিটির দায়িত্ব ছিল মৌলিক অধিকার, সংখ্যালঘু ও উপজাতিদের সম্পর্কে রিপোর্ট প্রস্তুত ও পেশ করা। এই কমিটি কাজের সুবিধার জন্য পাঁচটি উপ-সমিতি গঠন করে। একটি মৌলিক অধিকার সম্পর্কিত উপ-সমিতি এই পাঁচটি উপ-সমিতির অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই উপ-সমিতির প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয় ১৯৪৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে। এই সভায় বি. এন. রাউ (B. N. Rau) মৌলিক অধিকারকে দুটি শ্রেণিতে বিভক্ত করার কথা বলেন : কতকগুলি অধিকার হবে আদালত কর্তৃক বলবৎযোগ্য এবং কতকগুলি আদালত কর্তৃক বলবৎযোগ্য হবে না। অবশেষে বলবৎযোগ্য অধিকারগুলি মৌলিক অধিকার হিসাবে স্বীকৃত হয় এবং বাকিগুলি রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে নির্দেশমূলক নীতি হিসাবে স্বীকৃত হয়। অধিকারের শ্রেণিবিভাগ সম্পর্কিত বি. এন. রাউ-এর প্রস্তাবের বিরুদ্ধে মৌলিক অধিকার সম্পর্কিত উপ-সমিতির কোন কোন সদস্য মত প্রকাশ করেন। কিন্তু সংশ্লিষ্ট প্রস্তাবটি উপ-সমিতিতে সংখ্যাধিক্যের সমর্থনে গ্রহণ করা হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা দরকার যে বি. এন. রাউ ছিলেন ভারতীয় গণপরিষদের সাংবিধানিক পরামর্শদাতা। চূড়ান্তভাবে ভারতীয় সংবিধানের তৃতীয় অধ্যায়ে ৭টি মৌলিক অধিকার সংযুক্ত হয়।

৬.৩ ভারতীয় সংবিধানে মৌলিক অধিকারগুলি লিপিবদ্ধ করার কারণ (Reasons for inserting Fundamental Rights in the Constitution of India)

বিরুদ্ধ মত : অনেকের মতে দেশের সংবিধানে নাগরিকদের মৌলিক অধিকারকে লিপিবদ্ধ করার কোন দরকার নেই। মৌলিক অধিকারকে সরকারের বিচার-বিবেচনার উপর ছেড়ে দেওয়া উচিত। দেশের সাধারণ আইনের দ্বারা এই সমস্ত অধিকার স্বীকৃত ও সংরক্ষিত হতে পারে। তা ছাড়া এই অধিকারগুলির বড় রক্ষাকবচ হল জনমত। মৌলিক অধিকার সম্পর্কে এ রকম ধারণা পোষণ করেন হ্যামিলটন (Hamilton), ডাইসি (Dicey) প্রমুখ চিন্তাবিদ্। এঁরা আনুষ্ঠানিকভাবে অধিকারের সনদের প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করেন।

সংবিধানে অধিকারের সনদ জুড়ে দেওয়ার রীতি : কিন্তু নাগরিকদের মৌলিক অধিকার সম্পর্কে উপরিউক্ত ধারণা বর্তমানে অচল। মৌলিক অধিকারের গুরুত্বের কারণে এখন প্রায় সকল গণতান্ত্রিক সংবিধানেই মৌলিক অধিকারের জন্য একটি পৃথক অধ্যায় সংযুক্ত হতে দেখা যায়। ফ্রান্সে মানব অধিকারের ঘোষণা এবং আমেরিকার স্বাধীনতার ঘোষণা—বিশ্ব ইতিহাসের এই দুটি ঘটনা এ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নাগরিকদের মৌলিক অধিকার ঘোষণার প্রথা প্রচলিত হয় ফরাসী বিপ্লবের সময় থেকে। মার্কিন সংবিধানের দশটি সংশোধনী প্রস্তাবের মাধ্যমে নাগরিকদের মৌলিক অধিকার স্বীকারের ব্যবস্থা করা হয়। তারপর থেকে প্রায় সকল লিখিত সংবিধানেই নাগরিকদের মৌলিক অধিকার লিপিবদ্ধ করা একটি রীতিতে পরিণত হয়েছে। এক্ষেত্রে মার্কিন সংবিধানের দ্বারা ভারতীয় সংবিধানের রচয়িতারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছেন। তা ছাড়া ফরাসী অধিকারের ঘোষণা, আইরিশ সংবিধান (১৯৩৫)-এর উদাহরণ, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তী সময়ের বার্মা, জাপান প্রভৃতি রাষ্ট্রের সাংবিধানিক দৃষ্টান্ত ভারতের সংবিধান-প্রণেতাদের উপর প্রভাব বিস্তার করেছে। চীন প্রভৃতি সমাজতান্ত্রিক দেশের সংবিধানেও মৌলিক অধিকার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। গ্রেট ব্রিটেনে লিখিত অধিকারের সংস্থান নেই। তবুও ইংরেজরা লিপিবদ্ধ অধিকারের গুরুত্বকে স্বীকার করেন।

(১) ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতের জাতীয়তাবাদিগণ দীর্ঘদিন ধরে বিধিবদ্ধ মৌলিক অধিকারের জন্য দাবি জানিয়ে আসছিলেন। ১৯১৮ সালের জাতীয় কংগ্রেসের মুম্বাই (বোম্বাই) অধিবেশনে ভারতীয়দের জন্য মৌলিক অধিকারের দাবি জানান হয়। কিন্তু ব্রিটিশদের তৈরী কোন ভারত শাসন আইনেই কখনও কোনরকম নাগরিক অধিকার স্বীকার করা হয় নি। স্বাভাবিক কারণে জাতীয়তাবাদীদের দ্বারা রচিত ভারতের নতুন সংবিধানে একটি পৃথক অধ্যায়ে নাগরিকদের মৌলিক অধিকার যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

(২) স্বাধীনতা লাভের প্রাক্কালে ভারতের সমাজব্যবস্থা ছিল অত্যন্ত জটিল। জাতপাতের বাছবিচার, অস্পৃশ্যতামূলক আচরণ এবং ধর্ম, ভাষা, সংস্কৃতি প্রভৃতির বিচারে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপস্থিতি প্রভৃতি বহু ও বিভিন্ন সমস্যায় ভারতের সমাজব্যবস্থা ছিল অত্যন্ত জটিল। এই অবস্থায় জাতীয় সংহতির স্বার্থে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল ভারতীয় নাগরিকের জন্য মৌলিক অধিকারের সাংবিধানিক স্বীকৃতি ও সংরক্ষণ জরুরী হয়ে পড়েছিল।

(৩) ভারতের সংবিধানে সংসদীয় গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এ ধরনের গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার সাফল্যের জন্য নাগরিকদের বিধিবদ্ধ অধিকারের প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হয়। তা না হলে সংসদের অবহেলা এবং শাসন-বিভাগের স্বৈরাচারের আশংকা থেকে মৌলিক অধিকারকে রক্ষা করা মুশকিল হয়ে পড়ে। সরকারের অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ থেকে মৌলিক অধিকারগুলিকে রক্ষা করার জন্য এগুলিকে লিপিবদ্ধ করা দরকার। ভারতীয় সংবিধান-প্রণেতারা তাই করেছেন।

(৪) মৌলিক অধিকারগুলি সংবিধানে উল্লিখিত থাকলে মৌলিক আইনের মর্যাদা পায়। সাংবিধানিক নিশ্চয়তা মৌলিক অধিকারকে বিশেষ মর্যাদায় মণ্ডিত করে এবং এ বিষয়ে সরকারকে দায়িত্ব সচেতন করে।

(৫) সংবিধানে মৌলিক অধিকারগুলি লিখিতভাবে স্বীকৃত থাকলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থ সংরক্ষণের ব্যাপারে নিশ্চয়তার সৃষ্টি হয়। সংসদীয় গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দল ক্ষমতাসীন হয়। ক্ষমতাসীন এই দল সংখ্যালঘুদের অধিকারকে আইন ও শাসন-বিভাগীয় ব্যবস্থাদির দ্বারা ক্ষুণ্ণ করতে পারে। কিন্তু সংবিধানে মৌলিক অধিকারগুলি লিখিতভাবে ঘোষিত হলে এই আশঙ্কা থাকে না।

(৬) মৌলিক অধিকারগুলি সংবিধানে লিপিবদ্ধ থাকলে অধিকার সম্পর্কে নাগরিকদের ধারণা সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট হয়। অধিকার সম্পর্কে নাগরিকরা অধিকতর সচেতন হয় এবং অধিকার রক্ষার ব্যাপারে মনোযোগী হয়।

(৭) সংবিধানে নাগরিকদের মৌলিক অধিকার লিপিবদ্ধ থাকলে আদালতের মাধ্যমে তার সংরক্ষণ সহজে সম্ভব হয়।

তা ছাড়া মৌলিক অধিকার লিপিবদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সাধারণভাবে কতকগুলি যুক্তির অবতারণা করা হয়।

অন্যান্য কারণ : (ক) নাগরিকদের গুরুত্বপূর্ণ অধিকারগুলি দেশের মৌলিক আইন হিসাবে সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত হওয়া আবশ্যক। (খ) সংবিধানে লিপিবদ্ধ মৌলিক অধিকার ক্ষমতাসীন সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে সর্বশ্রেষ্ঠ রক্ষাকবচ। (গ) এই অধিকারগুলি লিপিবদ্ধ থাকলে জনগণ তাদের অধিকার সম্পর্কে বিশেষভাবে সতর্ক থাকে। (ঘ) সংবিধানে লিপিবদ্ধ মৌলিক অধিকারের উপর কোনরকম হস্তক্ষেপ ঘটলে সর্বোচ্চ আদালতের মাধ্যমে তার পুনঃপ্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করা যায়। (ঙ) উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সাফল্যের জন্য মৌলিক অধিকারগুলি সংবিধানে লিপিবদ্ধ থাকা দরকার। (চ) সংবিধানে লিপিবদ্ধ থাকলে

সহজে কেউ মৌলিক অধিকারকে খুশিমত পরিবর্তন করতে পারে না। (ছ) নাগরিক অধিকারগুলি সংবিধানে লিখিতভাবে সংরক্ষিত থাকলে জনমত গঠনের ও প্রকাশের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পায়। মূলতঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লিখিত সংবিধানের রীতিকে অনুসরণ করে ভারতের সংবিধানে মৌলিক অধিকারগুলিকে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

৬.৪ ভারতীয় সংবিধানে সন্নিবিষ্ট অধিকারগুলির বৈশিষ্ট্য (Characteristics of the Fundamental Rights incorporated in the Constitution of India)

মৌলিক অধিকার সম্পর্কিত স্বতন্ত্র অধ্যায় : প্রায় সকল গণতান্ত্রিক দেশের সংবিধানেই এখন মৌলিক অধিকারের জন্য একটি পৃথক অধ্যায় সংযুক্ত থাকে। এটি গণতান্ত্রিক সংবিধানের একটি রীতিতে পরিণত হয়েছে। চীন প্রভৃতি সমাজতান্ত্রিক দেশের সংবিধানেও মৌলিক অধিকার সম্পর্কিত একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় আছে। ইংল্যাণ্ডের সংবিধান মূলতঃ অলিখিত। তবুও ম্যাগনাকার্টা, অধিকারের বিল প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ কতকগুলি অধিকার সেখানেও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তা ছাড়া ব্রিটেনে প্রথাগত নিয়মকানুন ও সাধারণ আইনের মধ্যেও নাগরিকদের বহু গুরুত্বপূর্ণ অধিকার সংরক্ষিত আছে। ইংরেজদের প্রথাগত ঐতিহ্য ও গণতান্ত্রিক মর্যাদাবোধ হল এই অধিকারের সর্বশ্রেষ্ঠ রক্ষাকবচ।

বিভিন্ন সংবিধান ও তত্ত্বের প্রভাব : ভারতের সংবিধানের সমগ্র তৃতীয় অধ্যায় জুড়ে মৌলিক অধিকারের উল্লেখ আছে। ভারতীয় সংবিধানের রচয়িতারা এক্ষেত্রে পাশ্চাত্ত্যের উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার আদর্শের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছেন। মানবাধিকার সম্পর্কে ফরাসী ঘোষণা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধিকারের সনদ, আয়ারল্যাণ্ডের সংবিধান, ডাইসির আইনের অনুশাসন তত্ত্ব প্রভৃতির দ্বারা সংবিধান-প্রণেতারা প্রভাবিত হয়েছেন। এক্ষেত্রে গান্ধীবাদের প্রভাবও অস্বীকার করা যায় না। সংবিধানের ১৭ ধারায় অস্পৃশ্যতা বিরোধী ব্যবস্থা গান্ধীজীর আদর্শের ভিত্তিতে রচিত হয়েছে।

ভারতের সংবিধানে বিস্তারিতভাবে নাগরিকদের মৌলিক অধিকার সম্পর্কে আলোচনা আছে। অন্য কোন দেশের সংবিধানে এত বিস্তৃতভাবে নাগরিক অধিকার সম্পর্কে আলোচনা করা হয় নি। ভারতীয় সংবিধানে উল্লিখিত নাগরিক অধিকারগুলি দুই শ্রেণির। কতকগুলি অধিকারকে মৌলিক অধিকার এবং কতকগুলিকে রাষ্ট্র-পরিচালনার নির্দেশমূলক নীতি (Directive Principles of State Policy) বলা হয়। গ্রানভিল অস্টিন (Granvile Austin)-এর মতানুসারে মৌলিক অধিকার এবং নির্দেশমূলক নীতিগুলি হল ভারতীয় সংবিধানের বিবেকস্বরূপ। তিনি বলেছেন: "The Rights and Principles thus connect India's future, present, past......and giving strength to the pursuit of the social revolution."

ভারতীয় সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত মৌলিক অধিকারগুলির কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়।

(১) প্রত্যেক মৌলিক অধিকার সকলের জন্য নয় : ভারতীয় সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত সকল মৌলিক অধিকার দেশের সকল অধিবাসী ভোগ করতে পারে না। কতকগুলি মৌলিক অধিকার আছে যা কেবল ভারতীয় নাগরিকগণই ভোগ করতে পারেন। উদাহরণ হিসাবে মত প্রকাশের স্বাধীনতা, চাকরির ক্ষেত্রে সমানাধিকার, ভারতের যে-কোন জায়গায় যাতায়াত ও বসবাসের অধিকার, সংস্কৃতি ও শিক্ষা বিষয়ক অধিকার, সমিতি গঠনের স্বাধীনতা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। আবার কতকগুলি মৌলিক অধিকার আছে যা নাগরিক ও অ-নাগরিক নির্বিশেষে সকলেই ভোগ করতে পারে। যেমন—আইনের চক্ষে সমানাধিকার, জীবন ও স্বাধীনতার অধিকার, ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার প্রভৃতি। এই অধিকারগুলি বিদেশী সমেত দেশের সকল অধিবাসী ভোগ করতে পারে।

(২) ব্যক্তির মত গোষ্ঠীর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য : ভারতীয় সংবিধানে স্বীকৃত মৌলিক অধিকারগুলি ব্যক্তির মত গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ও ভোগ করতে পারে। সাম্যের অধিকার, স্বাধীনতার অধিকার, ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার, শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক অধিকার প্রভৃতি ব্যক্তির ক্ষেত্রেও যেমন প্রযোজ্য তেমনি গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। অধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটলে ব্যক্তির মত গোষ্ঠীও আদালতে আবেদন করতে পারে।

(৩) সকল অধিকার একইভাবে কার্যকর হয় না : ভারতীয় সংবিধানের সকল মৌলিক অধিকার একইভাবে কার্যকর হয় না। কতকগুলি মৌলিক অধিকার সরাসরি বলবৎ হয়। উদাহরণ হিসাবে ১৪ ধারার আইনের চোখে সমানাধিকারের কথা বলা যায়। আবার কতকগুলি মৌলিক অধিকার আছে যেগুলি সরাসরি কার্যকর হয় না। তার জন্য বিশেষ আইনগত ব্যবস্থা নিতে হয়। এ ক্ষেত্রে উদাহরণ হিসাবে ১৭ ধারার অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের এবং ২৩ ধারার শোষণের বিরুদ্ধে অধিকারের কথা বলা যায়। এই কারণে অনেকের

মতানুসারে ১৭ ধারার অস্পৃশ্যতা বর্জন বা ১৮ ধারার উপাধি সংক্রান্ত বিধি-নিষেধ মৌলিক অধিকার হিসাবে বিবেচিত হয় না।

(৪) অধিকারগুলি রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রকৃতির : ভারতীয় সংবিধানে উল্লিখিত মৌলিক অধিকারগুলি প্রকৃতিগত বিচারে মূলতঃ আইনগত এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রকৃতির। কোন অর্থনৈতিক অধিকারকে মৌলিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি। কর্মের অধিকার (Right to work) শ্রমমান ভিত্তিক মজুরি পাওয়ার অধিকার (Right to a standard minimum wage) প্রভৃতি অর্থনৈতিক অধিকার সমাজতান্ত্রিক দেশে স্বীকার করা হয়। ভারতের সংবিধানে তা করা হয় নি। ভারতের সংবিধানে অর্থনৈতিক অধিকারকে অগ্রাহ্য করা হয়েছে। অথচ অর্থনৈতিক অধিকার ছাড়া অন্যান্য অধিকার অর্থহীন।

(৫) ইতিবাচক ও নেতিবাচক : সংবিধানে উল্লিখিত কতকগুলি মৌলিক অধিকার ইতিবাচক (positive)। ইতিবাচক মৌলিক অধিকারগুলি নাগরিকদের সুস্পষ্টভাবে কতকগুলি সুযোগ-সুবিধা প্রত্যক্ষভাবে প্রদান করে। গণতান্ত্রিক সমাজের সভ্য হিসাবে জনগণ এই সমস্ত বিশেষ ধরনের অধিকার ভোগ করে। উদাহরণ হিসাবে মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা, জীবন ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অধিকার প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। তেমনি আবার কতকগুলি অধিকার আছে যেগুলি নেতিবাচক (negative)। এই নেতিবাচক অধিকারগুলি রাষ্ট্রের উপর বাধানিষেধ আরোপ করে এবং নাগরিকদের স্বাধীনতা ভোগে সহায়তা করে। যেমন, রাষ্ট্র কোনভাবেই নাগরিকদের আইনের দৃষ্টিতে সাম্য এবং আইনের দ্বারা সমভাবে সংরক্ষিত হওয়ার অধিকার অস্বীকার করতে পারে না (১৪ ধারা)।

(৬) কতকগুলি অধিকারের নিয়ন্ত্রণ সরকারের বিরুদ্ধে, কতকগুলি সকলের বিরুদ্ধে : মৌলিক অধিকারগুলির মধ্যে কতকগুলি কেবলমাত্র শাসন-বিভাগ ও আইন-বিভাগের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে। আবার কতকগুলি ক্ষেত্রে মৌলিক অধিকারের নিয়ন্ত্রণ সাধারণভাবে সকলের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হয়। সরকারী চাকরিতে নাগরিকের সমান সুযোগের অধিকার দান কেবলমাত্র রাষ্ট্রের উপর প্রযোজ্য হয়। কিন্তু জাতি, ধর্ম, বর্ণ, শ্রেণি, নির্বিশেষে সকল নর-নারীর সর্বসাধারণের ব্যবহার্য স্থানাদিতে প্রবেশের অধিকার রাষ্ট্রসমেত সংশ্লিষ্ট সকলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

(৭) জরুরী অবস্থায় অবলবৎযোগ্য : স্বাভাবিক অবস্থায় মৌলিক অধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটলে নাগরিকগণ আদালতের মাধ্যমে প্রতিকার পায়। কিন্তু জরুরী অবস্থা বলবৎ থাকাকালীন সময়ে মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ণ হলে নাগরিকদের করার কিছু থাকে না। অর্থাৎ জরুরী অবস্থায় মৌলিক অধিকারগুলি অবলবৎযোগ্য হয়ে যায়। জরুরী অবস্থা বলবৎ থাকা অবস্থায় ১৯ ধারার স্বাধীনতার অধিকারগুলি ভোগের ব্যাপারে কোন নিশ্চয়তা থাকে না। এই সময় এই অধিকারকে লঙ্ঘন করে আইন-বিভাগ আইন প্রণয়ন করতে এবং শাসন-বিভাগ নির্দেশ জারি করতে পারে। অর্থাৎ এই সময় আইন ও শাসন-বিভাগ ১৯ ধারার বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্ত থাকে (৩৫৮ ধারা)। আবার জরুরী অবস্থা ঘোষণার পর রাষ্ট্রপতি এই মর্মে আদেশ জারি করতে পারেন যে জরুরী অবস্থা বলবৎ থাকাকালীন সময়ে কোন মৌলিক অধিকার বলবৎ করার জন্য আদালতের কাছে আবেদন করা যাবে না (৩৫৯ ধারা)। তবে সংবিধানের ৪৪তম সংশোধনের (১৯৭৮) মাধ্যমে বলা হয়েছে যে কোন অবস্থাতেই ২১ ধারার জীবন ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অধিকার স্থগিত রাখা যাবে না।

(৮) অধিকারগুলি নিরঙ্কুশ নয় : মৌলিক অধিকারগুলি অবাধ বা অনিয়ন্ত্রিত নয়। কোন রাষ্ট্রই তার নাগরিকদের অবাধে সীমাহীন অধিকার ভোগের সুযোগ দেয় না। কারণ অবাধ ও অনিয়ন্ত্রিত অধিকার স্বৈরাচারের নামান্তর। ভারতেও প্রয়োজনবোধে রাষ্ট্র অধিকারগুলির উপর সমাজ ও জাতির বৃহত্তর স্বার্থে যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধ আরোপ করতে পারে। পার্লামেন্ট এই উদ্দেশ্যে আইন প্রণয়ন করতে পারে। তা ছাড়া সংবিধানেই কতকগুলি অধিকার প্রদান করার সঙ্গে সঙ্গে তাদের উপর কতকগুলি নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়েছে। উদাহরণ হিসাবে ১৯ ধারার স্বাধীনতার অধিকারের উল্লেখ করা যায়। অনেকে এই কারণে ভারতীয় সংবিধানের মৌলিক অধিকারকে 'সীমিত মৌলিক অধিকার' (Limited Fundamental Rights) বলে থাকেন। তবে আরোপিত বাধানিষেধের বৈধতা ও যৌক্তিকতা আদালত বিচার করে দেখতে পারে। এবং অযৌক্তিক ও অসাংবিধানিক বাধানিষেধকে অবৈধ ও বাতিল ঘোষণা করতে পারে। এ ক্ষেত্রে একটি মত হল যে অধিকারগুলিই হল মৌলিক, বাধানিষেধগুলি নয় [রাম সিং বনাম দিল্লী রাজ্য (১৯৫১)]। তবে এ বিষয়ে বিতর্কের অবকাশ আছে। ভারতের পার্লামেন্ট বিভিন্ন সময়ে আইন প্রণয়নের মাধ্যমে মৌলিক অধিকারের উপর বাধানিষেধ আরোপ করেছে। তার ফলে স্বীকৃত অধিকার অনেক ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ অধিকারে রূপান্তরিত হয়েছে। এই সমস্ত আইনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল 'নিবর্তনমূলক আটক আইন' (Preventive Detention Act), 'আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা রক্ষা আইন' (MISA), 'ভারত রক্ষা আইন' (DIR), জাতীয়

নিরাপত্তা আইন' (NASA), 'অত্যাবশ্যক সংগঠনসমূহের কাজকর্ম অব্যাহত রাখা সম্পর্কিত আইন' (ESMA) প্রভৃতি।

(৯) **অধিকার সংরক্ষণে আদালতের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ :** ভারতীয় সংবিধানের মৌলিক অধিকারগুলি বিচার-বিভাগ কর্তৃক সংরক্ষিত। স্বাভাবিক অবস্থায় সুপ্রীম কোর্ট ৩২ ধারা অনুসারে এবং হাইকোর্ট ২২৬ ধারা অনুসারে লেখ (Writ) জারির মাধ্যমে মৌলিক অধিকার বলবৎ করতে পারে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে আদালতের বিচার করার ক্ষমতা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। কারণ অধিকারসমূহের উপর আরোপিত বিধি-ব্যবস্থাগুলি সংবিধানেই বিস্তারিতভাবে উল্লিখিত আছে। তাই আদালতের ক্ষমতা এ ক্ষেত্রে সীমিত হয়ে পড়েছে। অনুরূপ ক্ষেত্রে মার্কিন সংবিধানে বিচার-বিভাগকে অনিয়ন্ত্রিত ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে।

(১০) **নমনীয় :** সংবিধান অনুসারে পার্লামেন্ট আইন প্রণয়নের মাধ্যমে মৌলিক অধিকার সংশোধন করতে পারে। তাই অধিকারগুলি অলঙঘনীয় এ কথা বলা যায় না। অর্থাৎ প্রকৃতিগত বিচারে মৌলিক অধিকারগুলি নমনীয়। শঙ্করী প্রসাদ (১৯৫১) এবং সজ্জন সিং মামলায় (১৯৬৪) সুপ্রীম কোর্ট রায় দেয় যে সংসদ মৌলিক অধিকার সমেত সংবিধানের যে-কোন অংশ সংশোধন করতে পারে। কিন্তু গোলকনাথ মামলায় (১৯৬৭) সুপ্রীম কোর্ট রায় দেয় যে মৌলিক অধিকার সংশোধনের এক্তিয়ার সংসদের নেই। সংবিধানের ২৪তম সংশোধন (১৯৭১)-এ সংসদকে মৌলিক অধিকার সংশোধন করার ক্ষমতা দেওয়া হয় এবং সংবিধান সংশোধন বিলে রাষ্ট্রপতিকে সম্মতি দিতে বাধ্য করা হয়। সংবিধানের ৪৪তম সংশোধন (১৯৭৮)-এর মাধ্যমে সম্পত্তির অধিকারকে মৌলিক অধিকারের তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয় এবং ৩০০ (ক) ধারায় সাধারণ আইনগত অধিকার হিসাবে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়।

(১১) **শাসনতান্ত্রিক প্রতিবিধান :** মৌলিক অধিকার লঙ্ঘিত হলে সংবিধানের ৩২ ধারায় শাসনতান্ত্রিক প্রতিবিধানের বিষয়ে উল্লেখ আছে। শাসনতান্ত্রিক প্রতিবিধানটিকেও অধিকার এবং অন্যতম মৌলিক অধিকার হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। শাসনতান্ত্রিক প্রতিবিধানের অধিকার ভারতের সংবিধানে স্বীকৃত মৌলিক অধিকারগুলির মধ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

(১২) **সকল অধিকার সমান গুরুত্বপূর্ণ নয় :** ভারতের সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত সকল মৌলিক অধিকারকে সমান গুরুত্ব দেওয়া হয় নি। শুরু থেকেই সম্পত্তির অধিকারটিকে কম গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তার ফলে সম্পত্তির অধিকার পরিণামে ১৯৭৮ সালের ৪৪তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে মৌলিক অধিকারের অধ্যায় থেকে বাদ পড়েছে। সম্পত্তির অধিকার একটি সাধারণ আইনগত অধিকারে পরিণত হয়েছে। ভারত সরকার এ ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছেন। কারণ সম্পত্তির উপর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে কিছুটা অর্থনৈতিক সাম্য আনা যায়।

(১৩) **অধিকারগুলিকে কার্যকর করার ব্যবস্থা নেই :** সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সংবিধানে মৌলিক অধিকার উল্লেখ করার সঙ্গে সঙ্গে অধিকারগুলিকে বাস্তবে রূপায়িত করার ব্যাপারে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ থাকে। কিন্তু ভারতে অনুরূপ নির্দেশ অনুপস্থিত। ভারতের সংবিধানের এটি একটি দুর্বলতা হিসাবে প্রতিপন্ন হয়। ভারতের সংবিধানে মৌলিক অধিকার কার্যকর করার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থাদির উল্লেখ নেই। এই কারণে বলা হয় যে ভারতীয় সংবিধানে স্বীকৃত মৌলিক অধিকারগুলি তাত্ত্বিক প্রকৃতির, বাস্তব নয়।

(১৪) **ব্যক্তিস্বার্থ ও সামাজিক স্বার্থের মধ্যে সামঞ্জস্য সাধন :** ভারতে মৌলিক অধিকারগুলির উপর আরোপিত বাধানিষেধের ক্ষেত্রে ভারত রাষ্ট্রের ক্ষমতা অত্যন্ত ব্যাপক। ব্যাপক বাধানিষেধের জন্য ভারতে মৌলিক অধিকারগুলি যথাযথভাবে ভোগের ব্যাপারে সুযোগ-সুবিধা অত্যন্ত কম। প্রকৃত প্রস্তাবে ব্যক্তিস্বার্থ ও সমাজের বৃহত্তর স্বার্থের মধ্যে সামঞ্জস্য সাধনের জন্যই ভারতীয় সংবিধানে প্রয়োজনীয় বাধা-নিষেধগুলি উল্লেখ করা হয়েছে। প্রকৃত প্রস্তাবে ভারতের সংবিধানে ব্যক্তির অধিকার ও রাষ্ট্রের স্বার্থের মধ্যে দ্বিতীয়টিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।

(১৫) **ব্যাপক ও উদার :** ভারতে মৌলিক অধিকারের স্বীকৃতি অত্যন্ত ব্যাপক ও উদার। ভারতে ধর্মপ্রচারের স্বাধীনতা স্বীকার করা হয়েছে। এই স্বাধীনতা অন্য কোন দেশের সংবিধানে স্বীকার করা হয় নি। পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়নে ধর্মবিরোধী প্রচারের স্বাধীনতা স্বীকৃত ছিল। ভারতের বিশেষ সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কতকগুলি বিশেষ অধিকারকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যেমন, অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ, খেতাবের বিলুপ্তি প্রভৃতি।

(১৬) **মৌলিক কর্তব্য :** মূল সংবিধানে কেবল মৌলিক অধিকারই অন্তর্ভুক্ত ছিল। সংবিধানে কোন মৌলিক কর্তব্যের উল্লেখ ছিল না। তবে ১৯৭৬ সালের ৪২তম সংশোধনী আইনে চতুর্থ অধ্যায়-ক (Part IV-A) নামে একটি নতুন অধ্যায় এবং ৫১(ক) (Art 51A) নামে একটি নতুন ধারা সৃষ্টি করা হয়। এই

ধারায় ভারতীয় নাগরিকদের দশটি মৌলিক কর্তব্য উল্লেখ করা হয়েছে। ২০০২ সালের ৮৬তম সংবিধান সংশোধনী আইনের মাধ্যমে ৫১(ক) ধারায় আরও একটি মৌলিক কর্তব্য সংযুক্ত হয়। তারফলে এখন মৌলিক কর্তব্যের সংখ্যা দশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে এগার।

(১৭) অনগ্রসর সম্প্রদায়ের জন্য সংরক্ষিত অধিকার : ভারতের সংবিধানে অনগ্রসর ও তফসিলী সম্প্রদায়ের মানুষের জন্য বিশেষ সুযোগ-সুবিধা ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সরকারী চাকরি বা পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে এই সমস্ত সম্প্রদায়ের মানুষ বিশেষ সংরক্ষণের অধিকার ভোগ করে। তফসিলী জাতি ও উপজাতীয়দের জন্য লোকসভা ও বিধানসভায় আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা আছে। এই আসন সংরক্ষণের মেয়াদ সংবিধান প্রবর্তিত হওয়ার দিন থেকে দশ বছর পর্যন্ত কার্যকর থাকবে বলা হয়েছিল। কিন্তু সংবিধানের ৮ম (১৯৫৯), ২৩তম (১৯৭০), ৪৫তম (১৯৮০), ৬২তম (১৯৯০), ৭৯তম (১৯৯৯) এবং ৯৫তম (২০০৯) সংবিধান সংশোধনী আইনের দ্বারা আসন সংরক্ষণের এই মেয়াদ ধাপে ধাপে ২০20 সালের ২৫ শে জানুয়ারি পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। আবার ১৯ ধারায় ভারতের সর্বত্র গমনাগমনের ও যে-কোন জায়গায় স্থায়িভাবে বসবাসের অধিকারের উপর তফসিলী উপজাতিদের স্বার্থে নিয়ন্ত্রণ আরোপের কথা বলা হয়েছে।

(১৮) অসাম্প্রদায়িক : ভারতীয় সংবিধানে স্বীকৃত নাগরিকদের মৌলিক অধিকার অসাম্প্রদায়িক প্রকৃতির। ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শের ভিত্তিতে অধিকারগুলি রচিত ও পরিচালিত। কোন বিশেষ ধর্ম, ধর্মীয় সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীর স্বার্থে বৈষম্যমূলক বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় নি। এ ক্ষেত্রে উদাহরণ হিসাবে সংবিধানের ১৪, ১৫, ১৬, এবং ২৫ থেকে ২৮ ধারা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তা ছাড়া সংবিধানের ৩২৬ ধারার কথাও এ ক্ষেত্রে উল্লেখ করা দরকার।

(১৯) স্বাভাবিক অধিকারের অস্বীকৃতি : ভারতের সংবিধানের তৃতীয় অধ্যায়ে স্বীকৃত অধিকারগুলি হল নাগরিকদের জন্য সংকলিত অধিকার। এর বাইরে নাগরিকগণ রাষ্ট্রের কাছে আর কোন অধিকার দাবি করতে পারে না। কারণ ভারতীয় সংবিধানে স্বাভাবিক বা প্রাকৃতিক অধিকারের তত্ত্ব (Theory of Natural Rights) স্বীকার করা হয় নি। কিন্তু মার্কিন সংবিধানে নাগরিক অধিকার স্বীকৃতির ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক অধিকারের তত্ত্বকে মর্যাদা দেওয়া হয়েছে।

সংবিধানের তৃতীয় অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত মৌলিক অধিকারসমূহের আরও কিছু বৈশিষ্ট্যসূচক বিষয় উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক।

(ক) মৌলিক অধিকারসমূহের মাধ্যমে কিছু আর্থনীতিক অধিকারকে স্বীকার করা হয়েছে। কিন্তু বিচারবিভাগীয় ব্যাখ্যা এবং সংবিধান সংশোধনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আর্থনীতিক বিষয়াদির উপর সামাজিক নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়েছে। তারফলে নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতির সৃষ্টি হয়েছে।

(খ) বিংশ শতাব্দীর সত্তরের দশকের শেষের দিক থেকে জীবন ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। বিচারবিভাগীয় ব্যাখ্যার দ্বারা ২১ নং অনুচ্ছেদের মাত্রাগত তাৎপর্য বৃদ্ধি পেয়েছে। বিখ্যাত মানেকা গান্ধী মামলায় (১৯৭৮) সুপ্রীমকোর্ট মন্তব্য করেছে: "The attempt of the Court should be to expand the reach and ambit of the Fundamental Rights rather than to alternate their meaning and content by a process of judicial construction."

(গ) মৌলিক অধিকারের ব্যাপারে নিহিতার্থের নীতি (doctrine of implied Fundamental Rights) ঘোষণা করেছে। আদালতের ব্যাখ্যা অনুযায়ী সংবিধানের তৃতীয় অধ্যায়ে মৌলিক অধিকার হিসাবে লিপিবদ্ধ না থাকলে, কোন একটি অধিকারকে মৌলিক অধিকার হিসাবে বিবেচনা করা যাবে না, এ রকম কোন নিয়ম নেই। দেশে সামাজিক, রাজনীতিক ও আর্থনীতিক ক্ষেত্রে পরিবর্তিত পরিস্থিতি-পরিমণ্ডলের পরিপ্রেক্ষিতে নতুন অধিকারের স্বীকৃতির অপরিহার্যতাকে অস্বীকার করা যায় না; এবং সামাজিক চাহিদা পূরণের জন্য গতিশীল আইন বিকশিত হয় **[Unni Krishnan, J.P. Vs. State of Andhra Pradesh (1993)]**। সুদীর্ঘকাল ধরে সুপ্রীম কোর্ট তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণমূলক প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন অন্তর্নিহিত মৌলিক অধিকার তুলে ধরেছে। এক্ষেত্রে উদাহরণস্বরূপ উল্লেখযোগ্য হল: সংবাদপত্রের স্বাধীনতার অধিকার, গোপনীয়তার অধিকার প্রভৃতি।

(ঘ) মৌলিক অধিকারের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ব্যাপারে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সুপ্রীম কোর্ট উদারনীতিক, গঠনমূলক ও সদর্থক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছে। **(Pathumma Vs. State of Kerala (1978)** মামলায় সুপ্রীম কোর্ট মন্তব্য করেছে: "...the judicial approach should be dynamic rather than static, pragmatic and not pedantic and elastic rather than rigid." সুপ্রীমকোর্টের এই মনোভাব ও ভূমিকার সুবাদে কালক্রমে মৌলিক অধিকারসমূহের বিকাশ ও বর্ণনা প্রভাবিত হয়েছে।

(ঙ) ভারতীয় প্রশাসনিক আইনের ক্ষেত্রেও মৌলিক অধিকারসমূহের ভূমিকা তাৎপর্যপূর্ণ। জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এ দেশে প্রশাসনিক কার্যাবলীর পরিধি বিশেষভাবে প্রসারিত হয়েছে। তারফলে স্বাভাবিকভাবেই প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের স্বেচ্ছামূলক ক্ষমতাও বিশেষভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এরকম পরিস্থিতিতে আধুনিককালের প্রশাসনিক আইনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হল প্রশাসনিক ক্রিয়াকর্মের উপর নিয়ন্ত্রণমূলক পন্থাপদ্ধতিকে অধিকতর শক্তিশালী করা। এই উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে ১৪, ১৯, ২২, ৩১ প্রভৃতি অনুচ্ছেদের অন্তর্ভুক্ত মৌলিক অধিকারগুলিকে ব্যবহার করা হয়। অনেক মামলাতেই প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষকে স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা প্রদানকারী আইনের বৈধতা বিচার করা হয়েছে মৌলিক অধিকারসমূহের পরিপ্রেক্ষিতে। এ রকম ক্ষেত্রে বিচার্য আইনটির অস্তিত্বমূলক এবং পদ্ধতিগত উভয়বিধ অংশই বিচার-বিবেচনা করা হয় **[N.B. Khare Vs. Delhi (১৯৫০)]**।

৬.৫ মৌলিক অধিকার এবং সংবিধান সংশোধন (Fundamental Rights and Amendment of the Constitution)

১৩(২) ধারায় সংরক্ষণ : সংবিধান সংশোধন ও মৌলিক অধিকারকে কেন্দ্র করে ভারতের সাংবিধানিক ইতিহাসে বিরোধ-বিতর্কের অবধি নেই। এই বিষয়ে বেশ কয়েকবার অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। সংবিধানের ১৩ ধারায় আইনসভার অবাঞ্ছিত আক্রমণ থেকে নাগরিকদের মৌলিক অধিকারকে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ১৩ (২) ধারা অনুসারে সংবিধানের এই অংশে প্রদত্ত কোন অধিকার হরণ বা ক্ষুণ্ণ করার জন্য রাষ্ট্র কোন আইন প্রণয়ন করবে না। কোন আইন মৌলিক অধিকারের বিরোধী হলে তা বাতিল হয়ে যাবে। কোন আইন অংশত মৌলিক অধিকারের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ হলে, আইনের সেই অসঙ্গতিপূর্ণ অংশটি বাতিল হয়ে যাবে।

সংবিধান কার্যকর হওয়ার পর এ ক্ষেত্রে দুটি বিষয়কে কেন্দ্র করে বিতর্কের সৃষ্টি হয়। বিষয় দু'টি হল: ১৩(২) ধারায় উল্লিখিত 'আইন' শব্দটির ব্যাখ্যা এবং ৩৬৮ ধারা অনুসারে পার্লামেন্টের সংবিধান সংশোধনের এক্তিয়ার। মূল প্রশ্ন হল পার্লামেন্ট মৌলিক অধিকার পরিবর্তন করতে পারে কিনা। এ বিষয়ে সুপ্রীম কোর্ট বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রায় দিয়েছে। তার ফলে এ ক্ষেত্রে জটিলতা আরও বেড়েছে।

শংকরীপ্রসাদ ও সজ্জন সিং মামলা : **শঙ্করী প্রসাদ বনাম ভারত সরকার মামলায় (১৯৫১)** সুপ্রীম কোর্ট রায় দেন যে পার্লামেন্ট সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে মৌলিক অধিকার পরিবর্তন করতে পারে। ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কোর্ট এই অভিমত ব্যক্ত করে যে, ১৩(২) ধারায় সংযুক্ত 'আইন' শব্দটি সংবিধান সংশোধনের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হবে না। এ ক্ষেত্রে আইন বলতে আইনসভা কর্তৃক প্রণীত সাধারণ আইনকে বোঝান হয়েছে। **সজ্জন সিং বনাম রাজস্থান মামলায় (১৯৬৪)** -ও সুপ্রীম কোর্ট মন্তব্য করে যে পার্লামেন্ট মৌলিক অধিকার সমেত সংবিধানের যে-কোন অংশ সংশোধন করতে পারে।

গোলকনাথ মামলা : ১৯৬৭ সালে **গোলকনাথ বনাম পঞ্জাব রাজ্য মামলায়** সুপ্রীম কোর্ট তার আগের সিদ্ধান্তকে বাতিল করে দেয় এবং একেবারে বিপরীত রায় দেয়। মামলার রায়ে সুপ্রীম কোর্ট এই অভিমত ব্যক্ত করে যে পার্লামেন্ট মৌলিক অধিকার সংশোধন করতে পারে না। মৌলিক অধিকার হরণ বা ক্ষুণ্ণ করা যায় না। সংবিধানের ১৩(২) ধারা অনুসারে মৌলিক অধিকার বিরোধী আইন বাতিল হয়ে যাবে। আরও বলা হয় যে ১৩(২) ধারায় উল্লিখিত 'আইন' বলতে পার্লামেন্ট কর্তৃক প্রণীত সাধারণ আইনের মত সংবিধান সংশোধনী আইনকেও বোঝাবে।

২৪তম সংবিধান সংশোধনী আইন : গোলকনাথ মামলায় সুপ্রীম কোর্টের রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে দেশ জুড়ে বিভিন্ন মহলে ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। আশঙ্কা করা হয় যে, এরপর সরকারের সমাজতান্ত্রিক ও প্রগতিমূলক কর্মসূচী বাধাপ্রাপ্ত হবে। মৌলিক অধিকার একেবারে অপরিবর্তনীয় হয়ে পড়লে পরিবর্তিত অবস্থার উপযোগী ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা যাবে না। এই অবস্থাকে অতিক্রম করার জন্য ১৯৭১ সালে সংবিধানের ২৪ ও ২৫তম সংশোধনী আইন পাশ করা হয়। ২৪তম সংবিধান সংশোধনী আইনে বলা হয় যে পার্লামেন্ট মৌলিক অধিকার সমেত সংবিধানের যে-কোন অংশের সংযোজন, পরিবর্তন বা বাতিল করে সংবিধান সংশোধন করতে পারবে [৩৬৮(১) ধারা] তা ছাড়া আরও বলা হয় যে, এই ধারা অনুসারে সম্পাদিত সংবিধান সংশোধনের ক্ষেত্রে ১৩(২) ধারার বক্তব্য প্রযোজ্য হবে না [৩৬৮ (৩) ধারা]। অর্থাৎ এই সংশোধনের মাধ্যমে পার্লামেন্ট আবার সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত তৃতীয় অধ্যায়ের মৌলিক অধিকার সমেত সকল অংশ সংশোধনের ক্ষমতা লাভ করে। এবং পার্লামেন্টের এই সংশোধনী ক্ষমতা ১৩ ধারার নিয়ন্ত্রণের বাইরে রাখা হয়।

২৫তম সংশোধনী আইন : ২৫তম সংবিধান সংশোধনী আইনে ৩১(গ) নামে একটি নতুন ধারা সৃষ্টি

করা হয়। এই ধারায় বলা হয় যে ৩৯(খ) এবং ৩৯(গ) ধারায় উল্লিখিত নির্দেশমূলক নীতিকে কার্যকর করার জন্য প্রণীত আইন সংবিধানের ১৪ ধারার সাম্যের অধিকার, ১৯ ধারার স্বাধীনতার অধিকার এবং ৩১ ধারার সম্পত্তির অধিকারের বিরোধী হলেও তা অবৈধ বা বাতিল হবে না। অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে ১৩ ধারার বিধান প্রযুক্ত হবে না।

কেশবানন্দ ভারতী মামলা : ১৯৭৩ সালের কেশবানন্দ ভারতী বনাম কেরল রাজ্য মামলায় ২৪তম সংবিধান সংশোধনী আইনের বিধানকে চ্যালেঞ্জ করা হয়। এই মামলায় সুপ্রীম কোর্টের রায়ে বলা হয় যে ২৪ ও ২৫তম সংবিধান সংশোধনী আইন বৈধ এবং মৌলিক অধিকার সংশোধনের ক্ষমতা পার্লামেন্টের আছে। কিন্তু সংবিধানের মৌল কাঠামো (basic structure) পরিবর্তন করা যাবে না এবং সংবিধান সংশোধনের বৈধতা বিচারের ক্ষমতা আদালতের আছে।

৪২তম সংবিধান সংশোধনী আইন : ১৯৭৬ সালে সংবিধানের ৪২তম সংশোধন সম্পাদিত হয়। এই সংশোধনী আইনের ৪ ধারায় বলা হয় যে পার্লামেন্ট নির্দেশমূলক নীতিগুলিকে প্রয়োগ করার উদ্দেশ্যে কোন আইন প্রণয়ন করলে, সেই আইনের বৈধতা বিচারের ক্ষমতা আদালতের থাকবে না। এই আইনের ৫৫ ধারায় বলা হয় যে সংবিধানের যে-কোন বিষয় সংশোধনের ক্ষমতা পার্লামেন্টের থাকবে এবং সংবিধান সংশোধনের বৈধতা বিচারের ক্ষমতা আদালতের থাকবে না।

মিনার্ভা মিল্‌স মামলা : ১৯৮০ সালে মিনার্ভা মিল্‌স বনাম ভারত সরকার মামলা বিষয়টি আবার আদালতের সামনে আসে। এই মামলার রায়ে সুপ্রীম কোর্ট কেশবানন্দ ভারতী মামলায় প্রদত্ত অভিমত প্রকাশ করে। এই মামলায় সুপ্রীম কোর্ট ৪২তম সংবিধান সংশোধনী আইনের ৪নং ও ৫৫নং ধারাকে অবৈধ বলে ঘোষণা করে। এই মামলায় সুপ্রীম কোর্টের সিদ্ধান্ত হল সংবিধান সংশোধনের ক্ষমতা পার্লামেন্টের আছে। কিন্তু পার্লামেন্ট সংবিধানের মৌল কাঠামো পরিবর্তন করতে পারে না। মৌলিক অধিকার ক্ষুন্ন করে পার্লামেন্ট নির্দেশমূলক নীতিকে প্রাধান্য দিতে পারে না।

৬.৬ ভারতীয় নাগরিকদের মৌলিক অধিকারসমূহ (Fundamental Rights of Indian Citizens)

ভারতীয় সংবিধানের তৃতীয় অধ্যায়ে ১২ থেকে ৩৫ ধারার মধ্যে মৌলিক অধিকারগুলি লিপিবদ্ধ আছে। ভারতের মূল সংবিধানে সাত শ্রেণির মৌলিক অধিকারের উল্লেখ ছিল। ১৯৭৮ সালের ৪৪তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে সম্পত্তির অধিকার (Right to Property) মৌলিক অধিকারের তালিকা থেকে বাদ পড়েছে। সম্পত্তির অধিকার বর্তমানে সাধারণ আইনগত অধিকারে পরিণত হয়েছে এবং ৩০০ (ক) ধারায় সংরক্ষিত আছে। এখন সংবিধানে নিম্নলিখিত ছয় প্রকার মৌলিক অধিকার সন্নিবিষ্ট আছে।

(১) **সাম্যের অধিকার (Right to Equality)**—(সংবিধানের ১৪ থেকে ১৮ ধারার মধ্যে সংরক্ষিত)।

(২) **স্বাধীনতার অধিকার (Right to Freedom)**—(সংবিধানের ১৯ থেকে ২২ ধারার মধ্যে বিধিবদ্ধ।

(৩) **শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার (Right Against Exploitation)**—(সংবিধানের ২৩ ও ২৪ ধারায় আলোচিত)।

(৪) **ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার (Right to Freedom of Religion)**—(সংবিধানের ২৫ থেকে ২৮ ধারার মধ্যে উল্লিখিত)।

(৫) **সংস্কৃতি ও শিক্ষা বিষয়ক অধিকার (Cultural and Educational Rights)**—(সংবিধানের ২৯ ও ৩০ ধারায় লিপিবদ্ধ)। এবং

(৬) **শাসনতান্ত্রিক প্রতিবিধানের অধিকার (Right to Constitutional Remedies)** —(সংবিধানের ৩২ থেকে ৩৫ ধারার মধ্যে স্বীকৃত)।

৬.৭ সাম্যের অধিকার (Rights of Equality)

সাম্যের ধারণা : সাম্য হল একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক আদর্শ। তত্ত্বগত ধারণা অনুসারে সাম্য বলতে সকলের ব্যক্তিত্বের যথাযথ বিকাশের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় ও সমানুপাতিক সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থাকে বোঝান হয়। সকলের জন্য অভিন্ন সুযোগ-সুবিধার স্বীকৃতি সাম্য নয়। বিভিন্ন ব্যক্তির অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য ও সুপ্ত গুণাবলীর মধ্যে পার্থক্য থাকে। তাই সকলের সুপ্ত গুণাবলী ও ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশের উপযোগী প্রয়োজনীয় ও পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধার স্বীকৃতিকে সাম্য বলে। যাবতীয় বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা ও বিশেষ আনুকূল্যের অস্তিত্ব সাম্য নীতির পরিপন্থী। সাম্যের ধারণা বিশেষভাবে ব্যাপক। ব্যাপক অর্থে সাম্য বলতে বোঝায় আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সকল রকম বৈষম্যমূলক আচরণের অবসান এবং প্রত্যেকের ব্যক্তিত্বের

পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধার স্বীকৃতি। ভারতের সংবিধানে গণতন্ত্রের একটি আদর্শ হিসাবে সাম্যের ধারণাটিকে স্বীকার করা হয়েছে। গণতন্ত্রের দুটি মূল তত্ত্ব হল 'সাম্য' ও 'স্বাধীনতা'। এবং সাম্য ও স্বাধীনতা পরস্পরের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। সাম্য ছাড়া স্বাধীনতার ধারণা কার্যকর হতে পারে না। ল্যাস্কি (H. Laski)-র মতানুসারে সমাজে বিশেষ সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা থাকলে জনগণের স্বাধীনতা থাকতে পারে না। বৈষম্যমূলক সমাজব্যবস্থায় সকলের পক্ষে সমমর্যাদা ভোগ অসম্ভব।

ভারতে সাম্যের নীতিকে কার্যকর করার ব্যবস্থা : ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনায় সকলের জন্য মর্যাদা ও সুযোগ-সুবিধার সমতা প্রতিষ্ঠার সাধু সংকল্প ঘোষণা করা হয়েছে। প্রস্তাবনার এই ঘোষণাকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য সংবিধানের ১৪ থেকে ১৮—এই পাঁচটি ধারায় সাম্যের অধিকার সংক্রান্ত ব্যবস্থাদি লিপিবদ্ধ হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ের নির্দেশমূলক নীতির মাধ্যমেও অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে সাম্য ও ন্যায়-নীতির কথা বলা হয়েছে। তা ছাড়া সংবিধানের ৩২৬ ধারায় রাজনৈতিক সাম্যের উল্লেখ আছে। এই ধারায় জাতি, ধর্ম, বর্ণ, জন্মস্থান, স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রাপ্তবয়স্ক সকল নাগরিকের সম-ভোটাধিকার স্বীকার করা হয়েছে। এই অধিকার জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের মাধ্যমে যথাযথভাবে প্রয়োগের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আবার প্রচলিত দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইনের মাধ্যমেও সাম্যের নীতিকে কার্যকর করার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

উৎস : সাম্যের অধিকার সম্পর্কিত আলোচনার ক্ষেত্রে ভারতীয় সংবিধানের রচয়িতারা মৌলিক উদারপন্থী গণতন্ত্রের তাত্ত্বিকদের পথ অনুসরণ করেছেন। তা ছাড়া তাঁরা ব্রিটেনের প্রথাগত আইন, মার্কিন শাসনতন্ত্রের চতুর্দশ সংশোধন, ডাইসির আইনের অনুশাসনের তত্ত্ব ও গান্ধীবাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষণায় (১৭৭৬) সাম্যের নীতি ঘোষিত হয়েছে। বলা হয়েছে যে 'সকলেই সমভাবে সৃষ্ট' (All men are created equal)। ফরাসী জাতীয় সংসদের ১৭৮৯ সালের অধিকার সংক্রান্ত ঘোষণা অনুসারে অধিকার সম্পর্কে সকলেই পরস্পরের সমান। মানবাধিকার সম্পর্কিত সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ঘোষণাও এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। এই ঘোষণার ১ ধারা অনুসারে জন্মগতভাবে সকলে স্বাধীন এবং মর্যাদা ও অধিকারের ক্ষেত্রে সমান। এই ঘোষণার ৭ ধারা অনুসারে সকলে আইনের চোখে সমান।

'আইনের দৃষ্টিতে সাম্য' ও 'আইনের সমান সংরক্ষণ' : সংবিধানের ১৪ধারা অনুসারে, "ভারতের ভূখণ্ডের মধ্যে রাষ্ট্র কোন ব্যক্তির 'আইনের দৃষ্টিতে সাম্য' অথবা 'আইনসমূহের দ্বারা সমভাবে সংরক্ষিত হওয়ার অধিকার' অস্বীকার করতে পারবে না" ("The State shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the laws within the territory of India.")। এই ধারাটিতে দু'ধরনের সাম্যের কথা বলা হয়েছে: (১) 'আইনের দৃষ্টিতে সাম্য' (equality before the laws) এবং (২) 'আইনের সমান সংরক্ষণ (equal protection of the laws)। বলা হয়েছে যে ভারতীয় ভূখণ্ডের মধ্যে রাষ্ট্র কোন ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই দু'টি অধিকার অস্বীকার করতে পারবে না। অধিকার দু'টির প্রথমটি ইংল্যাণ্ডের সাধারণ আইন থেকে এবং দ্বিতীয়টি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান থেকে নেওয়া হয়েছে বলা যেতে পারে। সুপ্রীম কোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি সুব্বারাও-এর মতানুসারে প্রথমটি নেতিবাচক এবং দ্বিতীয়টি ইতিবাচক। প্রথমটিতে বিশেষ সুযোগ-সুবিধার অনুপস্থিতি এবং দ্বিতীয়টিতে আইনের সমান আচরণের কথা বলা হয়েছে। 'আইনের দৃষ্টিতে সাম্য' এবং 'আইনের সমান সংরক্ষণ'—এই দু'য়ের মধ্যে পার্থক্য প্রসঙ্গে যাই বলা হোক না কেন উভয়ের উদ্দেশ্যের মধ্যে সাদৃশ্য আছে। ন্যায়বিচারের সমানাধিকার প্রতিষ্ঠাই হল উভয়ের উদ্দেশ্য। উভয়েরই উদ্দেশ্য হল আইনের অনুশাসন ও ন্যায়বিচারের ধারণাকে সুদৃঢ় করা। আনোয়ার আলি বনাম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার (১৯৫২) মামলায় রায় দান প্রসঙ্গে প্রধান বিচারপতি পাতঞ্জলি শাস্ত্রীর অভিমত অনুযায়ী সংবিধানের ১৪নং অনুচ্ছেদের দ্বিতীয় অভিব্যক্তিটি হল প্রথমটির পরিপূরক। আইনের দৃষ্টিতে সাম্য ক্ষুণ্ণ হলে, আইনসমূহ কর্তৃক সমভাবে সংরক্ষিত হওয়ার বিষয়টিও ক্ষুণ্ণ হতে বাধ্য।

'আইনের দৃষ্টিতে সাম্য' : 'আইনের দৃষ্টিতে সাম্য'— এই ধারণা ব্রিটেনের প্রথাগত আইন ও ডাইসি (Dicey)-র আইনের অনুশাসন তত্ত্বের দ্বিতীয় নীতির অনুসরণে রচিত। ডাইসির মতানুসারে 'আইনের দৃষ্টিতে সাম্য' বলতে বোঝায় যে, মর্যাদা ও অবস্থা নির্বিশেষে কোনও ব্যক্তিই দেশের আইনের ঊর্ধ্বে নয়। সকল ব্যক্তিই, প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে সাধারণ নাগরিক পর্যন্ত সকলেই দেশের সাধারণ আইনের (ordinary law) নিয়ন্ত্রণাধীন এবং সাধারণ আদালতের (ordinary courts) এক্তিয়ারভুক্ত। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের সকল কাজের জন্য আইনের কাছে সমানভাবে দায়িত্বশীল। কোন ব্যক্তিই রাষ্ট্রের কাছে বিশেষ সুযোগ-সুবিধা দাবি করতে পারবে না।

সংবিধানে 'আইনের দৃষ্টিতে সাম্য' নীতির কতকগুলি ব্যতিক্রমের কথা বলা হয়েছে।

(১) রাষ্ট্রপতি বা কোন রাজ্যপাল তাঁদের পদের ক্ষমতা প্রয়োগ ও কর্তব্য সম্পাদনের জন্য আদালতের কাছে দায়িত্বশীল থাকেন না। পদে অধিষ্ঠিত থাকাকালীন সময়ে তাঁদের বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা দায়ের করা যায় না। স্বপদে আসীন থাকাকালীন সময়ে তাঁদের গ্রেপ্তার বা কারাবাসের জন্য কোন আদালত নির্দেশ জারি করতে পারেন না। অর্থাৎ তাঁদের গ্রেপ্তার বা আটক করা যায় না। রাষ্ট্রপতি বা রাজ্যপালগণ পদে আসীন হওয়ার আগে বা পরে সম্পাদিত ব্যক্তিগত কাজকর্মের জন্য তাঁদের বিরুদ্ধে দেওয়ানী মামলা দায়ের করা যাবে। কিন্তু মামলা দায়ের করার আগে দু মাসের লিখিত নোটিশ দিতে হবে (৩৬১ ধারা)।

(২) কোন সরকারী কর্মচারি কর্তব্য পালনের সময় কোন ফৌজদারী অপরাধ করলেও রাষ্ট্রপতি বা রাজ্যপালের অনুমতি ছাড়া সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে আদালতে অভিযুক্ত করা যায় না (ভারতের ফৌজদারী দণ্ডবিধির ১৯৭ ধারা)। তা ছাড়া পদাধিকারবলে সরকারি কর্মচারিগণ যে সকল ক্ষমতা প্রয়োগ করে থাকেন, সাধারণ নাগরিকের পক্ষে তা সম্ভব নয়।

(৩) বিদেশী শাসক এবং রাষ্ট্রদূতগণ ভারতীয় আদালতের নিয়ন্ত্রণাধীন নন। তাঁদের ক্ষেত্রে এই নীতি কার্যকর হয় না। আন্তর্জাতিক আইনের বিধান অনুসারে এই সৌজন্যমূলক ব্যতিক্রম সকল সভ্য দেশেই মেনে চলা হয়।

(৪) কয়েকটি ক্ষেত্রে সাধারণ আদালতের পরিবর্তে শাসন-বিভাগীয় বিশেষ আদালতে বিরোধ মীমাংসার ব্যবস্থা হয়। প্রশাসনিক ও শ্রম আদালতের মাধ্যমে বিশেষ ধরনের বিরোধ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করা হয়। উদাহরণ হিসাবে ভাড়া-নিয়ন্ত্রণ ও শিল্প আদালতের কথা বলা যায়। বিশেষ ধরনের গুরুতর অপরাধের বিচারের জন্য 'বিশেষ আদালত' গঠন করা যায়। আবার সৈন্যবাহিনীর সদস্যদের বিচারের জন্য সামরিক ট্রাইব্যুনাল আছে।

(৫) ৪২-তম সংবিধান সংশোধনী আইন অনুসারে যে-কোন সরকারী কর্মচারী, স্থানীয় সংস্থা বা সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির কর্মচারীদের চাকরি সম্পর্কিত যাবতীয় বিরোধ মীমাংসার দায়িত্ব ট্রাইব্যুন্যালের হাতে ন্যস্ত করা হয়েছে। তাছাড়া শিল্প, ভূমিসংস্কার, খাদ্য সংগ্রহ ও বন্টন প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিরোধ মীমাংসার জন্যও সংশ্লিষ্ট আইনসভা আইনের মাধ্যমে ট্রাইব্যুনাল গঠন করতে পারে।

(৬) যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে শত্রুপক্ষের ব্যক্তিরা ভারতের আদালতে মামলা দায়ের করতে পারেন না। এবং অন্যান্য বন্দীদের মত সুযোগ-সুবিধাও পান না।

(৭) প্রধানমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রীদের বিরুদ্ধে কোন ফৌজদারী মামলা দায়ের করতে হলে রাষ্ট্রপতি ও রাজ্যপালের পূর্বানুমতি লাগে। সুপ্রীমকোর্ট ২০০৬ সালে ৬ ডিসেম্বর জারি করা এক নির্দেশে জানায় যে প্রাক্তনমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী, সাংসদ বা বিধায়কদের বিরুদ্ধে তদন্তকারী কোন সংস্থা দুনীর্তির মামলা করতে চাইলে আগাম অনুমতি নেওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। ডিভিশন বেঞ্চ রায়ে বলেছে, দুর্নীতি ছাড়া কর্তব্যে অবহেলা বা পদের অপব্যবহারের মত অন্য ধরনের মামলায় আগে অনুমোদন নেওয়ার যুক্তি রয়েছে।

(৮) তা ছাড়া সংসদ সদস্য ও অঙ্গরাজ্যের আইনসভার সদস্যদের বিশেষাধিকার ও অব্যাহতি সম্পর্কে সংবিধানের ১০৫ ও ১০৬ এবং ১৯৪ ও ১৯৫ ধারায় উল্লেখ আছে।

আইনের দ্বারা সমভাবে সংরক্ষিত হওয়ার অধিকার : আইনের সমান সংরক্ষণের অধিকার হল একাধারে একটি অধিকার এবং একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি। মার্কিন সংবিধানের চতুর্দশ সংশোধন থেকে এটি গৃহীত। মার্কিন সুপ্রীম কোর্টের অভিমত অনুসারে সমান অবস্থায় অবস্থিত সকলের উপর সমভাবে আইন প্রযুক্ত হবে। এ হল আইনের দ্বারা সমভাবে সংরক্ষিত হওয়ার অধিকার। এ অধিকারের অর্থ হল সমান অবস্থায় এবং সমান পর্যায়ের ব্যক্তিদের জন্য একই আইন থাকবে এবং তা সমান আচরণ করবে (Similar treatment under similar circumstances)। জেনিংস (Prof. Ivor Jennings) বলেছেন: 'সমপর্যায়ভুক্ত বিভিন্ন ব্যক্তির জন্য আইন হবে একই প্রকার এবং একইভাবে প্রযুক্ত হবে' ("....that among equals the law should be equal and should be equally administered, that like should be treated alike.")। একই অবস্থায় অবস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে রাষ্ট্র কোন বৈষম্যমূলক আচরণ করবে না। সুপ্রীম কোর্ট ১৯৫৩ সালে সতীশচন্দ্র বনাম ভারত সরকার মামলায় এই অভিমত ব্যক্ত করেছে। চিরঞ্জিতলাল চৌধুরী বনাম ভারত সরকার (১৯৫১), সতীশচন্দ্র বনাম ভারত সরকার (১৯৫৩) প্রভৃতি মামলায় ভারতের সুপ্রীম কোর্ট আইনের দ্বারা সমভাবে সংরক্ষিত হওয়ার অধিকার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছে যে, একই পরিস্থিতি বা অবস্থায় অবস্থিত সকল ব্যক্তি সমভাবে আইনের দ্বারা সংরক্ষিত হবে।

শ্রেণীবিভাজনের অর্থ ও প্রকৃতি : আইনের সমান সংরক্ষণ বলতে সকল ক্ষেত্রে প্রতিটি আইনের একই রকম প্রয়োগকে বোঝায় না। বিভিন্ন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর সমস্যা ও প্রয়োজন এক নয়। বিভিন্ন ব্যক্তি বা

গোষ্ঠীকে যুক্তিসঙ্গতভাবে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায় এবং ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে আইন পৃথকভাবে প্রযুক্ত হতে পারে। যেমন, আয়ের পরিমাণের বিভিন্নতা অনুসারে বিভিন্ন শ্রেণির ব্যক্তিদের জন্য পৃথক হারে আয়কর প্রদানের ব্যবস্থা করা যায়। রাষ্ট্র ব্যক্তিদের শ্রেণিবিভক্ত করে এবং আইনের উদ্দেশ্যের সঙ্গে যথাযথ সম্পর্ক বজায় রেখে বিভিন্ন শ্রেণির ব্যক্তিদের মধ্যে প্রভেদমূলক আইন প্রয়োগ করতে পারে (differential treatment under different circumstances)। **আনোয়ার আলি বনাম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার (১৯৫২)** মামলায় এই সিদ্ধান্ত হয়। অবস্থা ও পর্যায়ের বিভিন্নতা থাকলেই আইনও বিভিন্ন প্রকার হতে পারে। **চিরঞ্জিতলাল চৌধুরী বনাম ভারত সরকার ও অন্যান্য (১৯৫১)**—এই মামলায় রায় দিতে গিয়ে সুপ্রীম কোর্ট বলেছে: "equal protection means equal protection under equal circumstances." যেমন, রাষ্ট্র বিভিন্ন আয়ের ব্যক্তিদের বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত করে প্রত্যেক শ্রেণির ব্যক্তিদের কাছ থেকে বিভিন্ন আয়কর আদায় করতে পারে। যুক্তিসঙ্গত শ্রেণিবিভাজন অনুসারে আইন প্রণয়নের নীতিকে নিষিদ্ধ করা হয় নি (**হরনাম সিং মামলা, ১৯৫৪**)। যুক্তিসঙ্গত ভিত্তিতে ব্যক্তিদের মধ্যে শ্রেণিবিভাগ করে রাষ্ট্র বিভিন্ন শ্রেণির জন্য ভিন্ন ভিন্ন আইন প্রণয়ন করতে পারে বা আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে পৃথকীকরণ করতে পারে। যেমন, শিশু শিল্পকে কর প্রদান থেকে মুক্ত করার বা অনগ্রসর শ্রেণির জন্য বিশেষ সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করার দরকার হতে পারে। তবে শ্রেণিবিভাজন 'যুক্তিসঙ্গত' হওয়া দরকার। এবং শ্রেণিবিভাজনের যুক্তিসঙ্গতা আদালত নির্ধারণ করতে পারবে। **সি. আই. এমডেন বনাম উত্তর প্রদেশ রাজ্য (১৯৬০)** মামলায় রায় দিতে গিয়ে বিচারপতি এস. আর. দাস যুক্তিসঙ্গত শ্রেণীবিভাজনের ক্ষেত্রে দুটি শর্তের কথা বলেছেন: (১) শ্রেণিবিভাজনের নীতিটি সুস্পষ্ট এবং সহজবোধ্য হবে এবং (২) শ্রেণিবিভাজনের সঙ্গে আইনের উদ্দেশ্যের যুক্তিপূর্ণ সম্পর্ক থাকবে।

যুক্তিসঙ্গত পৃথকীকরণ : যুক্তিসঙ্গত শ্রেণিবিভাজনের ব্যাপারে কোন স্থায়ী নীতি নির্ধারণ করা হয়নি। আইনের উদ্দেশ্যের উপর শ্রেণিবিভাজনের ভিত্তিগত উপাদান নির্ভরশীল। যুক্তিসঙ্গত শ্রেণীবিভাজন সময়ের ব্যবধানের ভিত্তিতে হতে পারে [**ধীরেন্দ্র বনাম লিগাল রিমেম্ব্রানসার (১৯৫৫)**],আঞ্চলিক বা ভৌগোলিক ভিত্তিতে হতে পারে [**পুরুষোত্তম বনাম দেশাই (১৯৫৬)**] ব্যবসা-বাণিজ্য, বৃত্তি-উপজীবিকা প্রভৃতির ভিত্তিতে হতে পারে [**এম. বি. কটন অ্যাসোসিয়েশন বনাম ভারত সরকার (১৯৫৪)**]। তা ছাড়া নির্দিষ্ট কোন দ্রব্যের প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে আইনানুসারে এক শ্রেণির ব্যক্তির সঙ্গে অন্য শ্রেণির ব্যক্তির পার্থক্য করা যায় [**নারায়ণলাল বনাম মানেক (১৯৬১)**] এবং সামরিক ও অসামরিক ব্যক্তিদের মধ্যে পার্থক্য করা যায় [**বোম্বাই রাজ্য বনাম বালসারা (১৯৫১)**]। আবার বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের জন্য ভিন্ন ভিন্ন আইন প্রণীত হতে পারে [**মোতি দাস বনাম শাহী (১৯৫৯)**]। শ্রেণি বিভাজন বিবেচিত হয় সঠিক ও যুক্তিসঙ্গত পার্থক্যের উপর ভিত্তি করে আইনের মূল উদ্দেশ্যকে কার্যকর করার মাধ্যম হিসাবে [**প্রভাকর রাও বনাম অন্ধ্রপ্রদেশ সরকার (১৯৮৬)**]।

সংবিধান অনুসারে যুক্তিসঙ্গত শ্রেণিবিভাজন : ভারতের সংবিধানেই নানাভাবে যুক্তিসঙ্গত শ্রেণিবিভাজনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সংবিধানের ১৫(৩) ধারায় নারীজাতির জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণের কথা আছে। ১৬(৪) ধারায় তফসিলী জাতি ও উপজাতীয়দের জন্য সরকারী চাকরি সংরক্ষণের বিষয়ে উল্লেখ আছে; ৩৩০ ও ৩৩২ ধারায় তফসিলী জাতি ও উপজাতীয়দের জন্য লোকসভায় ও রাজ্যের আইনসভায় আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা আছে। আবার সংবিধানের ৩১০ (১) ধারায় সরকারী কর্মচারীদের চাকরির ক্ষেত্রে বিশেষ ব্যবস্থাদির কথা বলা হয়েছে। তেমনি আবার ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৯৭ ধারা অনুসারে সামাজিক মর্যাদা ও বিশেষ সংরক্ষণের স্বার্থে নারীজাতি বিশেষ অধিকার লাভ করেছে।

১৪ ধারার অধিকারটি পুরোপুরি আইনগত। এবং এই ধারায় উল্লিখিত বিধিনিষেধগুলি কেবলমাত্র রাষ্ট্রের বিরুদ্ধেই প্রযোজ্য, ব্যক্তির বিরুদ্ধে নয়। সংবিধানের ১৪ ধারায় স্বীকৃত অধিকার রাষ্ট্র অস্বীকার করতে পারে না। রাষ্ট্র বলতে কেন্দ্র ও রাজ্যের আইন-বিভাগ, স্বায়ত্তশাসনের প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং আইনের দ্বারা স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানসমূহকে বোঝান হয়েছে।

সংবিধানের ১৪ ধারার অধিকার দুটিকে কার্যকর করার জন্য প্রত্যেকে যাতে বিচার-ব্যবস্থার সুযোগ পেতে পারে তার ব্যবস্থা করা দরকার। সংবিধানের ৪২-তম সংশোধনী আইনে (১৯৭৬) দরিদ্রদের জন্য বিনাখরচায় আইনগত সাহায্য দানের কথা বলা হয়েছে, কিন্তু বিষয়টি সংবিধানের চতুর্থ অধ্যায়ের নির্দেশমূলক নীতির অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। নির্দেশমূলক নীতিগুলি হল অসংরক্ষিত অধিকার। এগুলি আদালতে বলবৎযোগ্য নয়। **দেবদসন বনাম ভারত সরকার [Devdasan V. Union of India (1969)]** মামলায় সুপ্রীম কোর্টের অভিমত হল: "Articles 14—16 taken together, enshrine the principle of equality and absence of discrimination."

সংবিধানের ১৪ ধারায় আইনের চোখে সাম্য এবং আইনসমূহের দ্বারা সমভাবে সংরক্ষিত হওয়ার মূল নীতিসমূহের উল্লেখ করা হয়েছে। অতঃপর সংবিধানের ১৫ থেকে ১৮ ধারার মধ্যে মূলত ভারতের নাগরিকদের জন্য এই নীতিগুলিকে কার্যকর করার সুনির্দিষ্ট পদ্ধতির সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

বৈষম্যমূলক আচরণ নিষিদ্ধ : সংবিধানের ১৫ ধারায় নাগরিকদের জন্য সম সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে। এই ধারা অনুসারে রাষ্ট্র কেবলমাত্র ধর্ম, বর্ণ, জাতি, নারী-পুরুষ, জন্মস্থান ভেদে বা তাদের কোন একটির ভিত্তিতে কোন নাগরিকের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করতে পারবে না [১৫(১) ধারা]। এ ক্ষেত্রে এই 'কেবলমাত্র' শব্দটির প্রয়োগ বিশেষভাবে অর্থবহ। উল্লিখিত কারণসমূহের মধ্যে এক বা একাধিক কারণ সহ অন্য কোন হেতুর জন্য যদি বৈষম্যমূলক আচরণ করা হয়, তা হলে তা এই অনুচ্ছেদের আওতায় আসবে না [**মতুরাম বনাম বোম্বাই রাজ্য (১৯৫৩)**]। তেমনি আবার বাসস্থানের কারণে বৈষম্য অবৈধ হবে না [**ডি. পি. যোশী বনাম মধ্যভারত রাজ্য (১৯৫৫)**]। এই ধারা অনুসারে উল্লিখিত নির্দিষ্ট ক্ষেত্রগুলিতে রাষ্ট্রের দিক থেকে বৈষম্যমূলক আচরণকে প্রত্যক্ষে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সংবিধানের এই ধারা কেবল রাষ্ট্রের বৈষম্যমূলক আচরণকে নিষিদ্ধ করেছে। ব্যক্তিগত আচরণই এই ধারার এক্তিয়ারের বাইরে আছে। আবার কেবলমাত্র উল্লিখিত কারণগুলির বা তাদের কোন একটির জন্য দোকান, সর্বসাধারণের ব্যবহার্য রেস্তোরাঁ, হোটেল ও প্রমোদস্থানে প্রবেশের ক্ষেত্রে এবং সরকারী অর্থে সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে পরিচালিত কিংবা জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য উৎসর্গীকৃত কূপ, জলাশয়, স্নানাগার, পথ ও সমাগম স্থান ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ বা অসামর্থ্য আরোপ করা যাবে না [১৫(২) ধারা]। এই ধারার বাধা নিষেধ সরকারী, বে-সরকারী সকল ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। এর ফলে সমাজের তথাকথিত নিম্নবর্গীয় মানুষের উপর অসামর্থ্যমূলক বা বৈষম্যমূলক আচরণের অবসান ঘটবে।

ব্যতিক্রম : তবে রাষ্ট্র জনগণের স্বার্থে কতকগুলি বিধি-নিষেধ আরোপ করতে পারে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় যে, জনস্বাস্থ্যের কথা বিবেচনা করে রাষ্ট্র উপরি-উল্লিখিত স্থানসমূহে ছোঁয়াচে রোগীদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করার জন্য আইনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। এ ছাড়াও সংবিধানেই দুটি ক্ষেত্রে সাম্যনীতির ব্যতিক্রমের কথা বলা হয়েছে। (১) রাষ্ট্র স্ত্রীলোক ও শিশুদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে [১৫ (৩) ধারা]। নারী ও শিশুদের বিশেষ প্রয়োজনের কথা বিবেচনা করে সংবিধানে এই বিশেষ ব্যবস্থার উল্লেখ করা হয়েছে। (২) সামাজিক ও শিক্ষাগত বিচারে সমাজের কোন অনগ্রসর শ্রেণির এবং তফসিলী জাতি ও উপজাতীয়দের উন্নতির জন্য রাষ্ট্র বিশেষ সংরক্ষণমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে। সংবিধানের ১৫ ধারা বা ২৯(২) ধারা এক্ষেত্রে কোন বাধার সৃষ্টি করতে পারবে না [১৫ (৪) ধারা]। এক্ষেত্রে উল্লেখ করা দরকার যে, মাদ্রাজ সরকার সরকারী কলেজগুলিতে ভর্তির ব্যাপারে নিম্নবর্ণের হিন্দু ও অ-হিন্দুদের জন্য কিছু আসন সংরক্ষণের জন্য নির্দেশ জারি করে। এই নির্দেশের বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টে একাধিক মামলা হয়। **মাদ্রাজ রাজ্য বনাম চম্পাকম দোরাইরাজন (১৯৫১)** মামলায় সুপ্রীম কোর্ট এই রায় দেয় যে মাদ্রাজ সরকারের সংশ্লিষ্ট নির্দেশ সংবিধানের ২৯ (২) ধারার বিরোধী এবং এই কারণে সংবিধান বিরোধী। তারপর সংবিধানের প্রথম সংশোধনের মাধ্যমে ১৫ (৪) ধারাটি প্রণীত হয়। এই ভাবে এক্ষেত্রে আদালত কর্তৃক আরোপিত বাধা অপসারিত হয়। ভারতের জটিল সমাজব্যবস্থা এবং প্রচলিত বিভিন্ন সামাজিক প্রথা ও সংস্কারের পরিপ্রেক্ষিতে ১৫ ধারায় সাম্যনীতির ব্যতিক্রম হিসাবে এই সমস্ত বিশেষ ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে।

সংবিধানের ১৫(৪) ধারা মোতাবেক 'সামাজিক ও শিক্ষাক্ষেত্রে অনুন্নত শ্রেণি' নির্ধারণ করা সহজ ব্যাপার নয়। এ ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিষয় বিচার্য বলে প্রতিপন্ন হয়। **ছোটেলাল বনাম উত্তরপ্রদেশ সরকার** (১৯৭৮) মামলায় সুপ্রীম কোর্টের সিদ্ধান্ত অনুসারে অনগ্রসরতা নির্ধারণের ক্ষেত্রে বর্ণ ও দারিদ্র্য দুটি বিষয়ই বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু কেবলমাত্র বর্ণ অথবা শুধুমাত্র দারিদ্র্য বিচার্য বিষয় হতে পারে না। সাম্প্রতিককালে সামাজিক ও শিক্ষাক্ষেত্রে অনগ্রসরতার কারণে সংরক্ষণের বিষয়টি রাজনীতিক ক্ষেত্রে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। তফসিলী জাতি ও উপজাতি ছাড়াও অন্যান্য শ্রেণির মানুষের জন্য সংরক্ষণের ব্যাপারে রাজনীতিক চাপ বর্তমানে বাড়ছে। তবে যে কোন পরিস্থিতিতে বরং যে কোন ধরনের সংরক্ষণই হল বৈষম্যমূলক। সুপ্রীম কোর্টের সিদ্ধান্ত অনুসারে গ্রামাঞ্চলের শিক্ষার্থীদের জন্য সংরক্ষণ হল অসাংবিধানিক। তবে উত্তরাঞ্চলের ও পাহাড়ী অঞ্চলের পরীক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে এই সংরক্ষণ বৈধ। কারণ সামাজিক শিক্ষাগত বিচারে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের অধিবাসীরা অনগ্রসর [**উত্তরপ্রদেশ সরকার বনাম প্রদীপ ট্যানডন (১৯৭৫)**]। তা ছাড়া সুপ্রীম কোর্টের সিদ্ধান্ত অনুসারে কোন বিশেষ একটি বছরে পঞ্চাশ শতাংশের অধিক পদ সংরক্ষণ অসাংবিধানিক। ৯৩ তম সংবিধান সংশোধনী (২০০৫) আইনে ১৫(৫) ধারা যুক্ত করে বলা হয়েছে যে, সামাজিক ও শিক্ষাক্ষেত্রে অনগ্রসর শ্রেণিসমূহের নাগরিক বা তফসিলি জাতি ও উপজাতীয়দের

জন্য রাষ্ট্র আইনের মাধ্যমে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে। বেসরকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত বা সাহায্যপ্রাপ্ত নয় এমন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সমেত যে কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তির ক্ষেত্রে এই বিশেষ ব্যবস্থা প্রযোজ্য হবে। তবে সংবিধানের ৩০(১) ধারায় উল্লিখিত সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্ষেত্রে এই ধারা প্রযোজ্য হবে না। সংবিধানের ১৫ ধারা বা ১৯(১)(ছ) ধারা এক্ষেত্রে কোনরকম প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারবে না।

সরকারী চাকরিতে সমানাধিকার : সংবিধানের ১৬ (১) ধারায় সরকারী চাকরি বা পদে নিয়োগের ব্যাপারে সকল নাগরিকের সমান সুযোগের কথা বলা হয়েছে। কোন নাগরিক জাতি, ধর্ম, বর্ণ, মূলবংশ, জন্মস্থান, স্ত্রী-পুরুষ অথবা এর যে-কোন একটি কারণের জন্য সরকারী চাকরিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে অযোগ্য বিবেচিত হবে না [১৬ (২) ধারা]। নিয়োগ ছাড়া বেতন, পদোন্নতি, ছুটি, পেনসন প্রভৃতি চাকরি সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়েও এই নিয়ম কার্যকরী হবে [**দক্ষিণ রেলওয়ে বনাম রঙ্গচারী (১৯৬২)**]। উপরিউক্ত ব্যবস্থাসমূহ সাম্প্রদায়িক বৈষম্যের বিরুদ্ধে এবং অঞ্চল ও নারী-পুরুষ ভেদে বৈষম্যের বিরুদ্ধে রক্ষাকবচ হিসাবে কার্যকর হবে।

ব্যতিক্রম : এই সমানাধিকারেরও কিছু ব্যতিক্রম আছে। (১) পার্লামেন্ট আইন করে কোন অঙ্গরাজ্যের বা আঞ্চলিক কর্তৃপক্ষের অধীন চাকরিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে বসবাসগত শর্ত আরোপ করতে পারে [১৬ (৩) ধারা]। বর্তমানে ৩৭১ (ঘ) ধারা অনুসারে কেবলমাত্র অন্ধ্রপ্রদেশের ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থা আছে। আগে ১৯৫৭ সালের সরকারী নিয়োগ সম্পর্কিত আইন অনুসারে অন্ধ্রপ্রদেশ ছাড়াও হিমাচল প্রদেশ, মণিপুর ও ত্রিপুরার কোন সরকারী চাকরি বা পদে নিয়োগের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার স্থায়ী বাসিন্দার শর্ত আরোপ করতে পারত। এই আইনের মেয়াদ ১৯৭৪ সালে শেষ হয়ে যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ করার দরকার যে, পার্লামেন্ট কোন রাজ্যের নির্দিষ্ট কোন জেলা বা অংশের জন্য বসবাসগত যোগ্যতা স্থির করে দিতে পারে না [**নরসীমা রাও বনাম অন্ধ্রপ্রদেশ (১৯৬৯)**]। (২) সরকার প্রয়োজন মনে করলে অনুন্নত শ্রেণির নাগরিকদের জন্য কিছু সরকারী চাকরি বা পদ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে পারে [১৬ (৪) ধারা]। (৩) ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত চাকরি ঐ ধর্মাবলম্বী ব্যক্তিদের জন্য সংরক্ষিত হতে পারে [১৬ (৫) ধারা]। (৪) প্রশাসনিক দক্ষতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সরকার তফসিলী জাতি ও উপজাতিদের সরকারি চাকরিতে নিয়োগকে অগ্রাধিকার দিতে পারেন (৩৩৫ ধারা)। সংবিধানের ১৬ ধারার সমানাধিকার কেবল সরকারী চাকরির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বেসরকারী চাকরির ক্ষেত্রে নয়। তা ছাড়া সংবিধানে অযৌক্তিক বা মাত্রাতিরিক্ত সংরক্ষণের কথা বলা হয় নি [**বালাজী বনাম মহীশূর রাজ্য (১৯৬৩)**]।

সাম্প্রতিককালের সংবিধান সংশোধনের পরিপ্রেক্ষিতে এই মৌলিক অধিকারটির আনুষঙ্গিক পরিবর্তন আলোচনা করা আবশ্যক। ৭৭তম সংবিধান সংশোধনী আইন প্রণীত হয় ১৯৯৫ সালে। এই সংশোধনী আইনে ১৬ (৪ক) ধারাটি সংযুক্ত হয়। এই ধারাটিতে বলা হয় যে সরকারি চাকরিতে নিয়োগ ও পদোন্নতির সময় সরকার তফসিলি জাতি ও তফসিলি উপজাতিদের জন্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে পারে। ২০০০ সালে ৮১তম সংবিধান সংশোধনী আইন প্রণীত হয়। এই সংশোধনী আইন অনুযায়ী ১৬ (৪খ) ধারাটি সংযুক্ত হয়। এই ধারায় বলা হয় যে, তফসিলি জাতি, তফসিলি উপজাতি এবং অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণি সমূহের জন্য সংরক্ষিত পদসমূহের মধ্যে যেগুলি অপূর্ণ, সেগুলিকে নতুন সংরক্ষিত খালি আসনের সংখ্যার সঙ্গে সংযুক্ত করা যাবে না। ৮২তম সংবিধান সংশোধনী আইন প্রণীত হয় ২০০০ সালে। এই সংশোধনী আইনে সংবিধানের ৩৩৫ ধারার সঙ্গে একটি ব্যবস্থা বা সংস্থান সংযুক্ত হয়েছে। এই ব্যবস্থায় বলা হয়েছে যে, পদোন্নতিমূলক পরীক্ষায় যোগ্যতা নির্ধারক নম্বর বা মান তফসিলি জাতি ও তফসিলি উপজাতির জন্য সরকার হ্রাস করতে পারে। ২০০২ সালে ৮৫তম সংবিধান সংশোধনী আইনে পুনরায় ১৬(৪ক) ধারায় পরিবর্তন সাধন করা হয়। এই পরিবর্তনের মাধ্যমে বলা হয় যে, তফসিলি জাতি ও তফসিলি উপজাতিদের জন্য সরকারি চাকরিতে পদোন্নতির বিষয়ে 'আনুষঙ্গিক প্রবীণতা' (Consequential seniority)-র নীতিটিও বিচার-বিবেচনা করতে হবে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে এই সংবিধান কার্যকর হওয়ার আগে কয়েকটি সরকারী পদ ইঙ্গ-ভারতীয় সম্প্রদায়ের ব্যক্তিদের জন্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা ছিল। এই সংরক্ষণ ব্যবস্থা ১৯৬০ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত কার্যকর ছিল (৩৩৬ ধারা)।

অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে অধিকার : সনাতন ভারতের সমাজব্যবস্থা বর্ণ ও জাত-পাতের ভিত্তিতে ক্রমস্তরবিন্যস্ত। এ রকম এক সামাজিক কাঠামোয় অস্পৃশ্যতার মত এক দুষ্ট ব্যাধির সৃষ্টি হয়। অস্পৃশ্যতা ভারতীয় সমাজজীবনের এক অভিশাপ। সংবিধানের ১৭ ধারায় এর বিলোপ সাধনের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং এর যে-কোন রকম আচরণ নিষিদ্ধ হয়েছে। অস্পৃশ্যতার দরুন কোন নাগরিকের উপর কোনরকম

অক্ষমতা আরোপ আইনানুযায়ী দণ্ডনীয় অপরাধ হিসাবে গণ্য হবে। অস্পৃশ্যতার কারণে কোন ব্যক্তিকে তার সুযোগ-সুবিধা বা অধিকার থেকে বঞ্চিত করলে অথবা অসম্মান করলে তা আইনতঃ দণ্ডনীয় অপরাধ হিসাবে গণ্য হবে। অস্পৃশ্যতার অবসানকে ভারতের সংবিধানে মৌলিক অধিকারগুলির অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই ভাবে সমাজজীবন থেকে বহুদিনের এক দুষ্ট ক্ষতকে দূর করার সংকল্প ব্যক্ত করা হয়েছে। এই অধিকারের উদ্দেশ্য হল সকলের জন্য সমমর্যাদা এবং সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা। এই উদ্দেশ্যে পার্লামেন্ট ১৯৫৫ সালে অস্পৃশ্যতা সংক্রান্ত অপরাধ আইন (The Untouchability Offence Act, 1955) পাস করেছে। তারপর আইনটির কিছু সংশোধন করা হয়। এই আইনটির বর্তমান নাম হল "Protection of Civil Rights Act." সংবিধানের ১৭ ধারায় অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে মৌলিক অধিকারের কথা বলা হয়েছে। এই অধিকার ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তবে এই অধিকার যাতে ক্ষুণ্ণ না হয় তা নজর রাখা রাষ্ট্রের সাংবিধানিক দায়িত্ব [পিপলস ইউনিয়ন ফর ডেমোক্রেটিক রাইট্স্ বনাম কেন্দ্রীয় সরকার (১৯৮২)]।

অস্পৃশ্যতা সম্পর্কিত অপরাধ আইন, ১৯৫৫ (The Untouchability offence Act, 1955) অনুসারে অস্পৃশ্যতার কারণে অপরাধ দণ্ডনীয়। দণ্ড ছ'মাসের জেল বা পাঁচশ' টাকা জরিমানা বা উভয়ই হতে পারে। অস্পৃশ্যতার অপরাধে দণ্ডিত ব্যক্তি পার্লামেন্ট বা রাজ্য আইনসভায় নির্বাচিত হতে পারে না। অস্পৃশ্যতা সম্পর্কিত অপরাধ আইনে নিম্নলিখিত কাজকে অপরাধ হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে। এগুলি হল : (১) সর্বসাধারণের পূজোর জায়গায় প্রবেশের বা পূজো করার ব্যাপারে বাধা দান; (২) ঐতিহ্যগত, ধর্মীয়, দার্শনিক ও অন্যান্য যুক্তিতে অস্পৃশ্যতাকে সমর্থন; (৩) দোকান, হোটেল বা সর্বসাধারণের প্রমোদস্থানে প্রবেশাধিকারকে অস্বীকার করা; (৪) তফসিলী জাতির কোন মানুষকে অস্পৃশ্যতার কারণে অপমান করা; (৫) সর্বসাধারণের স্বার্থে প্রতিষ্ঠিত হাসপাতাল, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বা ছাত্রাবাসে ভর্তি করতে অস্বীকার করা; (৬) প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষভাবে অস্পৃশ্যতা প্রচার করা, এবং (৭) কোন ব্যক্তিকে দ্রব্য বিক্রী করতে বা পরিষেবা প্রদান করতে অস্বীকার করা। সুপ্রীম কোর্টের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৭ নং অনুচ্ছেদের অধিকার ব্যক্তির বিরুদ্ধে ভোগ করা যায়।

পর্যালোচনা : ভারতের সংবিধানে বা অস্পৃশ্যতা সম্পর্কিত অপরাধ আইনে 'অস্পৃশ্যতার' সঠিক অর্থ সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে কিছু বলা হয় নি। সংশ্লিষ্ট আইনে কতকগুলি কাজকে অপরাধ বলে ঘোষণা করা হয়েছে। এবং সেই সমস্ত কাজের জন্য আইনত শাস্তি প্রদানের কথা বলা হয়েছে। এতদ্‌সত্ত্বেও ভারতের সমাজব্যবস্থা অস্পৃশ্যতার অভিশাপ থেকে মুক্তি পায় নি। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে হরিজন হত্যা বা নিগ্রহের ঘটনা ঘটে। অনেকের মতানুসারে অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ সম্পর্কিত ধারাটিকে চতুর্থ অধ্যায়ের নির্দেশমূলক নীতির অন্তর্ভুক্ত করা উচিত ছিল। প্রকৃত প্রস্তাবে ভারতের সমাজব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অস্পৃশ্যতা নিছক একটি আইনগত সমস্যা নয়। তাই কেবলমাত্র আইনানুগ ব্যবস্থার মাধ্যমে এই সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। এ হল মূলতঃ একটি সামাজিক এবং কতকাংশে একটি অর্থনৈতিক সমস্যা। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলের সক্রিয় সহযোগিতা আবশ্যক।

খেতাবের বিলুপ্তি : সমমর্যাদা ও বিশেষ মর্যাদা পরস্পরের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ। তাই কৃত্রিম বিভেদমূলক উপাধি প্রদানের ব্যবস্থাকে বিলুপ্ত করা হয়েছে। সামরিক বা বিদ্যাবিষয়ক গুণের পরিচায়ক নয় এমন কোন খেতাব বা উপাধি রাষ্ট্র প্রদান করতে পারবে না [১৮ (১) ধারা]। কোন ভারতীয় নাগরিক কোন বিদেশী রাষ্ট্রের কাছ থেকে কোন খেতাব গ্রহণ করতে পারবে না [১৮ (২) ধারা] । ভারত সরকারের কাজে নিযুক্ত বিদেশিগণও রাষ্ট্রপতির অনুমতি ছাড়া অপর রাষ্ট্রের কাছ থেকে কোন খেতাব গ্রহণ করতে পারেন না [১৮ (৩) ধারা]। ভারত সরকারের অধীন লাভজনক কোন পদে আসীন ব্যক্তি রাষ্ট্রপতির সম্মতি ছাড়া বিদেশী কোন রাষ্ট্রের কাছ থেকে কোন উপঢৌকন, বেতন বা পদ গ্রহণ করতে পারবেন না [১৮ (৪) ধারা]। সরকারী খেতাব জনসাধারণের মধ্যে কৃত্রিম শ্রেণিবৈষম্যের সৃষ্টি করে। তাই খেতাব অবসানের জন্য এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

ভারত সরকার কর্তৃক সম্মান বিতরণ : তবে ১৯৫৪ সাল থেকে ভারতের বিশিষ্ট নাগরিকদের সম্মানিত করার জন্য ভারত সরকার ভারতরত্ন, পদ্মবিভূষণ, পদ্মভূষণ, পদ্মশ্রী, প্রভৃতি সম্মান বিতরণের ব্যবস্থা চালু করেন। প্রতি বছর রাষ্ট্রপতি সাধারণতন্ত্র দিবসে ঐ সমস্ত সম্মান প্রদান করে থাকেন। জনতা সরকার ১৯৭৭ সালে এই ব্যবস্থা রদ করেন। ১৯৮০ সালে ইন্দিরা গান্ধীর সরকার ক্ষমতায় এসে উপাধি দানের ব্যবস্থা পুনরায় চালু করেছেন। তা ছাড়া ক্রীড়াক্ষেত্রে উৎকর্ষের স্বীকৃতি স্বরূপ অর্জুন পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা আছে। সংবিধান বিশেষজ্ঞদের মতানুসারে ভারতের কৃতী সন্তানদের সম্মানিত করার জন্য প্রদত্ত ভারতরত্ন, পদ্মভূষণ, পদ্মশ্রী প্রভৃতি সম্মানগুলি খেতাবের পর্যায়ভুক্ত নয়। টি. কে. টোপ (T. K. Tope) মন্তব্য করেছেন: "Bharat Ratna, Padma Bhusana and Padmashree are awards. They are not titles." এগুলি

পুরস্কার মাত্র। আগেকার দিনের স্যার, রায়বাহাদুর, রায় সাহেব, দেওয়ান বাহাদুর, মহারাজা প্রভৃতি ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক প্রদত্ত ইত্যাদি খেতাবের সঙ্গে এদের কোন যোগসূত্র নেই। সরকার সামরিক ও বিদ্যাবিষয়ক গুণের স্বীকৃতি হিসাবে উপাধি প্রদান করতে পারেন। এই ব্যবস্থা নতুন কিছু নয়। পূর্বতন সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নেও 'লেনিন পুরস্কার' দেওয়া হত। 'বালাজী রাঘবন বনাম ভারত সরকার' (১৯৯৬) মামলায় সুপ্রীম কোর্ট রায় দেয় যে, ভারতরত্ন, পদ্মভূষণ এবং পদ্মশ্রী হল জাতীয় পুরস্কার। এগুলি সাংবিধানিকভাবে বৈধ। এই সমস্ত জাতীয় পুরস্কারকে খেতাব বলা যায় না এবং এগুলি সংবিধানের ১৮ ধারার বিরোধী নয়। সুপ্রীম কোর্টের রায়ে আরও বলা হয় যে, প্রাপকরা এই সমস্ত পুরস্কার নামের আগে বা পরে ব্যবহার করতে পারবেন না।

মূল্যায়ন (Evaluation) : সাম্যের অধিকার ব্যতিরেকে গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার অস্তিত্ব অসম্ভব। ভারতের সংবিধানে তাই তৃতীয় অধ্যায়ের শুরুতেই যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে সাম্যের অধিকারকে বিধিবদ্ধ করা হয়েছে। কিন্তু ভারতীয় সংবিধানে স্বীকৃত সাম্যের অধিকার ক্ষেত্রবিশেষে সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছে।

(১) অর্থনৈতিক সাম্য স্বীকার করা হয় নি : এই পর্যায়ের অধিকারগুলির প্রকৃতি মূলতঃ সামাজিক বা রাজনৈতিক। ভারতীয় সমাজ হল ধনবৈষম্যমূলক। এই অর্থনৈতিক অসাম্যের উপস্থিতিতে উপরিউক্ত সামাজিক ও রাজনৈতিক সাম্যের সার্থক প্রয়োগের সুযোগ কম। কারণ অর্থনৈতিক সাম্য ছাড়া সামাজিক ও রাজনৈতিক সাম্য মূল্যহীন। আইনের দৃষ্টিতে সাম্য প্রতিষ্ঠার জন্য সমাজজীবন থেকে অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করা দরকার। ধনবৈষম্যমূলক সমাজব্যবস্থায় শ্রেণিস্বার্থের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। অর্থনৈতিক সাম্য ছাড়া সামাজিক ও রাজনৈতিক সাম্য অকার্যকর হয়ে পড়তে বাধ্য। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে দুর্বলব্যক্তি কখনই অন্যান্য ক্ষেত্রে সাম্যের অধিকার ভোগের সুযোগ পেতে পারে না। সাম্যের আদর্শকে ভারতে যথাযথভাবে কার্যকর করতে হলে ধনবৈষম্যকে হ্রাস করতে হবে।

(২) অত্যধিক ব্যতিক্রমের উল্লেখ সাম্যের অধিকারকে ক্ষুণ্ণ করেছে। সাম্যের অধিকারের স্বীকৃতির সঙ্গে সঙ্গে সংবিধানে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বহু ব্যতিক্রমের উল্লেখ আছে। বিশেষ প্রয়োজনে রাষ্ট্রকে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। তার ফলে জনগণের সাম্যের অধিকার ক্ষুণ্ণ হয়েছে।

(৩) রাজ্য সরকারের চাকরিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে স্থায়ী বাসিন্দার শর্ত সাম্যের আদর্শের বিরোধী। এই কারণে 'অসম অসমীয়াদের জন্য', 'তামিলনাড়ু তামিলদের জন্য' প্রভৃতি প্রাদেশিক জিগিরের সৃষ্টি হয়েছে।

(৪) যুক্তিসঙ্গত পৃথকীকরণের ব্যাপারে সরকারকে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এর যথার্থতা বিচারের ব্যাপারে আদালতের এক্তিয়ার সীমাবদ্ধ। পার্লামেন্ট সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে আদালত কর্তৃক আরোপিত বিধিনিষেধকে অতিক্রম করেছে (চম্পাকম ডোরাইরাজন বনাম মাদ্রাজ রাজ্য)।

(৫) সংবিধানে অনুন্নত সম্প্রদায়ের কোন সংজ্ঞা নেই। এ ক্ষেত্রে সরকারী ক্ষমতা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত হতে পারে। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে কোন সম্প্রদায়ের প্রতি পক্ষপাতমূলক আচরণের জন্য এই ক্ষমতার অপব্যবহারের আশংকা আছে।

(৬) অনেকের মতে সাধারণতন্ত্র দিবসে খেতাব বিতরণ সাম্য বিরোধী। 'ভারতরত্ন' উপাধিধারীদের মর্যাদাগত বিচারে ক্যাবিনেট মন্ত্রীদের পরেই স্থান দেওয়া হয়। তা ছাড়া রাষ্ট্রপতি ১৯৫০ সালে এক আদেশবলে ঘোষণা করেছেন যে, ভারতের কাছে কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলি বিদেশী রাষ্ট্র হিসাবে গণ্য হবে না। অর্থাৎ এই সমস্ত রাষ্ট্রের কাছ থেকে সম্মানমূলক উপাধি গ্রহণ করতে আইনগত কোন বাধা নেই। এই ব্যবস্থা আপত্তিকর।

(৭) সংবিধানে অনুন্নত ও তপসিলী সম্প্রদায়ের স্বার্থে সংরক্ষণসূচক ব্যবস্থা জাতীয় সংহতির বিরোধী। আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ছাড়া সংশ্লিষ্ট সংরক্ষণমূলক ব্যবস্থাদির যথাযথ বাস্তবায়ন অসম্ভব। তা ছাড়া সামগ্রিক বিচারেও কেবলমাত্র আইনগত সাম্যের ভিত্তিতে অনগ্রসর শ্রেণির অগ্রগতি হতে পারে না। এই কারণে এখনও ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে অনুন্নত সম্প্রদায়ের ব্যক্তিদের উপর নির্যাতন-নিগ্রহের ঘটনা ঘটছে।

(৮) প্রকৃত প্রস্তাবে ভারতীয় সংবিধানের রচয়িতারা এ ক্ষেত্রে পাশ্চাত্যের উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক আদর্শের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছেন। অনেকের মতে এই কারণে সাম্যের আদর্শকে ব্যাপক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করা যায় নি।

৬.৮ স্বাধীনতার অধিকার (Right to Freedom)

স্বাধীনতার অধিকার গণতন্ত্রের ভিত্তিস্বরূপ। ব্যক্তির কাছে স্বাধীনতার প্রশ্নটি একটি জন্মগত অধিকারের

প্রশ্নের মতই প্রতিপন্ন হয়। স্বাধীনতা হল একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক আদর্শ। এই আদর্শ অত্যন্ত জনপ্রিয়ও বটে। আধুনিক গণতান্ত্রিক যুগে এ চেতনা ক্রমবর্ধমান। স্বাধীনতার অধিকারের মত অপর কোন অধিকার মানুষের মনে এত বেশী উদ্দীপনার সৃষ্টি করে না।

স্বাধীনতার অধিকারের গুরুত্ব : স্বাধীনতা হল ব্যক্তির আত্মোপলব্ধির এক অনুকূল পরিবেশ। ল্যাস্কি বলেছেন: ''স্বাধীনতা বলতে আমি বুঝি সেই পরিবেশের সযত্ন সংরক্ষণ যেখানে মানুষ তার সত্তাকে পরিপূর্ণভাবে বিকশিত করার সুযোগ পায়।'' স্বাধীনতার অধিকার ছাড়া ব্যক্তিসত্তার পরিপূর্ণ বিকাশ অসম্ভব। আবার ব্যক্তিত্বের বিকাশ ছাড়া দেশে সুনাগরিকের সৃষ্টি হতে পারে না। আর সুনাগরিকই হল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সাফল্যের মূল শর্ত। তাই স্বাধীনতার অধিকার গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে মৌলিক অধিকারের মূল ভিত্তি হিসাবে গণ্য হয়। প্রকৃত প্রস্তাবে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় স্বাধীনতার অধিকার অন্যান্য অধিকারের প্রাণকেন্দ্র হিসাবে বিবেচিত হয়।

১৯ ধারার স্বাধীনতার অধিকার : ভারতীয় সংবিধানের প্রণেতারা ব্যক্তি-স্বাধীনতার গুরুত্ব সম্পর্কে সম্যক অবহিত ছিলেন। সংবিধানের প্রস্তাবনাতেই ভারতীয় নাগরিকদের জন্য স্বাধীনতার অধিকার সংরক্ষণের সাধু সংকল্প ঘোষণা করা হয়েছে। এবং এই সংকল্পকে কার্যকর করার জন্য সংবিধানের ১৯ থেকে ২২ ধারার মধ্যে ব্যক্তির স্বাধীনতা স্বীকার ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। মূল সংবিধানের ১৯ ধারায় সাত প্রকার স্বাধীনতার অধিকারের উল্লেখ ছিল। তাই এই ১৯নং অনুচ্ছেদটিকে বলা হত সপ্ত স্বাধীনতার অধিকারের অনুচ্ছেদ। কিন্তু ১৯৭৮ সালে ৪৪তম সংবিধান সংশোধনী আইনে সম্পত্তি অর্জন, দখল ও হস্তান্তরের স্বাধীনতাকে বাদ দেওয়া হয়েছে। তাই এখন ১৯ ধারায় ছয় প্রকার স্বাধীনতার অধিকার আছে। এই অধিকারগুলি ব্যক্তির সুখ-শান্তি ও ব্যক্তিত্ব বিকাশের অপরিহার্য শর্ত হিসাবে বিবেচিত হয়। পাইলীর মতানুসারে এই সমস্ত স্বাধীনতার অধিকার নাগরিকগণ কতটা ভোগ করতে পারে সেটাই হল একটি সমাজের গণতান্ত্রিক প্রকৃতি নির্ধারণের মানদণ্ড। তিনি বলেছেন: "The very test of a democratic society lies in the extent to which these freedoms are enjoyed by the citizens in general."

ছটি স্বাধীনতার অধিকার : ১৯(১) ধারায় উল্লিখিত স্বাধীনতার অধিকারগুলি হল: (ক) বাক্য ও মতামত প্রকাশের অধিকার (the right to freedom of speech and expre-ssion) ; (খ) শান্তিপূর্ণ ও নিরস্ত্রভাবে সমবেত হওয়ার অধিকার (the right to assemble peaceably and without arms); (গ) সমিতি বা সংঘ গঠনের অধিকার (the right to form association or unions); (ঘ) ভারতের সর্বত্র স্বাধীনভাবে চলাফেরার অধিকার (the right to move freely throughout the territory of India); (ঙ) ভারতের ভূখণ্ডের যে-কোন অংশে বসবাস করার অধিকার (the right to reside and settle in any part of the territory of India) ; (চ) সম্পত্তি অর্জন, দখল ও হস্তান্তরের অধিকার (the right to acquire, hold and dispose of property) [৪৪তম সংবিধান সংশোধনী আইনে (১৯৭৮) ১৯(চ) ধারাটি বাতিল হয়েছে।]; (ছ) যে-কোন বৃত্তি অবলম্বন করার, অথবা যে-কোন উপজীবিকা, ব্যবসা বাণিজ্য চালানোর অধিকার (the right to practise any profession or to carry any occupation, trade or business)। একত্রে এই অধিকারগুলিকে বলা হয় 'নাগরিকের সহজাত অধিকার' [পশ্চিমবঙ্গ সরকার বনাম সুবোধ গোপাল (১৯৫৪)]।

বাক্য ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা : ব্যক্তির ব্যক্তিসত্তার বিকাশের ক্ষেত্রে উল্লিখিত ছটি স্বাধীনতার অধিকার বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। সংবিধানের ১৯(১)(ক) ধারায় বাক্যের ও অভিব্যক্তির স্বাধীনতা স্বীকার করা হয়েছে। বাক্য ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা হল গণতান্ত্রিক সমাজের মূল ভিত্তি তথা অপরিহার্য শর্ত। ভারতের সংবিধানে এই অধিকারটির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এখানে সকল নাগরিক স্বাধীনভাবে যে যার চিন্তা-ভাবনা ও মতামত প্রকাশ করতে পারে। লিখিত বা মৌখিকভাবে তা করা যায়। পুস্তক-পুস্তিকা, পত্র-পত্রিকা প্রভৃতির মাধ্যমে লিখিতভাবে নাগরিকগণ নিজ নিজ ধ্যান-ধারণা প্রকাশ করতে পারে। আবার সভা-সমিতি, আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে স্ব স্ব অভিমত ব্যক্ত করতে পারে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে মার্কিন সংবিধানে নাগরিকদের পৃথকভাবে মুদ্রাযন্ত্র ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা (freedom of press) স্বীকার করা হয়েছে। কিন্তু ভারতের সংবিধানে এই স্বাধীনতার কথা আলাদাভাবে উল্লেখ করা হয় নি। তবে পৃথকভাবে এই অধিকারের উল্লেখের প্রয়োজন নেই। কারণ মতামত প্রকাশের অধিকারের মধ্যেই মুদ্রাযন্ত্র ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নিহিত আছে। গণপরিষদে ডঃ আম্বেদকর বলেছেন যে, সংবাদপত্রের ম্যানেজার বা সম্পাদক ভারতের নাগরিক। ভারতের নাগরিক হিসাবে তিনি বা তাঁরা সংবাদপত্রের মাধ্যমে তাঁদের মতামত প্রকাশ করতে পারেন। সংবিধানে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতার অধিকার স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করা দরকার নেই। ভারতের সুপ্রীম কোর্টও **রমেশ থাপ্পার** বনাম মাদ্রাজ রাজ্য মামলায় (১৯৫০) এই অভিমত ব্যক্ত করেছে।

সংবিধানের ১৯(১)(খ) ধারায় শান্তিপূর্ণভাবে ও নিরস্ত্র হয়ে সমবেত হওয়ার অধিকার স্বীকার করা হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ কোন বিষয়ে আলাপ-আলোচনার জন্য নাগরিকগণ জনসমাবেশ বা শোভাযাত্রার সামিল হতে পারে।

সমিতি বা সংঘ গঠনের অধিকার : সংবিধানের ১৯(১)(গ) ধারায় সমিতি বা সংঘ গঠন করার অধিকার স্বীকার করা হয়েছে। এই অধিকারবলে নাগরিকগণ সাহিত্য-সংস্কৃতি, বিজ্ঞান, খেলাধুলা প্রভৃতি ক্ষেত্রে সংঘ-সমিতি গঠন করতে পারে। তা ছাড়া রাজনৈতিক দল, শ্রমিক সংঘ প্রভৃতিও গঠন করা যায়। মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা এবং সমিতি বা সংঘ গঠনের অধিকার পরস্পরের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। লাইলী বলেছেন: "Freedom of assembly and freedom of speech go hand in hand." এ দুটি অধিকার ছাড়া রাজনৈতিক দল গঠন সমেত অন্যান্য গণতান্ত্রিক কাজকর্ম চালান যায় না।

যাতায়াত ও বসবাসের অধিকার : সংবিধানের ১৯(১) (ঘ) ধারায় ভারতের রাজ্যক্ষেত্রের মধ্যে সর্বত্র স্বাধীনভাবে চলাফেরা করার এবং ১৯(১) (ঙ) ধারায় ভারতের যে-কোন অঞ্চলে বসবাস করার অধিকার নাগরিকদের প্রদান করা হয়েছে। এ দুটি অধিকারও গুরুত্বপূর্ণ। ভারতের সর্বত্র বিনা বাধায় গমনাগমনের অধিকারের উপর স্বাধীনতার অন্যান্য অধিকারগুলির ব্যবহারিক প্রয়োগ নির্ভরশীল। তা ছাড়া ভারতে এক নাগরিকত্বের নীতি স্বীকৃত। সকলেই ভারতের নাগরিক। তাই প্রত্যেক নাগরিকের বিনা বাধায় দেশের সর্বত্র গমনাগমনের এবং বসবাসের অধিকার অস্বীকার করা যায় না।

পেশা বা বৃত্তি গ্রহণের অধিকার : সংবিধানের ১৯ (১) (ছ) ধারায় যে-কোন বৃত্তি গ্রহণ করার অথবা যে-কোন উপজীবিকা, ব্যবসা বা কারবার চালনার অধিকার স্বীকার করা হয়েছে। ভারতের জটিল সমাজব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নাগরিকদের এই অধিকারের গুরুত্বকে অস্বীকার করা যায় না। ভারতের সমাজব্যবস্থা বর্ণ ও জাত-পাতের ভিত্তিতে ক্রমস্তরবিন্যস্ত। সনাতন ভারতের চলে আসা ধারা অনুসারে ব্যক্তির বৃত্তি বা উপজীবিকা বর্ণ বা জাতির ভিত্তিতে উত্তরাধিকার সূত্রে নির্ধারিত হয়। গুণগত যোগ্যতা বড় একটা বিবেচনা করা হয় না। যাতে জাতি বা বর্ণ বৃত্তি গ্রহণের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে না দাঁড়ায়, তার জন্য বৃত্তি, উপজীবিকা এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের স্বাধীনতা স্বীকার করা হয়েছে। গণতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার সাফল্যের স্বার্থে উপরিউক্ত স্বাধীনতার অধিকারগুলির গুরুত্ব ও তাৎপর্য বিরোধ-বিতর্কের ঊর্ধ্বে।

স্বাধীনতার অধিকারগুলি অবাধ নয় : উল্লিখিত স্বাধীনতার অধিকারগুলি অবাধ বা নিরঙ্কুশ নয়। অধিকার মাত্রই অবাধে ভোগ করা যায় না। অবাধ স্বাধীনতা স্বেচ্ছাচারের নামান্তর। এ. কে. গোপালন বনাম মাদ্রাজ রাজ্য মামলায় (১৯৫০) বিচারপতি মুখোপাধ্যায়ের মতানুসারে স্বাধীনতা নিরঙ্কুশ ও অনিয়ন্ত্রিত হতে পারে না। কারণ তা হলে বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতার সৃষ্টি হবে। ব্যক্তির অনিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতা সমাজজীবনে নৈরাজ্য ও বিপর্যয়ের সৃষ্টি করে। এ রকম অবস্থায় সকলের পক্ষে স্বাধীনতা ভোগ সম্ভব হয় না। সকলের স্বাধীনতা ভোগকে সুনিশ্চিত করতে হলে কারও স্বাধীনতা ভোগ অবাধ বা অনিয়ন্ত্রিত হতে পারে না। প্রত্যেকের স্বাধীনতা সকলের স্বাধীনতা ভোগের শর্তসাপেক্ষ। রাষ্ট্রের মধ্যে স্বীকৃত স্বাধীনতা শর্তসাপেক্ষ ও নিয়ন্ত্রিত ("Liberty within the state is then a relative and regulated liberty.")। তাই কোন রাষ্ট্রেই নাগরিকদের অবাধ স্বাধীনতার অধিকার স্বীকার করা হয় না। ভারতীয় সংবিধানেও জনসমাজের বৃহত্তর স্বার্থে উল্লিখিত ছ'টি অধিকারের উপর যুক্তিসঙ্গত বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। বস্তুতঃ ১৯ ধারাটি দু'ভাগে বিভক্ত। একভাবে [১৯ (১)] আছে অধিকারের উল্লেখ এবং অপরভাগে [১৯ (২-৬)] আছে অধিকারগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করার বিধিনিষেধ। ১৯(১) ধারায় ব্যক্তিকে অধিকার প্রদান করা হয়েছে এবং ১৯(২-৬) ধারায় জাতীয় স্বার্থ ও সামাজিক শৃঙ্খলা সংরক্ষণের উদ্দেশে রাষ্ট্রের হাতে কিছু নিয়ন্ত্রণমূলক ক্ষমতা ন্যস্ত করা হয়েছে। এই ধারাটিতে ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও সামাজিক নিয়ন্ত্রণের মধ্যে সামঞ্জস্য সাধন করা হয়েছে। সংবিধানের এই ধারা-বলে রাষ্ট্র আইনের মাধ্যমে স্বাধীনতার অধিকারগুলির উপর 'যুক্তিসঙ্গত বিধিনিষেধ' (reasonable restrictions) আরোপ করতে পারে। এক্ষেত্রে রাষ্ট্র বলতে কেন্দ্রের ও অঙ্গরাজ্যের আইনসভা এবং করপোরেশন, মিউনিসিপ্যালিটি প্রভৃতি সরকারের স্থানীয় কর্তৃপক্ষকেও বোঝাবে।

সংবিধানের ১৯ ধারায় উল্লিখিত ছ'দফা স্বাধীনতার অধিকারের উপর নিম্নলিখিত বাধানিষেধের কথা বলা হয়েছে।

(১) রাষ্ট্র নিম্নোক্ত কারণে বাক্য ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতার উপর যুক্তিসঙ্গত নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে পারে। কারণগুলি হল: (ক) রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, (খ) বিদেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রক্ষা, (গ) জনশৃঙ্খলা বজায় রাখা, (ঘ) শিষ্টতা বা নৈতিকতা রক্ষা, (ঙ) আদালতের অবমাননা প্রতিরোধ, (চ) মানহানি প্রতিরোধ, (ছ) অপরাধ অনুষ্ঠানে প্ররোচনা প্রতিরোধ এবং (জ) ভারতের সার্বভৌমিকতা ও সংহতি [১৯(২) ধারা]। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা দরকার যে উল্লিখিত সকল বিধিনিষেধগুলির কথা মূল সংবিধানে ছিল না।

রমেশ থাপার বনাম মাদ্রাজ রাজ্য মামলায় (১৯৫০) সুপ্রীম কোর্টের রায়ে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণমূলক ক্ষমতা ক্ষুণ্ণ হয়। এই অবস্থায় সংবিধানের প্রথম সংশোধনের (১৯৫১) মাধ্যমে জনশৃঙ্খলা রক্ষা, বিদেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে মৈত্রীপূর্ণ সম্পর্ক রক্ষা এবং অপরাধ অনুষ্ঠানে প্ররোচনা প্রতিরোধ প্রভৃতি খাতে নিয়ন্ত্রণ আরোপের ক্ষমতা রাষ্ট্রের হাতে আসে। তারপর ষোড়শ সংবিধান সংশোধনী আইন (১৯৬৩)-এর মাধ্যমে ভারতের সার্বভৌমিকতা ও সংহতির স্বার্থে রাষ্ট্রকে বাধানিষেধ আরোপের ক্ষমতা দেওয়া হয়।

(২) সমবেত হওয়ার অধিকারের উপর কতকগুলি বিধিনিষেধ আরোপিত হয়। সমাবেশ হবে (ক) শান্তিপূর্ণ এবং (খ) নিরস্ত্র। তা ছাড়া (গ) জনশৃঙ্খলা এবং (ঘ) ভারতের সার্বভৌমিকতা ও সংহতির স্বার্থেও রাষ্ট্র সমাবেশের উপর যুক্তিসঙ্গত বিভিন্ন বাধানিষেধ আরোপ করতে পারবে [১৯ (৩) ধারা]।

(৩) সমিতি বা সংঘ গঠনের অধিকারের উপর জনশৃঙ্খলা বা সদাচারের স্বার্থে যুক্তিসঙ্গত নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা যায়। এই কারণে অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হওয়া, জাতীয় শান্তির পরিপন্থী সংস্থা গঠন করা, বা বে-আইনী ধর্মঘট করা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা যায়। তা ছাড়া এ ক্ষেত্রেও ভারতের সার্বভৌমিকতা ও সংহতির শর্ত প্রযোজ্য [১৯(৪) ধারা]।

(৪) স্বাধীনভাবে চলাফেরার অধিকার এবং (৫) ভারতের যে-কোন স্থানে বসবাসের অধিকার জনস্বার্থে বা তফসিলী উপজাতিদের স্বার্থে রাষ্ট্র কর্তৃক আরোপিত যুক্তিসঙ্গত নিয়ন্ত্রণের দ্বারা সঙ্কুচিত হতে পারে [১৯(৫) ধারা]। জনশৃঙ্খলা বজায় রাখার স্বার্থে রাষ্ট্র যাতায়াত ও বসবাসের অধিকারকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে [খারে বনাম দিল্লী রাজ্য (১৯৫০)]।

(৫) বৃত্তি বা উপজীবিকা গ্রহণ এবং ব্যবসা-বাণিজ্য করার অধিকার রাষ্ট্র কর্তৃক জনস্বার্থে আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধা-নিষেধের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে পারে [১৯(৬) ধারা]। রাষ্ট্র বিভিন্ন বৃত্তি বা পেশা অবলম্বনের ক্ষেত্রে আবশ্যক যোগ্যতা নির্ধারণ করে দিতে পারে। রাষ্ট্র বৃত্তি, উপজীবিকা এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য বৃত্তি-বিষয়ক ও প্রযুক্তিবিদ্যা-বিষয়ক যোগ্যতা স্থির করে দিতে পারে। প্রয়োজনীয় যোগ্যতা অর্জন না করেই যে-কোন ব্যক্তি চিকিৎসকের পেশা গ্রহণ করলে জনজীবনে অপূরণীয় ক্ষতি হবে। তা ছাড়া সমাজ ও সমাজবাসীদের বৃহত্তর স্বার্থে রাষ্ট্র যে-কোন শিল্পসংস্থা বা ব্যবসা-বাণিজ্যকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পরিচালনা বা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

সমালোচনা : সংবিধানের ১৯ ধারায় উল্লিখিত স্বাধীনতার অধিকারগুলির উপর আরোপিত নিয়ন্ত্রণ বিরূপ সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছে। সমালোচকদের মতানুসারে (ক) উল্লিখিত বিধিনিষেধগুলির মাধ্যমে রাষ্ট্র জনগণের স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে ব্যাপক ক্ষমতা পেয়েছে। (খ) বারবার সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে আদালতের নির্দেশকে অতিক্রম করে এই বিধিনিষেধের তালিকাকে ক্রমশঃ দীর্ঘতর করা হয়েছে। এই প্রবণতা অগণতান্ত্রিক। (গ) তা ছাড়া, জনস্বার্থ, জনশৃঙ্খলা, অপরাধ অনুষ্ঠানে প্ররোচনা, বিদেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে মৈত্রীপূর্ণ সম্পর্ক প্রভৃতি ধারণাগুলি অস্বচ্ছ এবং ব্যাপকভাবে অর্থবহ। তাই এসবের অজুহাতে অনেক ক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয় নিয়ন্ত্রণ আরোপিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। পরিস্থিতির গাম্ভীর্য বিচার-বিবেচনা না করেই কর্তৃপক্ষ বিধিনিষেধগুলি প্রয়োগ করতে পারে। (ঘ) প্রসঙ্গত আর একটি ত্রুটির কথা বলা হয়। ১৯ ধারার স্বাধীনতার অধিকারগুলি ব্যক্তির স্বাধীনতাকে রাষ্ট্রের অবৈধ হস্তক্ষেপ থেকে রক্ষা করে। কিন্তু স্বাধীনতার অধিকারগুলি ব্যক্তিবিশেষও লঙ্ঘন করতে পারে। তখন কিন্তু ১৯ ধারার সাহায্যে কোন প্রতিকার পাওয়া যাবে না। সেক্ষেত্রে সাধারণ আইনের মাধ্যমে প্রতিবিধানের ব্যবস্থা করতে হবে [**Samdasam *V.* Central Bank of India (1952)**] (ঙ) নিবর্তনমূলক আটক আইনে ব্যক্তি ১৯ ধারার অধিকারের ভিত্তিতে কোন প্রতিকার পান না।

যুক্তিসঙ্গত বিধি-নিষেধের রক্ষাকবচ : সংবিধানের ১৯ ধারায় উল্লিখিত স্বাধীনতার অধিকারগুলি অবাধ নয়। তেমনি অধিকারগুলির উপর আরোপিত বাধানিষেধগুলিও অবাধ, অনিয়ন্ত্রিত ও স্বেচ্ছাচারী হতে পারে না। সংবিধানে বলা হয়েছে যে বিধিনিষেধগুলি যুক্তিসঙ্গত (reasonable) হবে। কর্তৃপক্ষের ক্ষমতার অপব্যবহারের আশংকার বিরুদ্ধে এটাই হল একমাত্র রক্ষাকবচ। বিধিনিষেধের যুক্তিসঙ্গততা নির্ধারণের ক্ষমতা সংবিধান শাসন-বিভাগ বা আইন-বিভাগকে দেয় নি। এই ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ আদালতকে। কোন আইনের বিধিনিষেধ যুক্তিসঙ্গত নয় মনে করলে আদালত সেই আইন বা তার অংশবিশেষকে অসাংবিধানিক বলে বাতিল করতে পারে [**Quareshi *V.* State of Bihar (1959)**]। এ. কে. গোপালন বনাম মাদ্রাজ রাজ্য মামলায় (১৯৫০) যুক্তিসঙ্গত বিধিনিষেধের সমর্থনে বিচারপতি দাস (Justice Das) বলেছেন যে, আইনের উদ্দেশ্য বৃহত্তর সামাজিক স্বার্থ সাধন করলে সামগ্রিক স্বার্থে মুষ্টিমেয় ব্যক্তির স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা যায়। তবে 'যুক্তিসঙ্গত বিধিনিষেধ' কাকে বলে সংবিধানে তা ব্যাখ্যা করা হয় নি। তাই আদালত বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিধিনিষেধের প্রকৃতি ও পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ

করেছে। তবে চিন্তামন রাও বনাম মধ্যপ্রদেশ রাজ্য মামলায় (১৯৫২) সুপ্রীম কোর্ট যুক্তিসঙ্গত বিধিনিষেধের দুটি নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছে। বলা হয়েছে যে বিধিনিষেধগুলি স্বেচ্ছাচারমূলক বা প্রয়োজনের অতিরিক্ত হবে না। ব্যক্তিস্বাধীনতা ও সামাজিক স্বার্থের মধ্যে যথাযথ সামঞ্জস্য সাধন করতে পারলে বিধিনিষেধ যুক্তিসঙ্গত হবে। শ্রীদুর্গাদাস বসু (D. D. Basu)-এর মতানুসারে, যুক্তিসঙ্গত বিধিনিষেধকে ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও সামাজিক স্বার্থের সমন্বয়কারী হতে হবে। শ্রী বসু আরও বলেছেন যে, বিধিনিষেধ আরোপের পদ্ধতিও হবে যথাযথ ও ন্যায়সঙ্গত (fair and just)। ভারতের সংবিধানে বিধিনিষেধ আরোপের ক্ষেত্রে ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও সামাজিক স্বার্থের মধ্যে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করা হয়েছে।

জোহারীর পর্যালোচনা : জোহারী (J. C. Johari) বিধিনিষেধের যুক্তিসঙ্গততা নির্ধারণের ক্ষেত্রে আদালত কর্তৃক অনুসৃত কতকগুলি সাধারণ নীতি উল্লেখ করেছেন। এ ক্ষেত্রে মামলার রায় পর্যালোচনা করে তিনি এই নীতিগুলির কথা বলেছেন। নীতিগুলি হল: (১) অধিকারের সীমা এবং আরোপিত নিয়ন্ত্রণের মধ্যে যথাযথ ভারসাম্য থাকবে (principle of proper balancing) [**দ্বারকা প্রসাদ লক্ষী নারায়ণ বনাম উত্তরপ্রদেশ রাজ্য (১৯৫৪)**]; (২) সাধারণ নাগরিকদের পরিপ্রেক্ষিতে বিধিনিষেধের উদ্দেশ্য ও বক্তব্যগত দিক বিচার করতে হবে (Principle of objectivity) [**হানিফ কুরেশী বনাম বিহার রাজ্য (১৯৫৯)**]; (৩) বিধিনিষেধ সামাজিক লক্ষ্যের প্রয়োজনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা তা দেখা দরকার । অর্থাৎ আরোপিত নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিনা দেখতে হবে; (৪) বিধিনিষেধের প্রকৃতি ছাড়াও তার প্রয়োগ-পদ্ধতি সম্পর্কে বিচার করতে হবে [**এন. বি. খারে বনাম দিল্লী রাজ্য (১৯৫০)**]; (৫) আদালত বিধিনিষেধ সম্পর্কিত আইনটি নয়, বিধিনিষেধটিরই যুক্তিসঙ্গততা বিচার করবে; (৬) রাষ্ট্রপরিচালনার ক্ষেত্রে নির্দেশমূলক নীতিগুলির পরিপ্রেক্ষিতেও বিধিনিষেধগুলি বিচার করতে হবে [**বোম্বাই রাজ্য বনাম এফ. এন. বালসারা (১৯৫১)**]; (৭) আদালতকে এও দেখতে হবে যে বিধিনিষেধটির দ্বারা সামগ্রিকভাবে ব্যক্তি-স্বাধীনতার কি পরিমাণ ক্ষতি হতে পারে।

সংবিধান সংশোধন ক্ষমতার ব্যবহার : এতদ্‌সত্ত্বেও স্বাধীনতার অধিকার নিরাপদ হয়নি। তাই সমালোচকরাও নিশ্চিন্ত হতে পারেন নি। আদালত অনেক ক্ষেত্রেই স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে বিচার করে কোন কোন আইনের বিধিনিষেধকে বাতিল বলে রায় দিয়েছে। কিন্তু আইন-বিভাগ আদালতের রায়কে অতিক্রম করার জন্য প্রয়োজনমত সংবিধান সংশোধন করেছে। এই ভাবে আদালতের রায়কে বহুক্ষেত্রে অতিক্রম করা হয়েছে।

উদাহরণ হিসাবে সংবিধানের প্রথম, চতুর্থ, ষোড়শ, চতুর্বিংশ, বিয়াল্লিশতম প্রভৃতি সংশোধনী আইন উল্লেখযোগ্য। প্রকৃত প্রস্তাবে ভারতীয় সংবিধানে ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও রাষ্ট্রের নিরাপত্তার মধ্যে দ্বিতীয়টিকেই অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কিন্তু রাষ্ট্রের নিরাপত্তার কথা ভেবে সরকারের হাতে অত্যধিক ক্ষমতা ন্যস্ত করা হয়েছে। তার ফলে স্বাধীনতার অধিকার বহুলাংশে সরকারের সদিচ্ছার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে।

জরুরী অবস্থার প্রভাব : স্বাধীনতার অধিকারের উপর জরুরী অবস্থার প্রতিকূল প্রভাব উল্লেখ করা দরকার। সংবিধানের ৩৫৮ ধারা অনুসারে জাতীয় জরুরী অবস্থার সময় রাষ্ট্রপতি একটি ঘোষণার দ্বারা ১৯ ধারায় স্বাধীনতার অধিকারের ভোগকে স্থগিত রাখতে পারেন। তখন স্বাধীনতার অধিকারের উপর কোন বিধিনিষেধ আরোপ করলে সে বিষয়ে যৌক্তিকতা বা বৈধতার প্রশ্ন তোলা যায় না। এ ব্যাপারে আদালতের তখন এক্তিয়ার থাকে না। অধিকারগুলি অবলবৎযোগ্য হয়ে পড়ে। আবার রাষ্ট্রপতি সংবিধানের ৩৫৯ ধারা-বলে জারি করা আদেশ অনুসারে সুপ্রিম কোর্ট বা হাইকোর্ট কর্তৃক অধিকার প্রয়োগের ক্ষমতাকে বাতিল করতে পারেন। ভারতে ১৯৬২, ১৯৭১ এবং ১৯৭৫ সালে জরুরী অবস্থায় এবং আভ্যন্তরীণ জরুরী অবস্থায় স্বাধীনতার অধিকারের উপর বিধিনিষেধ আরোপিত হয়েছে।

সংবিধানের ২০, ২১, ও ২২ ধারায় নাগরিকদের অন্যান্য স্বাধীনতা উল্লেখ করা হয়েছে।

দণ্ড নির্ধারণ ব্যাপারে স্বৈরী ক্ষমতা রদ : কোন অপরাধের জন্য নাগরিককে বিধিবহির্ভূত ও অতিরিক্ত শাস্তি যাতে সহ্য করতে না হয়, তার জন্য সংবিধানের ২০ ধারায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। কোন কাজের জন্য কোন ব্যক্তিকে অভিযুক্ত করা হলে, যে সময়ে ঐ কাজ সংঘটিত হয়েছে, এই সময়কার প্রচলিত আইন লঙ্ঘনের জন্য অপরাধ না হলে তাকে অপরাধী সাব্যস্ত করা যাবে না। অপরাধ যে সময়ে সংঘটিত হয়েছে, সেই সময়কার প্রচলিত আইন অনুযায়ী যে দণ্ড দেওয়া যেতে পারে, তার অধিক দণ্ড দেওয়া যাবে না। আবার পরবর্তী কালে আইন প্রণয়ন করে (ex-post facto legislation) আগে অনুষ্ঠিত কোন কাজকে দণ্ডনীয় **[Om Prakash *V.* State of Bombay(1955)]** বা অধিক মাত্রায় দণ্ডনীয় **[Kedarnath *V.* State of West Bengal (1953)]** করা যাবে না [২০ (১) ধারা]। অর্থাৎ বর্তমানে

প্রচলিত আইন অনুসারে যা নিষিদ্ধ নয়, তা আইনসঙ্গত। পরে আইন প্রণয়ন করে আগের কোন কাজকে দণ্ডনীয় করা যাবে না।

একই অপরাধের জন্য একাধিকবার শাস্তি দেওয়া যাবে না : একই অপরাধের জন্য কোন ব্যক্তিকে একাধিকবার অভিযুক্ত ও দণ্ডিত করা যাবে না (Provision against double jeopardy) [২০(২) ধারা]। ভারতীয় সংবিধান এ ক্ষেত্রে মার্কিন সংবিধানকে অনুসরণ করেছে। মার্কিন সংবিধানেও উল্লেখ আছে যে, একই অপরাধের জন্য কাউকে দ্বিতীয়বার বিপদের মুখে ঠেলে দেওয়া যাবে না। এক্ষেত্রে দণ্ড বলতে আদালত কর্তৃক প্রদত্ত দণ্ডাদেশের কথা বলা হয়েছে। অন্য কোন বিচারের ক্ষেত্রে এই বিধান প্রযোজ্য নয়। যেমন, কোন কোম্পানীর কর্মচারী তহবিল তছরূপের দায়ে আদালত কর্তৃক দণ্ডিত হল। ঐ কোম্পানী আবার শাস্তিপ্রাপ্ত ঐ কর্মচারীকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করতে পারে [**বেঙ্কটরমন বনাম ভারত সরকার** (১৯৫৪)]। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা দরকার যে, কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে যদি দুটি অপরাধের অভিযোগ থাকে, তা হলে প্রথম অপরাধের বিচার ও শাস্তির পর দ্বিতীয় অপরাধের বিচার ও শাস্তি হবে **[Leo Roy Frey *V.* Superintendent, District Jail (1958)]**।

ব্যক্তিকে নিজের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে বাধ্য করা যাবে না : কোন অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য (Self-incrimination) দিতে বাধ্য করা যাবে না [২০(৩) ধারা]। তাই নির্যাতনের ভয়ে পুলিশের কাছে প্রদত্ত সাক্ষ্য আদালতে গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয় না। অর্থাৎ কারও উপর শক্তি প্রয়োগ করে তার অপরাধ স্বীকার করানো যায় না। এই ব্যবস্থা সংবিধান বহির্ভূত। **এ. কে. গোপালন বনাম মাদ্রাজ রাজ্য** মামলায় (১৯৫০) সুপ্রীম কোর্ট ২০ ধারায় তাৎপর্য প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছে। বলা হয়েছে যে, এই ধারার মাধ্যমে অপরাধ নির্ধারণের ক্ষেত্রে আইনসভার ক্ষমতার উপর বাধানিষেধ আরোপ করা হয়েছে। নাগরিক অধিকারের স্বার্থে সংবিধানে এই অধিকারটির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। সংবিধানের ৪৪তম সংশোধনী আইন (১৯৭৮) বলা হয়েছে যে, জরুরী অবস্থার প্রাক্কালেও এই অধিকারটিকে স্থগিত রাখা যাবে না।

জীবন ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অধিকার (Right to Life and Personal Liberty) : ব্যক্তির জীবন ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অধিকার সংরক্ষণের জন্য ভারতীয় সংবিধানে দ্বিবিধ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে: (১) সংবিধানের ২১ ধারার ঘোষণা করা হয়েছে যে, আইনসঙ্গত পদ্ধতি ছাড়া কোন ব্যক্তিকে তার জীবন ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। (২) সংবিধানের ২২ ধারায় ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার ও আটকের বিরুদ্ধে কিছু অধিকার দেওয়া হয়েছে।

২১ ধারা : সংবিধানের ২১ ধারায় ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অধিকার সংরক্ষণের ক্ষেত্রে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে ব্রিটেনের ঐতিহাসিক মহাসনদ (Magna Carta)-এর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। আলোচ্য ধারাটি সংবিধানের হ্রস্বতম ধারাগুলির মধ্যে অন্যতম। অথচ এই ধারাটি প্রণয়নের প্রাক্কালে গণপরিষদের ভিতরে ও বাইরে ব্যাপকভাবে তর্কবিতর্ক হয়েছে। এবং এই বিতর্কের অবসান এখনও হয় নি। সংবিধানের ২১ ধারায় বলা হয়েছে যে, 'আইন-নির্দিষ্ট পদ্ধতি ছাড়া কোন ব্যক্তিকে তার জীবন ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করা যাবে না' ("No person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law.")। অর্থাৎ শাসন-বিভাগ বে-আইনীভাবে ব্যক্তির জীবন ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। তবে যথাবিহিত পদ্ধতিতে প্রণীত আইনের ভিত্তিতে শাসন-বিভাগ ব্যক্তির জীবন ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপে করতে পারবে **[Ram Narain *V.* State of Bombay (1953)]**। এই ধারার দুটি কথার অর্থ ও তাৎপর্য প্রসঙ্গে ব্যাপক মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। এই দুটি কথা হল: 'ব্যক্তিগত স্বাধীনতা' (Personal liberty) এবং 'আইন-নির্দিষ্ট পদ্ধতি' (procedure established by law)।

ব্যক্তিগত স্বাধীনতার ধারণা (Concept of Personal Liberty) : 'খসড়া কমিটি' (Drafting Committee)-র কাছে পেশ করা 'মৌলিক অধিকার সম্পর্কিত উপ-কমিটি' (Sub-Committee on Fundamental Rights) তার প্রতিবেদনে কেবল 'স্বাধীনতা' কথাটি উল্লেখ করেছিল। খসড়া কমিটি বি. এন. রাউ-এর পরামর্শক্রমে 'স্বাধীনতা' শব্দটির আগে 'ব্যক্তিগত' শব্দটি জুড়ে দেয়। ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলা হয় যে ১৯ ধারার স্বাধীনতার অধিকারগুলির সঙ্গে পার্থক্য প্রতিপন্ন করার জন্য 'ব্যক্তিগত' শব্দটি সংযুক্ত হয়েছে। তাছাড়া স্বাধীনতার অর্থ অতিমাত্রায় ব্যাপক। তুলনামূলক বিচারে 'ব্যক্তিগত স্বাধীনতা'র অর্থ সীমাবদ্ধ ও নির্দিষ্ট।

ব্যাপক অর্থে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা : 'ব্যক্তিগত স্বাধীনতা'র ধারণাটির অর্থ ও তাৎপর্য প্রসঙ্গে মতপার্থক্য আছে। কথাটি ব্যাপক ও সংকীর্ণ উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হয়। ব্যাপক অর্থে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অধিকার

বলতে আইনমান্যকারী প্রত্যেক নাগরিকের কোন রকম বিধিনিষেধ ছাড়া চিন্তার, মতপ্রকাশের ও চলাফেরার স্বাধীনতাকে বোঝায়। ডাইসি (A. V. Dicey) -র মতানুসারে 'ব্রিটিশ ধারণা অনুসারে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অধিকার বলতে আইনের সমর্থন ছাড়া গ্রেফতার, আটক বা অন্যান্য শারীরিক নিপীড়নের হাত থেকে অব্যাহতি বোঝায়'।

ভারতে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার ধারণা : ভারতের সংবিধানে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অধিকার ব্যাপক অর্থে গৃহীত হয় নি। এই অধিকার এখানে সংকীর্ণ ও নেতিবাচক অর্থে স্বীকৃত হয়েছে। সংকীর্ণ ও নেতিবাচক অর্থে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বলতে বোঝায় যে, বিধিসম্মত যুক্তি ছাড়া কোন ব্যক্তির উপর দৈহিক নির্যাতন চালান যায় না। ভারতের সুপ্রীম কোর্ট গোড়ার দিকে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অধিকারটিকে সংকীর্ণ অর্থে ব্যাখ্যা করেছে। সুপ্রীম কোর্টের মতানুসারে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অধিকার হল একটি নেতিবাচক ধারণা। বিচারপতি মুখার্জী **গোপালন বনাম মাদ্রাজ রাজ্য (১৯৫০)** মামলায় রায় দান প্রসঙ্গে বলেছেন যে, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা হল 'শারীরিক বাধানিষেধ বা বলপ্রয়োগের বিপরীত অবস্থা' ("It is the antithesis of physical restraint or coercion.")। এই মামলায় সুপ্রীম কোর্ট সংবিধানের ১৯(১) (ঘ) ধারা এবং ২১ ধারাটিকে পৃথকভাবে প্রয়োগের সিদ্ধান্ত জানায়। অর্থাৎ কোর্ট ভারতের সর্বত্র স্বাধীনভাবে গমনাগমনের অধিকারকে ব্যক্তি-স্বাধীনতার অধিকারের অন্তর্ভুক্ত না করার পক্ষে রায় দেয়। এই মামলায় সুপ্রীম কোর্টের মতানুসারে ১৯ ধারায় কতকগুলি বিশেষ স্বাধীনতা এবং সেগুলির উপর আংশিক বা যুক্তিসঙ্গত নিয়ন্ত্রণের (reasonable restriction) কথা বলা হয়েছে। এই ধারার অধিকারগুলি ২১ ধারার বিষয় হিসাবে বিবেচিত হবে না। কেবল ২১ ধারাতেই আছে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও তা ভোগ করা থেকে বঞ্চিত হওয়ার বিষয়। কিন্তু **খরক সিং বনাম উত্তরপ্রদেশ রাজ্য মামলায় (১৯৬৪)** সুপ্রীম কোর্ট ২১ ধারাকে ১৯ ধারার পরিপূরক বলে উল্লেখ করে। **সতওয়ান্ত সিং বনাম ডি. রামনাথম মামলায় (১৯৬৭)**-ও সুপ্রীম কোর্ট ব্যাপক অর্থে স্বাধীনতার অধিকারটিকে ব্যাখ্যা করেছে। তবে এ ক্ষেত্রে **মেনকা গান্ধী বনাম ভারতীয় ইউনিয়ন মামলাটি (১৯৭৮)** বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই মামলায় সুপ্রীম কোর্ট এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, ১৯ ধারার স্বাধীনতার অধিকারগুলির সঙ্গে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অধিকার সম্পর্ক রহিত নয়। একটি অপরটির সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত। আরও বলা হয় যে আদালত ব্যক্তিগত স্বাধীনতা হরণের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত আইন-নির্দিষ্ট পদ্ধতির যৌক্তিকতা বিচার করতে পারে।

আইন-নির্দিষ্ট পদ্ধতি (Procedure Established by Law) : সংবিধানের ২১ ধারা অনুসারে আইন-নির্দিষ্ট পদ্ধতি ছাড়া ব্যক্তিকে তার জীবন ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যায় না। এই ধারার 'আইন-নির্দিষ্ট পদ্ধতি' কথাগুলি গুরুত্বপূর্ণ। খসড়া কমিটি (Drafting Committee)-র কাছে পেশ করা 'মৌলিক অধিকার সম্পর্কিত উপ-কমিটি' (Sub-Committee on Fundamental Rights) তার প্রতিবেদনে 'আইনের যথাবিহিত পদ্ধতি' (Due Process of Law) কথাগুলি ব্যবহার করেছিল। মূলত বি. এন. রাউ-এর পরামর্শক্রমে খসড়া কমিটি ২১ ধারায় 'আইনের যথাবিহিত পদ্ধতি'-র পরিবর্তে 'আইন-নির্দিষ্ট পদ্ধতি' কথাগুলি ব্যবহার করে। এক্ষেত্রে জাপানের সংবিধানের ৩১ ধারার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, মার্কিন সংবিধানের পঞ্চম ও চতুর্দশ সংশোধন অনুসারে আইনের যথাবিহিত পদ্ধতি ছাড়া কাউকে তার স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করা যায় না। গণপরিষদে আল্লাদী কৃষ্ণস্বামী আয়ারের অভিমত অনুসারে আইনের যথাবিহিত পদ্ধতির অর্থ বিচারপতিদের ব্যাখ্যার উপর নির্ভরশীল। অপরদিকে আইন-নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে ব্যক্তির স্বাধীনতা রক্ষা এবং স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করার ক্ষমতা আইনসভাকে দেওয়া হয়েছে। তাই এই ব্যবস্থা অধিকতর গণতান্ত্রিক। তা ছাড়া 'যথাবিহিত পদ্ধতি'-র তুলনায় 'আইন-নির্দিষ্ট পদ্ধতি' অনেক সুনির্দিষ্ট। এ প্রসঙ্গে আরও বলা হয় যে, প্রথম পদ্ধতিতে বিচার-বিভাগীয় স্বৈরাচারের আশংকা থাকে। ভারতে ইংল্যাণ্ডের অনুকরণে সংসদীয় শাসনব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। তাই এখানে আইনের প্রাধান্য স্বীকার করা হয়েছে।

আইন-নির্দিষ্ট পদ্ধতি বলতে উপযুক্ত আইনসভা কর্তৃক বিধিসম্মতভাবে প্রণীত আইনের মাধ্যমে নির্ধারিত পদ্ধতিকে বোঝান হয়। এখানে আইন বলতে পার্লামেন্ট ও রাজ্য আইনসভা কর্তৃক প্রণীত আইনের কথা বলা হয়েছে। সংবিধান-নির্দিষ্ট এক্তিয়ারের মধ্যে থেকে আইনসভা আইন প্রণয়ন করতে পারে। ব্যক্তি-স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপের জন্য যে আইনটি ব্যবহৃত হবে তা উপযুক্ত আইনসভা কর্তৃক সংবিধানসম্মতভাবে প্রণীত হয়েছে কিনা আদালত তা বিচার করে দেখবে। অর্থাৎ ব্যক্তির স্বাধীনতার অধিকার আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠের হাতে ন্যস্ত হয়েছে। এ ক্ষেত্রে শাসন-বিভাগের বিচার-বিবেচনা প্রয়োগের কোন সুযোগ নেই। এইভাবে ভারতীয় সংবিধানে জীবন ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

'আইন-নির্দিষ্ট পদ্ধতি'র ব্যাখ্যা : সংবিধানে ২১ ধারা অনুসারে আদালত কেবলমাত্র দেখবে যে ব্যক্তির জীবন ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় আইন-নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে হস্তক্ষেপ করা হয়েছে কিনা। অর্থাৎ যে আইনের ভিত্তিতে ব্যক্তির স্বাধীনতার অধিকারকে ক্ষুণ্ণ করা হচ্ছে তা বৈধ আইনসভার দ্বারা বিধিসম্মতভাবে প্রণীত হয়েছে কিনা। এখানে স্বাভাবিক ন্যায়-নীতির (Principles of natural justice) প্রশ্ন ওঠে না। আদালত ন্যায়-নীতিবোধের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট আইনের গুণাগুণ বিচার করতে পারে না। ন্যায়বিচারের দিক থেকে আইনটি নিতান্তই অযৌক্তিক হলেও আদালতের বলার বা করার কিছু থাকে না। বৈধ আইনসভা কর্তৃক বিধিসম্মতভাবে প্রণীত আইনের মাধ্যমে জীবন ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা হরণের বিরুদ্ধে সংবিধানে কোন প্রতিকারের ব্যবস্থা নেই। এ ক্ষেত্রে আদালত বিচার-বিভাগীয় সমীক্ষার ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে না। সংবিধানের আলোচ্য ধারাটিতে কেবল শাসন-বিভাগের ক্ষমতার উপর বিধিনিষেধ আরোপিত হয়েছে, আইন-বিভাগের উপর নয়। ''সংবিধানের ২১ ধারা কেবল শাসন-বিভাগকেই নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। এই ধারা আইন-বিভাগীয় স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে কোন অধিকার সৃষ্টি করে না। কিন্তু মার্কিন সুপ্রীম কোর্ট 'আইনের যথাবিহিত পদ্ধতি'র পরিপ্রেক্ষিতে বিচারকার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট আইনটি বিধিসম্মতভাবে প্রণীত হয়েছে কিনা তা যেমন বিচার করে, সঙ্গে সঙ্গে এও বিচার করে দেখে যে আইনটি স্বাভাবিক ন্যায়-নীতিবোধের বিরোধী কিনা। আলোচ্য আইনটি ন্যায়সঙ্গত বা যুক্তিসঙ্গত বলে বিবেচিত না হলে মার্কিন সুপ্রীম কোর্ট তা বাতিল করে দিতে পারে।

সুপ্রীম কোর্টের সিদ্ধান্ত : সংবিধানের ২১ ধারা ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে ভারতের সুপ্রীম কোর্ট প্রথম দিকে সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে। পরবর্তীকালে অবশ্য কোর্ট বহুলাংশে প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছে। **এ. কে. গোপালন বনাম মাদ্রাজ রাজ্য মামলায়** (১৯৫০) সুপ্রীম কোর্ট এই অভিমত ব্যক্ত করেছে যে আদালত কেবলমাত্র দেখবে আইন-নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে জীবন বা ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা হয়েছে কিনা। আদালত সংশ্লিষ্ট আইনটির বা আইনানুসারে নির্ধারিত পদ্ধতির গুণাগুণ বা যৌক্তিকতা বিচার করতে পারে না। সংবিধানে আইন-বিভাগের উপর কিছু নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়েছে বটে, কিন্তু বিচার-বিভাগের প্রাধান্যের পরিবর্তে সংসদের সার্বভৌমিকতাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। **রামচন্দ্র প্রসাদ বনাম বিহার রাজ্য মামলায়** (১৯৬১) সুপ্রীম কোর্ট রায় দেয় যে পার্লামেন্ট ও রাজ্যের আইনসভা আইন প্রণয়নের মাধ্যমে ব্যক্তির জীবন ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করতে পারে। কিন্তু **মানেকা গান্ধী বনাম ভারতীয় ইউনিয়ন মামলায়** (১৯৭৮) সুপ্রীম কোর্ট ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে। এই মামলার রায়ে বলা হয় যে সংবিধানের ১৯ এবং ২১ ধারাকে একেবারে বিচ্ছিন্নভাবে বিচার করা যায় না। বলা হয় যে এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট আইনকে ২১ ধারার বিষয়ের সঙ্গে ১৯ ধারার শর্তও পূরণ করতে হবে। অর্থাৎ আদালত 'আইন-নির্দিষ্ট পদ্ধতি'র যৌক্তিকতা বিচার করতে পারে। বলা হয়েছে যে, এ ক্ষেত্রে 'আইন' ও 'আইন-নির্দিষ্ট' পদ্ধতিকে যুক্তিসঙ্গত হতে হবে। ব্যক্তির জীবন বা ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপের জন্য রাষ্ট্র স্বৈরাচারী বা অযৌক্তিক কোন পদ্ধতির আশ্রয় নিতে পারবে না।

৪৪-তম সংবিধান সংশোধনী আইনের প্রভাব : বর্তমানে সংবিধানের ২১ ধারার জীবন ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অধিকার বিশেষ মর্যাদায় মণ্ডিত। মূল সংবিধানের ৩৫৯ ধারা অনুসারে রাষ্ট্রপতি জরুরী অবস্থা জারি হওয়ার পর একটি বিশেষ ঘোষণা-বলে আদালত কর্তৃক তৃতীয় অধ্যায়ের সকল মৌলিক অধিকার বলবৎ করার ব্যবস্থা সাময়িকভাবে স্থগিত রাখতে পারেন। জরুরী অবস্থা ঘোষণার পর এ ধরনের আদেশের মাধ্যমে কয়েকবার জীবন ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অধিকারের বলবৎকরণ স্থগিত রাখা হয়েছে। কিন্তু ১৯৭৮ সালের ৪৪-তম সংবিধান সংশোধনী আইনে বলা হয় যে রাষ্ট্রপতি কোন অবস্থাতেই ২১ ধারার জীবন ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অধিকার স্থগিত রাখতে পারবেন না। তার ফলে আলোচ্য অধিকারটির তাৎপর্য ও গুরুত্ব বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং অধিকারটি অনেকাংশে নিরাপদ হয়েছে।

ব্যক্তিকে যথেচ্ছভাবে গ্রেপ্তার ও আটকের বিরুদ্ধে রক্ষা করা হয়েছে। আইন বা সরকারের আইনানুগ নির্দেশ অমান্য করলে রাষ্ট্র অমান্যকারীকে গ্রেপ্তার ও আটক করতে পারে। কিন্তু খেয়ালখুশিমত অবৈধভাবে এই ক্ষমতা ব্যবহৃত হলে স্বৈরাচারের সৃষ্টি হয় এবং ব্যক্তির স্বাধীনতা বিপন্ন হয়ে পড়ে। এই কারণে ২২ ধারায় স্বৈরী উপায়ে অবৈধ গ্রেপ্তার ও আটকের বিরুদ্ধে সংরক্ষণমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

আটক ব্যক্তিদের অধিকার : কোন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হলে সত্বর তাকে গ্রেপ্তারের কারণ জানাতে হবে। আটক ব্যক্তিকে তার পছন্দমত আইনজীবীর সঙ্গে পরামর্শ করার এবং আইনজীবীর দ্বারা আত্মপক্ষ সমর্থনের অধিকার দিতে হবে [২২(১) ধারা]। ধৃত ব্যক্তিকে গ্রেপ্তারের ২৪ঘন্টার মধ্যে নিকটতম ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাসে হাজির করতে হবে। এবং ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমতি ছাড়া ঐ সময়ের বেশী তাকে আটক রাখা যাবে

না। তবে গ্রেপ্তারের জায়গা থেকে নিকটতম ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে আসতে যে সময় লাগে তা ঐ ২৪ ঘন্টার মধ্যে ধরা হবে না [২২(২)ধারা]। সুপ্রীম কোর্টের সিদ্ধান্ত অনুসারে আটককারী কর্তৃপক্ষকে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে আটক ব্যক্তির আত্মীয় স্বজন বা বন্ধু বান্ধবকে আটক সম্পর্কে লিখিতভাবে অবহিত করতে হবে। সুপ্রীম কোর্টের সিদ্ধান্ত অনুসারে সকল গ্রেপ্তার ২২ এর (১) ও (২) নং অনুচ্ছেদের আওতায় আসে না। এ ক্ষেত্রে উদাহরণ হিসাবে আদালতের নির্দেশক্রমে গ্রেপ্তার, নাগরিক স্বার্থে গ্রেপ্তার, বা বিদেশীকে বহিষ্কারের নির্দেশের কথা বলা হয় [**উত্তর প্রদেশ রাজ্য বনাম আবদুল সামাদ (১৯৬২)**]। জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের নির্দেশ অনুসারে সূর্যাস্ত থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত কোন মহিলাকে গ্রেপ্তার করা যাবে না। তাছাড়া অন্য সময়েও কোন মহিলা অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করার ক্ষেত্রে মহিলা পুলিশ রাখতে হবে এবং সম্পূর্ণ স্বাধীনতা বজায় রাখতে হবে।

সাধারণভাবে সকল আটক ব্যক্তিই এই অধিকারগুলি ভোগ করবে। নাগরিক ও বিদেশী নির্বিশেষে সকলের ক্ষেত্রে এই অধিকার সমভাবে প্রযোজ্য হবে। তবে 'শত্রুভাবাপন্ন বিদেশী' (Enemy aliens) এবং 'নিবর্তনমূলক আটক' (Preventive Detention) আইনে আটক ব্যক্তির ক্ষেত্রে উপরিউক্ত অধিকারগুলি প্রযোজ্য হবে না [২২(৩) ধারা]।

নিবর্তনমূলক আটক আইন কাকে বলে? সংবিধানে সাধারণ আইনে আটক ও গ্রেপ্তারের সঙ্গে নিবর্তনমূলক আটক আইনে গ্রেপ্তার ও আটকের পার্থক্য করা হয়েছে। তাই নিবর্তনমূলক আটক আইন কাকে বলে, তা জানা দরকার। আইন অমান্য বা অপরাধ অনুষ্ঠানের জন্য কোন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার ও আটক করলে তাকে 'শাস্তিমূলক আটক' (Punitive Detention) বলে। কিন্তু আইন অমান্য বা অপরাধ করতে পারে এই আশঙ্কার ভিত্তিতে কোন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার ও আটক করা হলে সেই আটককে 'নিবর্তনমূলক আটক' (Preventive Detention) বলে। নিবর্তনমূলক আটক আইন হল একটি সতর্কতামূলক ব্যবস্থা। ভবিষ্যতে অপরাধ করতে পারে এই সন্দেহের বশেই কোন ব্যক্তিকে এই আইনে বিনা বিচারে আটক রাখা যায়। কোন ব্যক্তিকে আইনসঙ্গতভাবে অপরাধী প্রমাণ করা যাবে না, কিন্তু অপরাধ করতে পারে এই সন্দেহের বশে গ্রেপ্তার করার উদ্দেশেই নিবর্তনমূলক আটক আইন প্রয়োগ করা হয়। নিবর্তনমূলক আটক আইন হল বে-আইনী কাজে বাধা দেওয়ার নিমিত্ত একটি আইন; এই আইন বে-আইনি কাজের জন্য শাস্তি প্রদানের উদ্দেশে নয়। সুতরাং অপরাধ করেছে বলে নয়, ভবিষ্যতে অপরাধ করতে পারে এই সন্দেহের ভিত্তিতে কোন ব্যক্তিকে এই আইনের বিচারে আটক রাখা যায়। **শিবলাল বনাম উত্তরপ্রদেশ সরকার মামলায় (১৯৫৩)** সুপ্রীম কোর্টের সিদ্ধান্ত হল গ্রেপ্তার ও আটকের কারণ হিসাবে যে ঘটনার কথা বলা হয় আদালত তার সত্যতা বিচার করতে পারে না।

সংবিধান অনুসারে ভারতের পার্লামেন্ট এবং রাজ্য আইনসভাগুলি নিবর্তনমূলক আটক আইন প্রণয়ন করতে পারে। অঙ্গরাজ্যের নিরাপত্তা, জনশৃঙ্খলা, যাতায়াত ব্যবস্থা এবং অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যসামগ্রীর যোগান অব্যাহত রাখার জন্য কেন্দ্র ও রাজ্যের আইনসভা এই আইন প্রণয়ন করতে পারে। তবে পার্লামেন্ট প্রতিরক্ষা এবং পররাষ্ট্র সম্পর্কিত বিষয়েও এ ধরনের আইন তৈরী করতে পারে। এ ধরনের আইন প্রণয়নের ক্ষমতা যুগ্ম তালিকার অন্তর্ভুক্ত। এ রকম কোন ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় আইন ও রাজ্যের আইনের মধ্যে যদি অসামঞ্জস্য দেখা দেয়, তা হলে রাজ্যের আইনের অসামঞ্জস্যপূর্ণ অংশটি বাতিল বলে গণ্য হবে।

৪৪-তম সংশোধনী আইন ও নিবর্তনমূলক আটক: নিবর্তনমূলক আটক সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে সংবিধানের ২২(৪) থেকে ২২(৭) ধারার মধ্যে। ৪৪তম সংবিধান সংশোধনী আইনে (১৯৭৮) এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য কিছু পরিবর্তন করা হয়েছে। এই পরিবর্তনের আগে মূল সংবিধান অনুযায়ী কোন ব্যক্তিকে নিবর্তনমূলক আটক আইনে গ্রেপ্তার করে বিনা বিচারে তিন মাস পর্যন্ত আটকে রাখা যেত। তার বেশী আটক রাখতে গেলে একটি উপদেষ্টা পর্ষদ (Advisory Board)-এর অনুমতি দরকার হত। এই পর্ষদ হাইকোর্টের কর্মরত বা অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অথবা অনুরূপ যোগ্যতার অধিকারী একাধিক সদস্যকে নিয়ে গঠিত হত। ৪৪তম সংবিধান সংশোধনী আইন (১৯৭৮)-এ সংবিধানের ২২(৪) থেকে ২২ (৭) উপধারাগুলির কিছু পরিবর্তন করা হয়। এখন উপদেষ্টা পর্ষদের অনুমতি ছাড়া নিবর্তনমূলক আটক আইনে কোন ব্যক্তিকে ২ মাসের বেশী আটক রাখা যায় না। এই উপদেষ্টা পর্ষদ গঠিত হবে মোট তিনজন বিচারপতিকে নিয়ে। এঁদের মনোনীত করবেন সংশ্লিষ্ট রাজ্যের হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি। তবে এই পর্ষদের সভাপতি হবেন সংশ্লিষ্ট রাজ্য হাইকোর্টের একজন কার্যরত বিচারপতি। বাকি দু'জন যে-কোন হাইকোর্টের কার্যরত বা অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি হবেন। মূল সংবিধানের ২২(৭) (ক) ধারায় ৩ মাসের বেশী বিনা বিচারে আটক রাখার ব্যাপারে পার্লামেন্টের আইন প্রণয়নের ক্ষমতা ছিল।

এখন তা রদ করা হয়েছে। তার ফলে এ ক্ষেত্রে আইনসভার স্বৈরী ক্ষমতা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে এবং ব্যক্তি-স্বাধীনতা কিছু নিরাপদ হয়েছে।

নিবর্তনমূলক আটকের ক্ষেত্রে সাংবিধানিক নিয়ম : নিবর্তনমূলক আটকও যথেচ্ছভাবে করা যায় না। এ ক্ষেত্রেও সংবিধানে কতকগুলি নিয়মের উল্লেখ আছে। (১) সংবিধানসম্মতভাবে প্রণীত আইনের সমর্থন ছাড়া কোন ব্যক্তিকে আটক রাখা যায় না। (২) আটক ব্যক্তিকে যথাশীঘ্র সম্ভব গ্রেপ্তারের কারণ জানাতে হয়। একবার কারণ জানানোর পর সেগুলির পরিবর্তন করা বা নতুন কারণ যুক্ত করা যায় না [আত্মারাম বনাম বোম্বাই (মুম্বাই) রাজ্য (১৯৫১)]। তবে জনস্বার্থে কারণ প্রকাশ করা সঙ্গত মনে না করলে আটককারী কর্তৃপক্ষ আটকের কারণ নাও জানাতে পারে [২২(৬) ধারা]। (৩) আটক ব্যক্তিকে যথাশীঘ্র সম্ভব মুক্তির জন্য আদালতের কাছে আবেদন করতে দিতে হবে।

(১) 'পি.ডি. অ্যাক্ট' : ভারতের সংবিধান চালু হয়েছে ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারি। সেই বছরই প্রথম 'নিবর্তন-মূলক আটক আইন' (Preventive Detention Act, 1950) প্রণীত হয়। আইনটি প্রথমে মাত্র এক বছরের জন্য প্রণীত হয়েছিল। তারপর বেশ কয়েকবার আইনটির সংশোধন করা হয় এবং মেয়াদ বাড়ান হয়। এই আইনটি ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত বলবৎ ছিল।

(২) 'মিসা' : ১৯৭১ সালে আর একটি এ ধরনের আইন প্রণীত হয়। এই আইনটির নাম হল 'আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা রক্ষা আইন' (Maintenance of Internal Security Act (MISA)]। এই আইনটির সঙ্গে আগেকার আইনটির তেমন কোন মৌলিক পার্থক্য ছিল না। এই আইনটি একটি স্থায়ী আইন হিসাবে প্রণয়ন করা হয়েছিল। এই আইনে সর্বাধিক এক বছর আটক রাখার ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু জরুরী অবস্থা বলবৎ থাকাকালীন সময়ে উপদেষ্টা পর্ষদের অনুমতি ছাড়াই কোন ব্যক্তিকে ২১ মাস আটক রাখার ক্ষমতা সরকারকে দেওয়া হয়েছিল [এই আইনের ১৭ (ক) ধারা]। **শম্ভুনাথ সরকার বনাম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মামলায় (১৯৭৩)** সুপ্রীম কোর্ট রায় দেয় যে 'মিসা'-র ১৭ (ক) ধারা সংবিধানের ২২(৭) (ক) ধারার বিরোধী। পরবর্তীকালে অর্ডিনান্স জারি করে 'মিসা'-র অ-সাংবিধানিক অংশকে বাদ দেওয়া হয়।

(৩) 'কাফেপোসা' : 'মিসা'-র সঙ্গে সঙ্গে আর একটি নিবর্তনমূলক আটক আইন চালু করা হয়। বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ এবং চোরা চালান ও মজুতদারী প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে 'কাফেপোসা' [Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities (COFEPOSA)]।

(৪) 'নাসা' : ১৯৭৮ সালে জনতা আমলে 'মিসা' সমেত বিনা বিচারে আটক সম্পর্কিত সকল আইন প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। শ্রীমতী গান্ধীর সরকার ১৯৮০ সালে 'জাতীয় নিরাপত্তা আইন' [National Security Act, 1980 (NSA)] প্রণয়ন করে। এই আইন আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা রক্ষা আইনের রকমফের মাত্র। রাষ্ট্রপতি ১৯৮৪ সালে জাতীয় নিরাপত্তা আইন সংশোধন করে একটি অর্ডিন্যান্স জারি করেন। সংশোধনী অনুসারে এই আইনে বিনা বিচারে আটক রাখার মেয়াদ ১ বছর থেকে বাড়িয়ে ২ বছর করা হয়। আটকের কারণ জানানোর মেয়াদ জরুরী ক্ষেত্রে ৫ দিন থেকে বাড়িয়ে ১০ দিন করা হয়। তা ছাড়া বলা হয় যে উপদেষ্টা পর্ষদের মতামত ছাড়াই বিনা বিচারে ৬ মাস পর্যন্ত আটক রাখা যাবে। অর্ডিন্যান্সটি ঐ বছরই আইনে পরিণত হয়।

(৫) 'এসমা' : 'নাসা' ছাড়া ১৯৮১ সালে আর একটি এ ধরনের আইন প্রণয়ন করা হয়। এটি হল 'অত্যাবশ্যক সংস্থাসমূহে কাজকর্ম চালু রাখা আইন' [Essential Services Maintenance Act, 1981 (ESMA)]। এই আইন অনুসারে অত্যাবশ্যক সংস্থাসমূহে ধর্মঘট নিষিদ্ধ হয়েছে। তা ছাড়া ধর্মঘটে প্ররোচনাকারী হিসাবে সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের গ্রেপ্তারী পরোয়ানা ছাড়াই গ্রেপ্তার ও শাস্তি প্রদানের কথা বলা হয়েছে। এই আইনের একটি সংশোধনী পাস করা হয় ১৯৮৫ সালে। তদনুসারে 'এসমা'-কে আরও ৫ বছর বলবৎ রাখার ব্যবস্থা করা হয়। ১৯৯০ সালের ২২শে সেপ্টেম্বর এই আইনের মেয়াদ শেষ হয়ে যায়। চন্দ্রশেখর-সরকার এই আইনের মেয়াদ বৃদ্ধি না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

এরপরেও আরও এ জাতীয় চারটি আইন প্রণীত হয়েছে। (৬) 'কালোবাজারি প্রতিরোধ এবং অত্যাবশ্যকীয় পণ্য সামগ্রীর সরবরাহ অব্যাহত রাখা সম্পর্কিত আইন' (PBMSECA–Prevention of Blackmarketing and Maintenance of Supplies of Essentail Commodities Act)। এই আইনটি ১৯৮০ সালে প্রণীত হয়।

(৭) 'সন্ত্রাসবাদী ও ভাঙ্গনসৃষ্টিমূলক ক্রিয়াকর্ম প্রতিরোধ আইন' [TADA–Terrorist and Disruptive Activities (Prevention) Act]। এই আইনটি ১৯৮৫ সালে প্রণীত হয় এবং আইনটির মেয়াদ শেষ হয়ে যায় ১৯৯৫ সালে।

(৮) 'চেতনানাশক ওষুধ এবং মানসিক অয়নবৃত্ত সম্পর্কিত দ্রব্যসামগ্রীর অবৈধ ব্যবসা প্রতিরোধ সম্পর্কিত আইন' [PITNDPSA–Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act)। এই আইনটি ১৯৮৮ সালে প্রণীত হয়।

(৯) 'সন্ত্রাসবাদ প্রতিরোধ আইন' (POTA–Prevention of Terrorism Act)। এই আইনটি ২০০২ সালে প্রণীত হয়।

সমালোচনা : ভারতীয় সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত নিবর্তনমূলক আটক আইনের ব্যবস্থা ব্যাপকভাবে বিরূপ সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছে। বিভিন্ন দিক থেকে সংশ্লিষ্ট ব্যবস্থাদির সমালোচনা করা হয়।

(১) **অগণতান্ত্রিক ও ব্যক্তি-স্বাধীনতার বিরোধী :** সংবিধানে উল্লিখিত নিবর্তনমূলক আটক সম্পর্কিত বিধিব্যবস্থা নিঃসন্দেহে অগণতান্ত্রিক ও ব্যক্তি-স্বাধীনতার বিরোধী। পৃথিবীর অন্য কোন গণতান্ত্রিক দেশে স্বাভাবিক অবস্থায় এ ধরনের ক্ষমতার ব্যবহার বিরল। যুদ্ধকালীন অবস্থায় বিনা বিচারে আটক ও গ্রেপ্তারের ব্যবস্থা পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই দেখা যায়। কিন্তু স্বাভাবিক অবস্থায় ও শান্তির সময় একটি গণতান্ত্রিক দেশে এ ধরনের ক্ষমতার প্রয়োগ নজিরবিহীন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা ইংল্যাণ্ডে স্বাভাবিক অবস্থায় বিনা বিচারে আটক করার কোন ব্যবস্থা নেই। ব্রিটেনে কেবল প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এ রকম আইনের সাহায্য নেওয়া হয়েছে। ভারতে ব্রিটিশ শাসনের সময়ও নিবর্তনমূলক আটক সম্পর্কিত আইন ছিল। কিন্তু ভারতীয় সংবিধানে সকল অবস্থাতেই নিবর্তনমূলক আটক আইনের ব্যবস্থা আছে। এক্ষেত্রে উদাহরণ হিসাবে উল্লেখযোগ্য হল : 'The Bengal State Prisoners Regulations, 1818' এবং 'The Defence of India Act, 1939'।

(২) ভারতীয় সংবিধানের তৃতীয় অধ্যায়টি হল মৌলিক অধিকার সম্পর্কিত অধ্যায়। এই অধ্যায়ে বিনা বিচারে আটক সম্পর্কিত বিধিব্যবস্থার উল্লেখ বিস্ময়ের উদ্রেক করে। আবার দেশের নাগরিককে গ্রেপ্তার করার পর কেন তাকে গ্রেপ্তারের কারণ জানান যাবে না তাও কম বিস্ময়কর নয়।

(৩) **ক্ষমতাদির অপব্যবহারের আশংকা :** তা ছাড়া এই ক্ষমতাটির অপব্যবহারের আশংকাও আছে। কারণ এ ক্ষেত্রে আদালতের এক্তিয়ার নেই বললেই চলে। সামগ্রিক বিচারে নিবর্তনমূলক আটকের ক্ষেত্রে আদালতের ভূমিকা নিতান্তই সীমিত। এ বিষয়ে আইনসভা কর্তৃক প্রণীত আইনের সাংবিধানিকতাই কেবল আদালত বিচার করতে পারে। আদালত সংশ্লিষ্ট আইনের যৌক্তিকতা বিচার করতে পারে না। তাই এই ক্ষমতার অপব্যবহারের আশংকাকে অস্বীকার করা যায় না। প্রকৃত প্রস্তাবে নিবর্তনমূলক আটকের ক্ষেত্রে ব্যক্তি-স্বাধীনতা আইন-বিভাগ ও শাসন-বিভাগের সদিচ্ছার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে।

(৪) সমালোচকদের মতানুসারে ক্ষমতাসীন দল প্রতিশোধ স্পৃহা চরিতার্থ করার জন্য রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে এই ক্ষমতা ব্যবহার করতে পারে। কারণ এ ক্ষেত্রে সরকারী কর্তৃপক্ষের অনুমানই হল মুখ্য বিবেচ্য বিষয়। এই কারণে এই আইন স্বাভাবিক ন্যায়নীতির বিরোধী।

(৫) নিবর্তনমূলক আটক আইনের অনুশাসনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। বাস্তব বা রাজনৈতিক প্রয়োজনীয়তা সত্ত্বেও এ ধরনের আটকের ব্যবস্থা বাঞ্ছনীয় নয়।

(৬) **মহামান্য বিচারপতিদের অভিমত :** বিভিন্ন মামলায় রায় দানের প্রাক্কালে সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিরাও এই অগণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ব্যাপারে বিরূপ মন্তব্য করেছেন। এ. কে. গোপালন বনাম মাদ্রাজ রাজ্য মামলায় (১৯৫০) বিচারপতি ফজল আলি (Fazal Ali) বলেছেন: "In England it would shock one to be told that a man can be deprived of his personal liberty without a fair trial or hearing." একই মামলায় বিচারপতি পাতঞ্জলি শাস্ত্রী (Patanjali Shastri)-র অভিমত অনুসারে এ ধরনের আটকের ব্যবস্থা হল ব্যক্তি-স্বাধীনতার উপর প্রবল আক্রমণ (serious invasion on personal liberty) এবং শাসনতন্ত্রের ক্ষতিকারক বা অমঙ্গলজনক বৈশিষ্ট্য (sinister-looking feature)। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় মৌলিক অধিকারের স্বীকৃতির সঙ্গে সঙ্গে নিবর্তনমূলক আটকের ব্যবস্থা অসঙ্গতিপূর্ণ। গোপালন মামলায় বিচারপতি মহাজন (Mahajan) মন্তব্য করেছেন: "Preventive detention laws are repugnant to democratic constitutions and they cannot be found to exist in any of the democratic countries of the world."

(৭) স্বাভাবিক অবস্থায় আইন অমান্য বা অপরাধমূলক কাজকর্মের জন্য দোষী ব্যক্তির শাস্তি যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু কোন নাগরিক ভবিষ্যতে অপরাধ করতে পারে এই যুক্তি দেখিয়ে সরকারী কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট নাগরিককে গ্রেপ্তার ও আটক করলে তা হবে নিতান্তই ব্যক্তি-স্বাধীনতার বিরোধী।

নিবর্তনমূলক আটক আইনের পক্ষে যুক্তি : গণপরিষদে সংবিধানের খসড়া আলোচনার সময় উপরিউক্ত

বিরূপ সমালোচনাসমূহ উল্লিখিত হয়েছে। কিন্তু নিবর্তনমূলক আটক সম্পর্কিত সংবিধানের ব্যবস্থার পক্ষে নিম্নলিখিত যুক্তিসমূহের অবতারণা করা হয়।

(ক) সতর্কতামূলক ব্যবস্থা : সংবিধান প্রণয়নের প্রাক্কালে ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা এবং আইন-শৃঙ্খলার পরিস্থিতি অত্যন্ত খারাপ ছিল। বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিসমূহের তাণ্ডব ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামা স্বাভাবিক জীবনকে বিপন্ন করে তুলতে উদ্যোগী হয়েছিল। তখন নবজাত ভারতীয় সাধারণতন্ত্র, তার গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা এবং জাতীয় ঐক্য ও সংহতি বিপন্ন হয়ে পড়ার আশংকা দেখা দেয়। এই অবস্থায় নিবর্তনমূলক আটক আইনের মত কঠোর আইন অপরিহার্য হয়ে পড়ে। ভারতীয় গণতন্ত্রের বুনিয়াদকে সুদৃঢ় করার জন্য এবং দৃঢ়তার সঙ্গে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিসমূহের মোকাবিলা করার স্বার্থে নিবর্তনমূলক আটক হল এক সতর্কতামূলক ব্যবস্থা।

(খ) আম্বেদকরের অভিমত : সংবিধানের খসড়া কমিটির সভাপতি ড. আম্বেদকর এর অভিমত এ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তাঁর মতানুসারে আইনের সমর্থনই হল নিবর্তনমূলক আটকের শ্রেষ্ঠ রক্ষাকবচ। সংবিধানে শাসন-বিভাগকে বিনা বিচারে আটকের ক্ষমতা সরাসরি দেওয়া হয় নি। আইনসভা সম্মতি জানালে তবেই এই ক্ষমতা প্রয়োগ করা যায়। আইনসভা গঠিত হয় জনগণের প্রতিনিধিদের নিয়ে। সুতরাং জন প্রতিনিধিদের সিদ্ধান্তকে অগণতান্ত্রিক বলা যায় না। তা ছাড়া তাঁর আরও অভিমত হল যে, অনেক সময় দেশ ও দেশবাসীর বৃহত্তর স্বার্থে আটকের কারণ প্রকাশ না করার প্রয়োজন হতে পারে।

(গ) জোহারীর অভিমত : এ ক্ষেত্রে জোহারী (J. C. Johari)-র অভিমত উল্লেখযোগ্য। নিবর্তনমূলক আটক আইনে সরকারের হাতে প্রদত্ত ক্ষমতা এবং দীর্ঘকাল ধরে এই আইন প্রয়োগের পরিপ্রেক্ষিতে মনে হতে পারে যে এ দেশে ব্যক্তি-স্বাধীনতা বিশেষভাবে বিপন্ন। কিন্তু জোহারীর মতানুসারে যথেষ্ট সংযমের সঙ্গে সরকার এই ক্ষমতা প্রয়োগ করেছেন। তাঁর কথায়: "…..The government has tried to use it with caution." বহু ও বিভিন্ন প্ররোচনা সত্ত্বেও সরকার বিশেষ সহনশীলতার পরিচয় দিয়েছে। ১৯৭১ সালের বাংলাদেশ যুদ্ধ এবং পরবর্তী সময়ে জারি করা আভ্যন্তরীণ জরুরী অবস্থা সত্ত্বেও সরকার বেপরোয়াভাবে এই ক্ষমতা প্রয়োগ করে নি।

(ঘ) পাইলির অভিমত : ভারত একটি বিরাট দেশ। এর জনসংখ্যা বিপুল। এর আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি জটিল। তবুও বিনা-বিচারে আটক ব্যক্তির সংখ্যা কখনও খুব বেশী হয় নি। এই আইনের আয়ুষ্কালের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যক্তি-স্বাধীনতার পরিমাণ নির্ধারণ করা ঠিক হবে না। এম. ভি পাইলী (M. V. Pylee)-মতানুসারে এমন সময়ের কথাও বলা যায় যখন সমগ্র দেশে বিনা বিচারে আটক ব্যক্তির সংখ্যা এক ডজনও হয় নি অথচ আইনটি কার্যকর ছিল।

(ঙ) সাংবিধানিক নিয়ন্ত্রণ : সর্বোপরি এই আইনের ভিত্তিতে সরকার যাতে স্বৈরাচারী হয়ে পড়তে না পারে তার জন্য সংবিধানে প্রয়োজনীয় বিধিনিষেধের উল্লেখ আছে। ৪৪তম সংবিধান সংশোধনী আইন (১৯৭৮)-এর মাধ্যমে জরুরী অবস্থার সময়ও জীবন ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অধিকারকে নিরাপদ রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। তা ছাড়া এই সংবিধান সংশোধনী আইনের মাধ্যমে নিবর্তনমূলক আটক আইনের উপর আরও কিছু নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়েছে।

উপসংহার : নিবর্তনমূলক আটক আইনের সমর্থনে সংবিধানের তরফে অনেক কথাই বলা হয়। কিন্তু বিনা বিচারে আটক সম্পর্কিত এই আইন ভারতীয় গণতন্ত্রের কলঙ্কস্বরূপ। এ বিষয়ে দ্বিমতের অবকাশ থাকতে পারে না। পাইলী (Pylee) যথার্থই বলেছেন: "...whatever be the justification, so long as the Preventive Detention Act remains on the Statute Book there will also remain an unseemly spot on the fair face of democracy in India." পরিশেষে শ্রীদুর্গাদাস বসু (D. D. Basu)-র মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন: "In these circumstances, Art. 22 continues to be on the Constitution as necessary evil."

১৯, ২১ এবং ২২ নং অনুচ্ছেদের মধ্যে সম্পর্ক

এ. কে. গোপালন বনাম মাদ্রাজ রাজ্য (১৯৫০) মামলায় সুপ্রীমকোর্ট সংবিধানের ১৯ নং অনুচ্ছেদটিকে ২১ এবং ২২ নং অনুচ্ছেদ থেকে বিচ্ছিন্ন করে বিচার-বিবেচনা করেছে। এ বিষয়ে এই দৃষ্টিভঙ্গিই বেশকিছু দিন যাবৎ অব্যাহত ছিল। এ নিয়ে ক্ষেত্রবিশেষে ব্যতিক্রমী ও বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিরও সৃষ্টি হয়েছে। কালক্রমে বিচারবিভাগীয় সমীক্ষায় এই অনমনীয় অবস্থান কতকাংশে নমনীয় হয়। **R.C. Cooper Vs. Union of Inida (1970)** মামলায় ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের বিষয়টিকে নিয়ে সুপ্রীমকোর্টের পূর্ববর্তী অনড় অবস্থানের পরিবর্তন ঘটে। উল্লিখিত মামলাটিতে ৩১(২) নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রণীত একটি আইনের ক্ষেত্রে ১৯ (১)

(চ) [19 (1) (f)] অনুচ্ছেদটি প্রয়োগ করা হয়। এই পর্যায়ে সুপ্রীমকোর্ট ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অধিকার সংরক্ষণের থেকে সম্পত্তির অধিকার সংরক্ষণে অধিকতর ব্যগ্র বা উৎকণ্ঠিত ছিল। সম্পত্তির সুরক্ষার বিষয়টিকে দুর্বল করে দেওয়ার উদ্দেশে ৩১(২) নং অনুচ্ছেদটিকে প্রবলভাবে পরিবর্তন করা হয়। এরকম পরিস্থিতিতে সুপ্রীমকোর্ট ১৯(১) (চ) অনুচ্ছেদটির সঙ্গে ৩১ (২) নং অনুচ্ছেদের সংযোগ সম্পাদনের মাধ্যমে ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে কিছুটা সুরক্ষা প্রদানের ব্যাপারে সচেষ্ট হয়।

পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে এই যুক্তি সামনে আসে যে, ৩১(২) নং অনুচ্ছেদের সঙ্গে ১৯(১) (চ) নং অনুচ্ছেদের সংযোগ সম্পাদন সম্ভব হলে,২১ এবং ২২ নং অনুচ্ছেদের সঙ্গে ১৯ নং অনুচ্ছেদের সংযোগসাধন অসাধ্য হওয়ার কথা নয়। Sambhu Nath Sarkar Vs. State of W.B. (1973) মামলায় সুপ্রীমকোর্ট এই যুক্তিকে মান্যতা দেয়। বস্তুত ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ মামলায় সুপ্রীমকোর্ট এই অবস্থান গ্রহণ করে যে, গোপালন মামলায় সংখ্যাগরিষ্ঠের সিদ্ধান্তের মুখ্য সূত্র সঠিক ছিল না। **Bennett Coleman & Co. Vs. Union of India (1973)** মামলায়ও সুপ্রীমকোর্ট এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে যে, কোন আইন বাক্য ও মতামত প্রকাশের অধিকারের পরিপন্থী হলে, সেই আইনটির যুক্তিসঙ্গততা ১৯(২) নং অনুচ্ছেদের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার-বিবেচনার আওতায় আসে, যদিও সংশ্লিষ্ট আইনটি বাক্য ও মতামত প্রকাশের অধিকারকে নিয়ন্ত্রণ করার ব্যাপারে সরাসরি সংযুক্ত নয়।

West Bengal Vs. Ashok Dey (1972) মামলায় সুপ্রীমকোর্ট ১৯, ২১ এবং ২২ নং অনুচ্ছেদকে সংযুক্ত করতে সক্রিয় হয়। বলা হয় যে, পশ্চিমবঙ্গের নিবর্তনমূলক আটক আইন ১৯(১) (ঘ) [19(1)(d)] নং অনুচ্ছেদের পরিপ্রেক্ষিতে বৈধ। কারণ রাজ্যের বিদ্যমান আইন-শৃঙ্খলার বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিতে জনসাধারণের স্বার্থে আইনটি প্রণীত হয়েছিল।

মূল্যায়ন **(Evaluation) :** ভারতের সংবিধানে স্বাধীনতার অধিকারকে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক অধিকার হিসাবে স্বীকার করা হয়েছে এবং সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু সমালোচকরা স্বীকৃত অধিকারটি সম্পর্কে কিছু অভিযোগ উত্থাপন করেন।

(১) সংবিধানে নাগরিকদের স্বাধীনতার অধিকার স্বীকার করার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্বীকৃত অধিকারকে নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রকে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। ক্ষমতাসীন দলীয় সরকার রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে এই সাংবিধানিক নিয়ন্ত্রণমূলক ক্ষমতার অপব্যবহার করতে পারে। সে ক্ষেত্রে নাগরিকের স্বাধীনতার অধিকার ক্ষুণ্ণ হয়।

(২) বৈষম্যমূলক সমাজব্যবস্থায় সকলের পক্ষে স্বাধীনতার অধিকার ভোগ সম্ভব হয় না। বৈষম্যের বিলুপ্তি ব্যতিরেকে স্বাধীনতার অধিকারের সাফল্য সুদূরপরাহত। যদি রাষ্ট্রীয় কার্যকলাপ পক্ষপাতমূলক হয়, তা হলে নাগরিকের স্বাধীনতার অধিকার অর্থহীন হয়ে পড়বে। ভারতের ধনবৈষম্যমূলক সমাজব্যবস্থায় নাগরিকের স্বাধীনতার অধিকারের সম্পূর্ণ সাফল্য আশা করা যায় না।

(৩) বিনা বিচারে আটক রাখার নিমিত্ত নিবর্তনমূলক আটক আইন, জাতীয় নিরাপত্তা আইন প্রভৃতির অপব্যবহারের আশংকা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। সমালোচকদের মতানুসারে নিবর্তনমূলক আটক আইন হল অগণতান্ত্রিক এবং ব্যক্তি-স্বাধীনতার বিরোধী।

(৪) প্রকৃত প্রস্তাবে নিবর্তনমূলক আটক আইন হল দেশের সার্বভৌমিকতা, সংহতি ও নিরাপত্তার স্বার্থে একটি সতর্কতামূলক ব্যবস্থা। নাগরিকদের স্বাধীনতার অধিকারকে সফল ও সার্থক করার ক্ষেত্রে জনসাধারণ এবং রাজনৈতিক দলগুলির দায়িত্ব অনেক। নাগরিকদের স্বাধীনতার অধিকারের সাফল্যের স্বার্থে কতকগুলি বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এই বিষয়গুলি হল: জনগণের অধিকার-সচেতনতা, আইনের অনুশাসন, বিচার-বিভাগের স্বাধীনতা, দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থা প্রভৃতি।

উপসংহার **:** সমস্ত দিক বিচার-বিবেচনার পরও বলা দরকার যে, নিবর্তনমূলক আটক আইনে ব্যক্তিমানুষের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার উপর প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ ব্যাপক এবং এ ক্ষেত্রে বিচারবিভাগীয় সমীক্ষার অধিকার নিতান্তই সীমাবদ্ধ। কিন্তু ভারতে শাসনতান্ত্রিক নিয়মতান্ত্রিকতা বজায় রাখার স্বার্থে শাসনবিভাগীয় ক্ষমতা নিয়ন্ত্রিত হওয়া আবশ্যক। বিচারবিভাগ তার সমীক্ষার ক্ষমতার পরিধি প্রসারিত করার ব্যাপারে সচেতন ও সক্রিয়। এ কথা ঠিক। কিন্তু, এতদ্সত্ত্বেও, অদ্যাবধি সামগ্রিক বিচারে, এক্ষেত্রে বিচারবিভাগীয় সমীক্ষা প্রান্তীয় বা প্রান্তস্থ অবস্থায় অবস্থিত।

সাময়িক বিরামের কথা বাদ দিলে, স্বাধীন ভারতের সংবিধান প্রবর্তিত হওয়ার সময় থেকেই সব সময়েই বিনাবিচারে আটক রাখার আইন কার্যকর আছে। এ ধরনের আইন স্থায়ীভাবে প্রত্যাহৃত হওয়ারও আশু সম্ভাবনা পরিলক্ষিত হচ্ছে না। স্বভাবতই বিদ্যমান পরিস্থিতিতে এ রকম আইনের কঠোরতা হ্রাস ও আটক ব্যক্তির ন্যূনতম মানবাধিকার সংরক্ষণের স্বার্থে এবং শাসনতান্ত্রিক নিয়মতান্ত্রিকতা বজায় রাখার

উদ্দেশে সংবিধান বিশেষজ্ঞরা বিভিন্ন রক্ষাকবচ সুপারিশ করে থাকেন। এই সমস্ত সুপারিশের মূল উদ্দেশ্য হল নিবর্তনমূলক আটক আইনের অপব্যবহার এবং অতিব্যবহার আটকানো। সুষ্ঠুভাবে দেশের শাসনকার্য পরিচালনার স্বার্থে নিবর্তনমূলক আটক আইন অপরিহার্য বিবেচিত হলে, এর অপব্যবহার আটকানো আবশ্যক। এবং সেই লক্ষ্যে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার।

৬.৯ শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার (Right against Exploitation)

গণতন্ত্র ও শোষণ পরস্পর-বিরোধী। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় কোনরকম শোষণ থাকতে পারে না। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র সাম্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়। ভারতের রাষ্ট্রব্যবস্থা গণতান্ত্রিক। তা ছাড়া ভারতের সংবিধানের প্রস্তাবনায় সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ন্যায় প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করা হয়েছে। এই প্রতিশ্রুতিকে কার্যকর করার জন্য শোষণের অবসান আবশ্যক। কারণ শোষণমূলক সমাজব্যবস্থায় ন্যায় ও স্বাধীনতার অস্তিত্ব অসম্ভব। তাই ভারতের সংবিধানে শোষণের বিরুদ্ধে অধিকারকে গুরুত্ব সহকারে স্বীকার করা হয়েছে। ভারতীয় সংবিধানের ২৩ এবং ২৪ ধারায় শোষণের বিরুদ্ধে অধিকারের উল্লেখ আছে।

মানুষকে নিয়ে ব্যবসা বা বেগার খাটানো নিষিদ্ধ : সংবিধানের ২৩ ধারায় বল প্রয়োগের দ্বারা পরিশ্রম করানো, মানুষ ক্রয়-বিক্রয়, বেগার খাটানো বিশেষ দণ্ডনীয় অপরাধ হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে। দাসপ্রথা, স্ত্রীলোককে দিয়ে নীতিবিগর্হিত কাজ করানো, বিনা বেতনে কাজ করানো নিষিদ্ধ হয়েছে। অর্থনৈতিক কাজকর্মের জন্য বা অন্য কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নারী, শিশু প্রভৃতির কেনা-বেচা নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে [রাজবাহাদুর বনাম লিগাল রিমেমব্রানসার (১৯৫৩)]। পার্লামেন্ট 'Suppression of Traffic in Women and Girls Act, 1958' নামে একটি আইন পাস করেছে। প্রসঙ্গত মাদ্রাজ তামিলনাড়ু) সরকারের 'Madras Devadasi (Prevention of Dedication) Act 1947' আইনটিও এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। ভারতে প্রকৃত অর্থে দাসপ্রথা নেই। তবুও ভারতের অগণিত দীন-দরিদ্র ও অবহেলিত নীচু জাতের মানুষের সামাজিক অবস্থা দাসপ্রথার কথাই মনে করিয়ে দেয়। সামাজিক ক্ষেত্রে উচ্চবর্ণের ব্যক্তিবর্গের দ্বারা এই সমস্ত বঞ্চিত মানুষের শোষণের ঘটনা ভারতে অস্বীকার করা যায় না। এই অনগ্রসর ভারতবাসীদের দুরবস্থা দুরীকরণের জন্যই ২৩ ধারায় শোষণবিরোধী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

ব্যতিক্রম : সংবিধানের ২৩ ধারার নির্দেশ কেবল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে; রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে নয়। রাষ্ট্র জনগণের স্বার্থে বাধ্যতামূলকভাবে নাগরিকদের খাটিয়ে নিতে পারে [২৩(২) ধারা]। দেশের নিরাপত্তা বা প্রতিরক্ষার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র নাগরিকদের সামরিক কাজে বাধ্যতামূলকভাবে নিয়োগ করতে পারে। কিন্তু এরকম বাধ্যতামূলক কাজের ক্ষেত্রে রাষ্ট্র নাগরিকদের মধ্যে জাতি-ধর্ম-বর্ণ, ধনী-নির্ধন বিচারে কোনরকম বৈষম্যমূলক আচরণ করবে না।

বিপজ্জনক কাজে শিশুদের নিয়োগ নিষিদ্ধ : সংবিধানের ২৪ ধারা অনুসারে ১৪ বছরের কম বয়স্ক শিশুদের কারখানা, খনি, বা অন্য কোন বিপজ্জনক কাজে নিযুক্ত করা নিষিদ্ধ। এই অধিকারটি ভারতের নাগরিক এবং ভারতে বসবাসকারী বিদেশীরাও ভোগ করতে পারবে। এই মৌলিক অধিকারটিকে বাস্তবে কার্যকর করার জন্য পার্লামেন্ট ইতিমধ্যে কয়েকটি প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করেছে। উদাহরণ হিসাবে 'Factories Act, 1948', 'The Mines Act, 1952', এবং 'The Child Labour (Prohibition and Regulation) Bill, 1986' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

মূল্যায়ন (Evaluation) : ভারতীয় সংবিধানে উল্লিখিত শোষণের বিরুদ্ধে অধিকারটির মূল্যায়ন প্রসঙ্গে কতকগুলি অভিযোগকে অস্বীকার করা যায় না। শোষণ কথাটির সঠিক অর্থ স্পষ্ট করে ব্যাখ্যা করা হয় নি। ভারতে এই অধিকারটির ব্যঞ্জনা সীমাবদ্ধ। বস্তুতঃ ধনবৈষম্যমূলক সমাজব্যবস্থায় শোষণের অবসান অসম্ভব। অর্থনৈতিক অসাম্যেরই অপরিহার্য ফল হল শোষণ। সমাজব্যবস্থায় ধনবৈষম্যের অবসান এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সাম্য প্রতিষ্ঠিত না হলে সমাজ থেকে শোষণ নির্মূল করা যাবে না। তাই ভারতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে শিশু শ্রমিকের অভাব নেই, নারীকে দিয়ে অসাধু ব্যবসা ব্যাপকভাবে অব্যাহত এবং বেগার খাটানোর ঘটনা এখনও ঘটে।

মার্কসীয় মূল্যায়ন : মার্কসীয় ধারণা অনুসারে 'শোষণ' (Exploitation) কথাটি এক বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়। বলা হয় যে, মূল উৎপাদক হল শ্রমজীবী মানুষের দল। তারা উৎপাদনের উপাদানের মালিকদের দ্বারা শোষিত হয়। এ ক্ষেত্রে শোষণ বলতে বোঝায় অর্থনৈতিক শোষণ বা শ্রমের অন্যায্য মূল্য দান। ভারতীয় সংবিধানে শোষণের বিরুদ্ধে যে অধিকারের কথা বলা হয়েছে, সেখানে শোষণের এই অর্থনৈতিক ব্যঞ্জনাটি অনুপস্থিত। এখানে বেগার খাটানো নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু কোন মালিক স্বচ্ছন্দে

নামমাত্র মজুরি দিয়ে শ্রমিক-শোষণ কায়েম করতে পারে। এরকম শোষণের বিরুদ্ধে কোন প্রতিকার বা অধিকারের বন্দোবস্ত ভারতীয় সংবিধানে নেই।

৬.১০ ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার (Right to Freedom of Religion)

ভারতে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের পটভূমি : সকল ধর্মেই শান্তি, সম্প্রীতি ও সৌভ্রাতৃত্বের কথা বলা হয়। কিন্তু মানবজাতির ইতিহাসে ধর্মকে কেন্দ্র করে মর্মান্তিক সংঘাত-সংঘর্ষের ঘটনার অভাব নেই। ভারতের ইতিহাসেও এরকম বহু ঘটনা বর্তমান। ভারত ইতিহাসের বর্তমান শতাব্দীর সর্বাধিক দুর্ভাগ্যজনক ও কলঙ্কজনক ঘটনা হল দেশ-বিভাগের ঘটনা। ভারতের একদল মানুষের ধর্মীয় গোঁড়ামি ও সংকীর্ণতার দুর্ভাগ্যজনক পরিণতি হল ভারত বিভাগের ঘটনা। ধর্মের ভিত্তিতে এই দেশ বিভাগের ঘটনা এবং দেশের সংখ্যালঘু সমস্যা সম্পর্কে ভারতীয় সংবিধানের রচয়িতারা অত্যন্ত সতর্ক ছিলেন। দেশ বিভাগের পরেও সংখ্যালঘু সমস্যার সমাধান হয় নি। তারপরও দুটি বিশেষ ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সংঘাত-সংঘর্ষের সৃষ্টি হয়েছে। ভারতে বিভিন্ন ধর্মের উপস্থিতি এবং বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধের আশংকার কথা বিবেচনা করে সংবিধানে 'ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্র' (Secular State) প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের গৃহীত নীতিই হল ভারতে ধর্মনিরপেক্ষতার নীতির ভিত্তি। এ হল মহম্মদ আলি জিন্নার 'দ্বি-জাতি' তত্ত্বের যোগ্য জবাব। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মনে বিশ্বাস ও আস্থা সৃষ্টির জন্য ভারতে ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ স্বীকৃত হয়েছে।

সংকীর্ণ অর্থে ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ গৃহীত হয় নি : বর্তমানে ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনায় ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ ঘোষণা করা হয়েছে। বস্তুতঃ বরাবরই ভারত হল একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। এই ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ এই নয় যে, ভারত-রাষ্ট্র ধর্মবিরোধী বা এদেশে ধর্মের কোনও স্থান নেই। কামাথ (H.V. Kamath)-এর মতানুসারে 'ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলতে দেবতাহীন রাষ্ট্র, অধার্মিক রাষ্ট্র বা ধর্মবিরোধী রাষ্ট্রকে বোঝায় না।' তিনি বলেছেন: "To my mind, a secular state is neither a godless state nor an irreligious state nor an anti-religious state." রাধাকৃষ্ণণ (Radhakrishnan) তাঁর *Recovery of Faith* গ্রন্থে বলেছেন যে, ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলতে অধার্মিক, ধর্মবিরোধী বা ধর্মের ব্যাপারে উদাসীন রাষ্ট্রকে বোঝান হয় না। পশ্চিমী ধারণা অনুসারে বা সংকীর্ণ অর্থে ধর্মনিরপেক্ষতা বলতে ধর্মের সঙ্গে সম্পর্কহীনতা (absence of connection with religion) বা সাধারণ জীবনের গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে ধর্মকে পৃথক রাখা (to isolate religion from the more significant areas of common life) বোঝায়। লিও ফিফার (Leo Pfeffer)-এর মতানুসারে ধর্মনিরপেক্ষতার মূলকথা হল রাষ্ট্র থেকে গীর্জাকে পৃথক রাখা। কিন্তু ভারতে এমন সংকীর্ণ অর্থে ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ গ্রহণ করা হয় নি।

ব্যাপক ও ভারতীয় অর্থে ধর্মনিরপেক্ষতা : ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ এখানে এই যে, ভারত ধর্মের ব্যাপারে নিরপেক্ষ। এখানে কোন বিশেষ ধর্মকে রাষ্ট্রীয় ধর্মের মর্যাদা দেওয়া হয় নি। বলা হয় যে, ধর্ম মানুষের অন্তরের বিষয়। কিন্তু রাষ্ট্রের কাজ হল মানুষের সামাজিক ও রাজনৈতিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ। বিভিন্ন ব্যক্তি ও গোষ্ঠী তার নিজ নিজ বিবেক ও বিশ্বাস অনুসারে, তাদের স্বতন্ত্র অন্তরের আকুতি অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন ধর্মাচরণ করে। কিন্তু সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনে একই রাষ্ট্রের অন্তর্গত সকল মানুষেরই, সকল গোষ্ঠীরই একই ধরনের বাহ্যিক আচরণ প্রত্যাশিত। সুতরাং নাগরিকের সঙ্গে নাগরিকের, বা রাষ্ট্রের সঙ্গে নাগরিকের যে পারস্পরিক সম্পর্ক, সেখানে কোনরকম বৈষম্য না থাকাই বাঞ্ছনীয়। ধর্মের ক্ষেত্রে সাম্যের নীতিটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ধর্মীয় বিষয়ে রাষ্ট্রের দিক থেকে কোন বিশেষ আচরণ কাম্য নয়। আধুনিক গণতান্ত্রিক সমাজের অন্যতম প্রত্যয় হল ধর্মের ব্যাপারে রাষ্ট্রব্যবস্থায় নিরপেক্ষতা বজায় রাখা। এই কারণে বর্তমান রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তাজগতে ধর্মনিরপেক্ষতা একটি অপরিহার্য ও প্রগতিশীল নীতি হিসাবে স্বীকৃত। ধর্মনিরপেক্ষতা বজায় রাখার ক্ষেত্রে ভারতের সংবিধানে সযত্ন প্রচেষ্টা বর্তমান।

ভারতীয় অর্থে ধর্মনিরপেক্ষতার ব্যাখ্যা : ভারতীয় অর্থে ধর্মনিরপেক্ষতা বলতে ধর্মের সঙ্গে সম্পর্কহীনতা বা ধর্মবিরোধিতা বোঝায় না। বলা হয় যে রাষ্ট্র যাবতীয় ধর্মীয় গোঁড়ামী ও কার্যকলাপের সঙ্গে সম্পর্কহীন ও ধর্ম-বিষয়ে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থাকবে। ভেঙ্কটরমন (Venkataraman) বলেছেন: "The State is neither religious, nor irreligious, nor anti-religious, but it is wholly detached from religious dogmas and activities and thus neutral in religious matters." অর্থাৎ ভারতে রাষ্ট্রীয় ধর্ম বলে কিছু থাকবে না। রাষ্ট্র যে-কোন ধর্মের সংস্রব এড়িয়ে চলবে। কোন ধর্মীয় ব্যাপারে রাষ্ট্র ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগত ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার স্বীকার করবে এবং মানুষকে ধর্মীয় বিবেচনা ছাড়াই কেবল মানুষ হিসাবে গণ্য করবে। রাষ্ট্রের কাজকর্ম মানুষের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বিষয় নিয়ে, মানুষের ধর্ম

বা বিশ্বাসকে নিয়ে নয়। মানুষের ধর্ম বা বিশ্বাস সম্পর্কে রাষ্ট্রের কোন দায়দায়িত্ব নেই। ধর্মবিশ্বাস মানুষের সম্পূর্ণ নিজস্ব ও ব্যক্তিগত ব্যাপার। রাষ্ট্র বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে নিরপেক্ষতা বজায় রেখে চলবে। আম্বেদকর (Ambedkar)-এর মতানুসারে ধর্মনিরপেক্ষতার মূল অর্থ রাষ্ট্র জনগণের উপর কোন ধর্ম জোর করে চাপিয়ে দেবে না। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র গঠনের জন্য জনগণের ধর্মীয় স্বাধীনতার প্রয়োজন। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে সকলকেই সমানভাবে ধর্ম ও বিবেকের স্বাধীনতা দিতে হবে। পণ্ডিত নেহরু (Nehru) বলেছেন : "We call our state a secular one..... It means freedom of religion and conscience, including freedom for those who may have no religion."

জোহারীর পর্যালোচনা : জোহারী (J. C. Johari) ভারতীয় ধর্মনিরপেক্ষতার কতকগুলি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন। এই বৈশিষ্ট্যগুলি হল: (১) ভারতীয় ধর্মনিরপেক্ষতা প্রকৃতিগতভাবে অত্যন্ত উদার (liberal)। ধর্ম-বিষয়ে সকলের সমানাধিকারের সঙ্গে সঙ্গে এখানে সংখ্যালঘু ধর্মসম্প্রদায়গুলির জন্য কিছু বিশেষ অধিকার স্বীকার করা হয়েছে। শিখদের 'কৃপাণ ধারণের' এবং খ্রীস্টানদের 'ধর্মপ্রচারের' অধিকার দেওয়া হয়েছে। হিন্দুরা এখানে মোট জনসংখ্যার প্রায় আশি শতাংশ। কিন্তু হিন্দু-ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকেই কেবল সকলের জন্য উন্মুক্ত রাখার কথা বলা হয়েছে। (২) ভারতে ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণা বিশেষভাবে গতিশীল (dynamic)। রাষ্ট্র জনগণের বৃহত্তর কল্যাণের জন্য প্রয়োজনবোধে ধর্মীয় বিধিরীতি লঙ্ঘন করেও আইন তৈরি করতে পারে। (৩) ভারতে ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণাটি নিয়ন্ত্রিত (qualified)—অনিয়ন্ত্রিত নয়। কারণ কখনই ব্যক্তিগত আইন (personal law) রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের সম্পূর্ণ বাইরে থাকতে পারে না। রাষ্ট্র জনশৃঙ্খলা, সদাচার ও জনস্বাস্থ্যের স্বার্থে নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে পারে। (৪) ভারতে রাজনীতিকে ধর্মের নিয়ন্ত্রণমুক্ত রাখা হয়েছে। কিন্তু জনগণের কল্যাণের জন্য প্রয়োজনের তাগিদে ধর্মের উপর রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়েছে।

গণপরিষদে আলোচনার প্রাক্কালে ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শের প্রতি সংবিধান রচয়িতাদের বিশেষ আগ্রহ ব্যক্ত হয়েছে। অনন্তশায়নম আয়েঙ্গার (Ananthsayanam Ayyangar) বলেছেন: "We are pledged to make the state a secular one." জনগণের ধর্মীয় স্বাধীনতার স্বীকৃতি ছাড়া ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র গঠন করা যায় না। ভারতে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের মূল ভিত্তি হল সংবিধানে স্বীকৃত ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার।

ভারতীয় সংবিধানের ২৫ থেকে ২৮—এই চারটি ধারায় ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার সম্পর্কে উল্লেখ আছে।

ব্যক্তির ধর্মের স্বাধীনতা : সংবিধানের ২৫ ধারা অনুসারে সকল ব্যক্তিই সমানভাবে বিবেকের স্বাধীনতা অনুসারে ধর্মস্বীকার, ধর্মাচরণ এবং ধর্ম প্রচারের স্বাধীনতা ভোগ করবে। ব্যক্তি তার বিবেক অনুসারে ধর্মমত অবলম্বন করার অধিকার ছাড়াও ধর্মীয় অনুশাসন অনুসারে বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠান পালন করার এবং ধর্মীয় মতামত প্রচার করার অধিকারও ভোগ করবে [রতিলাল বনাম বোম্বাই রাজ্য সরকার (১৯৫৪)]। রাষ্ট্র সাধারণতঃ কোন ধর্মীয় বিষয়ে হস্তক্ষেপ করবে না। কিন্তু কোন বিশেষ আচার-অনুষ্ঠান নির্দিষ্ট কোন ধর্মের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ কিনা আদালত তা নির্ধারণ করতে পারবে [হানিফ কুরেশি বনাম বিহার রাজ্য (১৯৫৮)]।

ধর্মীয় স্বাধীনতা অবাধ নয় : এই অধিকারটি অবাধ বা নিরঙ্কুশ নয়। জনশৃঙ্খলা, সদাচার, জনস্বাস্থ্য ও অন্যান্য মৌলিক অধিকার সংরক্ষণের স্বার্থে রাষ্ট্র এই অধিকারটির উপর বিধিনিষেধ আরোপ করতে পারে। তা ছাড়া রাষ্ট্র ধর্মাচরণের সঙ্গে জড়িত যে-কোন অর্থনৈতিক, বৈত্তিক, রাজনৈতিক বা ধর্মনিরপেক্ষতা (secular) সম্পর্কিত কার্যকলাপকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে [২৫(২) (ক) ধারা]। আবার সামাজিক কল্যাণ, সামাজিক সংস্কারসাধন বা জনপ্রতিনিধিমূলক হিন্দু ধর্ম-প্রতিষ্ঠানগুলিতে সকল শ্রেণির হিন্দুদের প্রবেশাধিকারের জন্য রাষ্ট্র আইন প্রণয়ন করতে পারে [২৫(২) (খ) ধারা]। 'হিন্দু' বলতে শিখ, বৌদ্ধ এবং জৈন ধর্মাবলম্বীদেরও বোঝাবে। শিখ ধর্মের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে শিখগণ কৃপাণ ধারণ ও বহন করতে পারবে। সম্প্রতি এ বিষয়ে শিখদের অকালী গোষ্ঠী ভিন্ন দাবি ঘোষণা করেছে। ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকারের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপের ব্যবস্থাকে অযৌক্তিক বলা যায় না। কারণ কোন ব্যক্তি ধর্মীয় স্বাধীনতার নামে রাষ্ট্রের নিরাপত্তাকে বিপন্ন করতে পারে না। তেমনি আবার ধর্মীয় স্বাধীনতার নামে সতীদাহ, দেবদাসী প্রভৃতি কু-প্রথাকে মেনে নেওয়া যায় না। রাষ্ট্র সামাজিক কল্যাণ ও সামাজিক সংস্কার সাধনের জন্য ধর্মীয় স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করতে পারে।

ধর্মপ্রচারের অধিকার অত্যন্ত উদার : অন্য কোন দেশের সংবিধানে ধর্মপ্রচারের স্বাধীনতা স্বীকার করা হয় নি। পূর্বতন সোভিয়েত সংবিধানে ধর্মবিরোধী প্রচারের স্বাধীনতার কথা বলা ছিল। ভারতীয় গণপরিষদ এ ক্ষেত্রে অত্যন্ত উদারতার পরিচয় দিয়েছে। এই অধিকার ধর্মান্তরিতকরণের (conversion) কাজেও

লাগান যেতে পারে। সে ক্ষেত্রে জাতীয় স্বার্থের ক্ষতি হতে পারে। এ প্রসঙ্গে শ্রী কে. এম. মুন্সী (K.M. Munshi)-র অভিমত হল যে, খ্রীষ্টান ধর্মের মূল বৈশিষ্টাই হল ধর্মপ্রচার। তা ছাড়া ১৯ ধারার বাক্য ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতার মাধ্যমে ধর্ম প্রচারের অধিকার ভোগ করা যায়। সর্বোপরি ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার স্বীকার করলে ব্যক্তিকে স্বেচ্ছায় যে-কোন অন্য ধর্ম গ্রহণের অধিকার দেওয়া দরকার। তবে এক্ষেত্রে সমালোচকদের আশংকা অমূলক নয়। তার প্রমাণ হল বর্তমানে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে কোন কোন মিশনারী সম্প্রদায়ের কাজকর্মের উপর সরকারকে প্রয়োজনীয় নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে হয়েছে। সুপ্রীম কোর্টের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জোর করে ধর্মান্তরিতকরণকে ধর্মপ্রচার বলে না। কারণ তারফলে জনজীবনে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টির আশঙ্কা থাকে [**স্টেইনম্রস বনাম মধ্যপ্রদেশ রাজ্য (১৯৭৭)**]।

ধর্মীয় সম্প্রদায়ের অধিকার : বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়কেও কতকগুলো অধিকার দেওয়া হয়েছে। সংবিধানের ২৬ ধারা অনুসারে প্রত্যেক ধর্মীয় সম্প্রদায় বা গোষ্ঠী (ক) ধর্ম ও দানের উদ্দেশ্যে সংস্থা স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারবে; (খ) ধর্মীয় বিষয়ে নিজ নিজ কার্যাবলী পরিচালনা করতে পারবে; (গ) স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি অর্জন করতে ও মালিক হতে পারবে এবং (ঘ) আইন অনুসারে সেই সম্পত্তি পরিচালনা করতে পারবে। তবে জনশৃঙ্খলা, নৈতিকতা এবং জনস্বাস্থ্যের কারণে রাষ্ট্র ধর্মীয় সম্প্রদায়ের উপরিউক্ত অধিকারগুলি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। কোন ধর্মসম্প্রদায় 'তত্ত্বাবধানের' অধিকারের অজুহাতে কোন সভ্যকে একঘরে বা ধর্মসম্প্রদায় থেকে বহিষ্কার করতে পারে না [**তাহের বনাম তায়ে ভাই (১৯৫৩)**]।

বিশেষ ধর্মের উপর কর আরোপ নিষিদ্ধ : কোন বিশেষ ধর্ম বা ধর্মসম্প্রদায়ের প্রসার বা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কোন সম্প্রদায় বা ব্যক্তিকে কর দিতে বাধ্য করা যাবে না (২৭ ধারা)। এক্ষেত্রে উদাহরণ হিসাবে জিজিয়া করের কথা বলা যায়। মোগলযুগে হিন্দুদের এই কর দিতে বাধ্য করা হত। ধর্মবিষয়ে নিরপেক্ষতাকে নিশ্চিত করার জন্য বর্তমানে এই জাতীয় কর আরোপ নিষিদ্ধ হয়েছে। তা ছাড়া ২৭ ধারার আর একটি উদ্দেশ্য হল এক ধর্মসম্প্রদায়ের অত্যাচার থেকে অন্য সম্প্রদায়কে রক্ষা করা।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্ম শিক্ষা : শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে ধর্মশিক্ষা সম্পর্কে সংবিধানে কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। সংবিধানের ২৮ ধারায় এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় নিয়ম-নিষেধের উল্লেখ আছে। এ ক্ষেত্রে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলিকে তিনভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। (১) পুরোপুরি সরকারী অর্থে পরিচালিত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে ধর্মশিক্ষা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। অর্থাৎ সরকারী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে ধর্মশিক্ষা দান একেবারে নিষিদ্ধ। (২) কিন্তু সরকার কর্তৃক স্বীকৃত বা সরকারী অর্থে আংশিকভাবে পরিচালিত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে ধর্মশিক্ষা দান একেবারে নিষিদ্ধ হয় নি। তবে প্রাপ্তবয়স্ক শিক্ষার্থীদের নিজেদের এবং অপ্রাপ্তবয়স্ক শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে অভিভাবকের সম্মতি দরকার। (৩) সম্পূর্ণ বেসরকারী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে ধর্মশিক্ষা দান সম্পর্কে কোন বিধিনিষেধ আরোপ করা হয় নি। কোন দাতা বা অছি কর্তৃক ধর্মশিক্ষার উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রের দ্বারা পরিচালিত হলেও সেখানে বাধ্যতামূলক ধর্মশিক্ষা দেওয়া যাবে।

২৫ থেকে ২৮ ধারা ছাড়া সংবিধানের অন্যান্য অংশেও ধর্মীয় অধিকারের উল্লেখ আছে। প্রস্তাবনায় চিন্তা, বাক্য, বিশ্বাস, ধর্ম ও উপাসনার স্বাধীনতার কথা আছে। ১৪ ধারায় আইনের চক্ষে সকলের সমানাধিকারের কথা বলা হয়েছে। ১৫ ও ১৬ ধারায় কেবল ধর্মের ভিত্তিতে বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে শ্রেণিবিভাগ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ১৭ ধারায় অস্পৃশ্যতাকে অবলুপ্ত করা হয়েছে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থে বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণও এক্ষেত্রে উল্লেখ করা যায়। ২৯(২) ধারায় সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত বা সরকারের দ্বারা পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির ব্যাপারে এবং ৩২৫ ধারায় ভোটাধিকারের ক্ষেত্রে ধর্মের ভিত্তিতে বৈষম্য নিষিদ্ধ হয়েছে। ধর্মীয় বা সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা সংবিধানে বাতিল করা হয়েছে। ভারতীয় নাগরিকতা প্রদানের ক্ষেত্রেও ধর্মীয় বিচার-বিবেচনাকে সংবিধানে সম্পূর্ণ অস্বীকার করা হয়েছে।

মূল্যায়ন (Evaluation) : ভারতে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী বহু মানুষ বসবাস করে। সংবিধানে উল্লিখিত ব্যবস্থাদির মাধ্যমে নাগরিকদের ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকারকে কার্যকর করার চেষ্টা করা হয়েছে। পুণ্যভূমি ভারতে সকল ধর্মই সমান। বিভিন্ন ধর্ম ও ধর্মীয় গোষ্ঠীর মধ্যে সদ্ভাব ও সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য ভারতে ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ স্বীকার ও কার্যকর হয়েছে। রাষ্ট্রের ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্রের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপের জন্যই ১৯৭৬ সালে ৪২-তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে প্রস্তাবনায় 'ধর্মনিরপেক্ষ' শব্দটি যুক্ত করা হয়েছে। ভারতে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে প্রত্যেক নাগরিককে যে-কোন রাজনৈতিক পদে নির্বাচন করার এবং নির্বাচিত হওয়ার অধিকার দেওয়া হয়েছে। ভারতে ধর্মনিরপেক্ষতার সাফল্যের নজির হিসাবে সংখ্যালঘু মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে তিন বার ভারতের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের কথা উল্লেখ করা যায়। ধর্ম-নিরপেক্ষতার সাফল্যের এমন নজির পৃথিবীর অন্য কোন দেশে পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না।

মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের গৃহীত নীতিই হল ভারতে ধর্মনিরপেক্ষতার নীতির ভিত্তি। এ হল মহম্মদ আলি জিন্নার 'দ্বি-জাতি' তত্ত্বের যোগ্য জবাব। সংখ্যালঘুসম্প্রদায়ের মনে বিশ্বাস ও আস্থা সৃষ্টির জন্য ভারতে ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ স্বীকৃত হয়েছে।

অনেকে এই মর্মে অভিযোগ করেন যে, ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে সাম্প্রদায়িকতা, বিচ্ছিন্নতাবাদ, সংকীর্ণ প্রাদেশিকতা প্রভৃতির জন্য দায়ী হল ধর্মের ক্ষেত্রে ভারত রাষ্ট্রের অতি উদারতা। বিভিন্ন সম্প্রদায় বা গোষ্ঠী ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকারকে অন্যায়ভাবে অপব্যবহার করেছে। ধর্মের জিগির তুলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলির আন্দোলন প্রায় ক্ষেত্রেই সংকীর্ণতা দোষে দুষ্ট।

প্রকৃত প্রস্তাবে ধর্মনিরপেক্ষতা কেবল একটি তাত্ত্বিক বা আইনগত ধারণা নয়। নিছক সাংবিধানিক বা আইনগত ব্যবস্থাদির মাধ্যমে ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শের যথাযথ বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীর মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহনশীলতার মনোভাব বিশেষভাবে দরকার। তা ছাড়া দেশবাসীর মধ্যে ধর্মনিরপেক্ষতার মানসিকতা গড়ে তোলার জন্য প্রগতিমূলক সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলন আবশ্যক। এ ছাড়া শিক্ষাব্যবস্থা ও পাঠ্যসূচীর মাধ্যমেও ধর্মনিরপেক্ষ মানসিকতা সৃষ্টির ব্যাপারে উদ্যোগী হওয়া দরকার। তা না হলে ভারতের জটিল সমাজব্যবস্থায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখা সম্ভব হবে না। গত কয়েক বছরের বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা তার প্রমাণ।

৬.১১ সংস্কৃতি ও শিক্ষাগত অধিকার (Cultural and Educational Rights)

ভাষা, লিপি ও সংস্কৃতি সংরক্ষণের ব্যবস্থা : অধিকার সৃষ্টি ও সংরক্ষণের উদ্দেশ্য হল মানুষের ব্যক্তিত্বের বিকাশ। ব্যক্তিত্বের সুষ্ঠু বিকাশ ব্যতিরেকে সুনাগরিকের সৃষ্টি হয় না এবং সুনাগরিক ছাড়া গণতন্ত্র সফল হতে পারে না। এ দিক থেকে বিচার করলে সংস্কৃতি ও শিক্ষার অধিকার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সংবিধানের ২৯ এবং ৩০ ধারায় সংস্কৃতি ও শিক্ষাবিষয়ক অধিকার স্বীকার করা হয়েছে। ২০০২ সালের ১২ই ডিসেম্বর সম্পাদিত ৮৬তম সংবিধান সংশোধনী আইনের মাধ্যমে ২১(ক) ধারায় শিক্ষার অধিকারকে মৌলিক অধিকার হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

৬-১৪ বছরের ছেলে-মেয়েদের শিক্ষার অধিকার মৌলিক অধিকারের মর্যাদা পেয়েছে। শিক্ষার অধিকার আইনটি কার্যকর হয়েছে ২০১০ সালের ১লা এপ্রিল থেকে। এই আইন অনুযায়ী ৬-১৪ বছরের ছেলে-মেয়েদের অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক। বাচ্চাদের প্রশিক্ষণ দিয়ে বয়সের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ শ্রেণিতে ভর্তি করার কথা বলা হয়েছে। স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে বাচ্চাদের স্কুলে যাওয়া নিশ্চিত করতে হবে। স্কুল কোন বাচ্চাকে ভর্তি নিতে অস্বীকার করতে পারবে না। বেসরকারী স্কুলে দুঃস্থ শিশুদের জন্য ২৫ শতাংশ আসন সংরক্ষিত থাকবে। সরকারি স্কুলে বই-খাতা-কলম ও স্কুলের পোশাক বিনা মূল্যে দেওয়া হবে। প্রাথমিক স্কুল হতে হবে লোকবসতির এক কি.মি.-র মধ্যে। ৬ষ্ঠ থেকে ৮ম শ্রেণির পড়ুয়াদের জন্য স্কুল হতে হবে বাড়ির তিন কি.মি.-র মধ্যে, অন্যথায় নিখরচায় পরিবহন বা কাছাকাছি বসবাসের ব্যবস্থা করতে হবে। ইতিমধ্যে এই আইনের বিরুদ্ধে সুপ্রীমকোর্টে মামলা দায়ের হয়েছে।

নাগরিকদের সকল সম্প্রদায়কে নিজ নিজ ভাষা, সংস্কৃতি ও লিপি ব্যবহারের অধিকার দেওয়া হয়েছে। সম্পূর্ণভাবে সরকারী বা সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ধর্ম, মূলবংশ, বর্ণ, ভাষা, শ্রেণি-নির্বিশেষে প্রবেশাধিকার স্বীকৃত হয়েছে (২৯ ধারা)। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিবর্গ নিজেদের পছন্দমত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনা করতে পারবে। সরকার কর্তৃক আর্থিক সাহায্য প্রদানের ক্ষেত্রে এই সমস্ত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের প্রতি কোন রকম বৈষম্যমূলক আচরণ করা যাবে না (৩০ ধারা)। ১৯৯২ সালের অক্টোবর মাসে মোহিনী জৈন বনাম কর্ণাটক রাজ্য মামলায় রায়দান প্রসঙ্গে সুপ্রীম কোর্ট সংস্কৃতি ও শিক্ষাগত অধিকারের গুরুত্ব সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছে তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বলা হয়েছে যে, "Right to education is concomitant to fundamental rights."

মূল্যায়ন (Evaluation) : ভারত হল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। এখানে বহু ভাষা-ভাষী, ধর্মাবলম্বী ও জাতির মানুষ বসবাস করে। এদের প্রত্যেকের পৃথক স্বার্থ সংরক্ষণের দায়িত্ব ভারত-রাষ্ট্রের। সংস্কৃতি ও শিক্ষাবিষয়ক অধিকার প্রদানের মাধ্যমে ভারত-রাষ্ট্র এই দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করে। ভারতের বিভিন্ন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বতন্ত্র স্বার্থ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে সংবিধানে এই মৌলিক অধিকারটি সংযুক্ত হয়েছে।

সংস্কৃতি ও শিক্ষাগত অধিকার স্বীকার ও সংরক্ষণের মাধ্যমে ভারতীয় সংবিধানের রচয়িতারা অখণ্ড ভারতের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যগুলিকে অক্ষুণ্ণ রেখে পরিপুষ্ট করার ব্যবস্থা করেছেন।

আলোচ্য অধিকারটি স্বীকৃতির মাধ্যমে ভারতকে ধর্মনিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসাবে গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে। এই অধিকারটি সংখ্যালঘু গোষ্ঠীগুলির শিক্ষা-সংস্কৃতির বিকাশের সুযোগ ও সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছে।

আলোচ্য অধিকারটির ভিত্তিতে ভারতের কোন কোন অঞ্চলে বিচ্ছিন্নতার মনোভাব ও প্রাদেশিকতা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। ভাষাগত সংখ্যালঘু গোষ্ঠীগুলি জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী সংকীর্ণ আন্দোলনের শরিক হচ্ছে। এই প্রবণতা মারাত্মক।

৬.১২ সম্পত্তির অধিকারের পরিবর্তন ও বিবর্তন (Change and Evolution of the Right to Property)

সম্পত্তি অর্জন, ভোগ দখল ও হস্তান্তরকরণের অধিকার : ভারতের মূল সংবিধানে সম্পত্তির অধিকার অন্যতম মৌলিক অধিকার হিসাবে স্বীকৃত ছিল। ৪৪তম সংবিধান সংশোধনের (১৯৭৮) পর সম্পত্তির অধিকার মৌলিক অধিকারের মর্যাদা হারিয়েছে। ৪৪তম সংবিধান সংশোধনী আইনের মাধ্যমে সম্পত্তির অধিকারকে মৌলিক অধিকারের অধ্যায় থেকে এবং ১৯ ধারার মৌল স্বাধীনতার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। এখন সম্পত্তির অধিকার সাধারণ আইনগত অধিকার হিসাবে সংবিধানের দ্বাদশ অধ্যায়ে ৩০০(ক) ধারায় উল্লিখিত আছে। বলা হয়েছে যে, আইনের নির্দেশ ছাড়া কোন ব্যক্তিকে তার সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করা যাবে না ("No person shall be deprived of his property save by authority of law." Article 300A)। সম্পত্তির অধিকার এখন আইনসভা কর্তৃক প্রণীত সাধারণ আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিবর্তিত হবে।

ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশের ক্ষেত্রে অপরিহার্য অধিকারসমূহের মধ্যে সম্পত্তির অধিকারও হল একটি গুরুত্বপূর্ণ অধিকার। ভারতের মূল সংবিধানের তৃতীয় অধ্যায়ে মৌলিক অধিকার প্রদানের ক্ষেত্রে সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানার অধিকার স্বীকৃত হয়েছিল। ভারতের নাগরিক-অনাগরিক নির্বিশেষে সকলেই সমভাবে সম্পত্তির অধিকার ভোগ করতে পারে।

রাষ্ট্র জনস্বার্থে, আইনানুসারে ও ক্ষতিপূরণ দিয়ে ব্যক্তিগত সম্পত্তি দখল করতে পারে : সংবিধানের ১৯(১) (চ) ধারায় বলা ছিল যে প্রত্যেক নাগরিক উত্তরাধিকারসূত্রে, ব্যক্তিগত অর্জনের দ্বারা বা অন্য কোন আইনসঙ্গত উপায়ে সম্পত্তি অর্জন, ভোগ, দখল ও হস্তান্তর করতে পারবে। বিদেশীরাও এই অধিকার ভোগ করতে পারবে। কিন্তু তাদের ক্ষেত্রে এটি মৌলিক অধিকার হিসাবে গণ্য হবে না। তবে জনস্বার্থে বা তফসিলী উপজাতিদের স্বার্থরক্ষার জন্য রাষ্ট্র এই অধিকারের উপর সঙ্গত বিধিনিষেধ আরোপ করতে পারবে।

তিনটি উপায়ে ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে হস্তক্ষেপ : সংবিধানের ৩১ ধারা অনুসারে আইনের নির্দেশ ছাড়া কোন ব্যক্তিকে সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যায় না [৩১(১) ধারা]। জনস্বার্থে রাষ্ট্র ব্যক্তির সম্পত্তি দখল বা অধিগ্রহণ করতে চাইলে সংশ্লিষ্ট আইনে ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা থাকা দরকার। অর্থাৎ সংবিধানসম্মতভাবে সরকার সম্পত্তির অধিকারে হস্তক্ষেপ করতে পারে। তবে (ক) আইনের নির্দেশ থাকতে হবে, (খ) উদ্দেশ্য হবে জনসাধারণের কল্যাণসাধন এবং (গ) দখলী সম্পত্তির জন্য ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা থাকবে। সংবিধানের ৩১ (৩) ধারা অনুসারে কোন রাজ্যে আইনসভা যদি ব্যক্তিগত সম্পত্তি দখল বা গ্রহণের জন্য আইন প্রণয়ন করে তাহলে তা রাষ্ট্রপতির অনুমোদন ছাড়া কার্যকর হবে না (**বিশ্বেশ্বর রাও বনাম মধ্যপ্রদেশ সরকার**)। করধার্য, অর্থদণ্ড, জনস্বার্থের উন্নতিসাধন, জীবন ও সম্পত্তির সঙ্কট নিবারণ, কোন বৈদেশিক চুক্তির বাস্তবায়ন প্রভৃতির জন্য রাষ্ট্র ব্যক্তিগত সম্পত্তি ধ্বংস বা রাষ্ট্রায়ত্ত করলে ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে হবে না [৩১(৫) ধারা]।

সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে সম্পত্তির অধিকারের পরিবর্তন : সকল দেশেই রাষ্ট্র প্রয়োজনবোধে ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে হস্তক্ষেপ করে। প্রধানতঃ তিনটি উপায়ে রাষ্ট্র ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে হস্তক্ষেপ করে। উপায় তিনটি হল: (১) 'সর্বোপরি ক্ষমতা' (Eminent domain); (২) পুলিশী ক্ষমতা (Police power) এবং (৩) করধার্যের ক্ষমতা (Power of taxation)। সর্বোপরি ক্ষমতা বলতে সম্পত্তির মালিকের অনুমতি ছাড়াই জনস্বার্থে রাষ্ট্র কর্তৃক ব্যক্তিগত সম্পত্তি অধিকার বা দখল করার ক্ষমতাকে বোঝায়। এই ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে তিনটি শর্ত বর্তমান। শর্ত তিনটি হল: (ক) আইনের নির্দেশ, (খ) জনস্বার্থ ও (গ) ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। পুলিশী ক্ষমতা বলতে জনকল্যাণের জন্য ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের আইনগত ক্ষমতাকে বোঝায়। এই ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে রাষ্ট্র জনস্বাস্থ্যের উন্নতিবিধান, জীবন ও সম্পত্তির সঙ্কট নিবারণ প্রভৃতি উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কোন ব্যক্তিগত সম্পত্তি দখল বা ধ্বংস করলে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দরকার হয় না। রাষ্ট্র জনকল্যাণ ও উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা কার্যকর করার জন্য ব্যক্তিগত সম্পত্তির উপর কর আরোপ করে প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করে।

প্রথম সংশোধনী আইন : সম্পত্তির অধিকার সম্পর্কিত বিধানগুলি ভূমি-সংস্কার আইনকে কার্যকর করার ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করে। এই কারণে সরকার বাধ্য হয়ে সংশোধনের মাধ্যমে এই বাধাগুলি অপসারণের ব্যবস্থা করে। তার ফলে বিভিন্ন সংবিধান সংশোধনী আইনের ভিত্তিতে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার বিশেষভাবে পরিবর্তিত হয়। **কামেশ্বর বনাম বিহার রাজ্য সরকার** মামলার রায়ে সুপ্রীম কোর্ট জমিদারী উচ্ছেদ আইনের কতকগুলি ধারা বাতিল করে দেয়। সংশ্লিষ্ট রায়কে অতিক্রম করার জন্য ১৯৫১ সালে সংবিধানের প্রথম সংশোধন সম্পাদিত হয়। তার ফলে ৩১(ক) ও ৩১(খ) এই দু'টি ধারা সংবিধানে সংযুক্ত হয়। এর ফলে জমিদারীপ্রথা বিলোপ সম্পর্কিত আইনগুলির বৈধতা বিচারের ক্ষমতা আদালতের এক্তিয়ার বহির্ভূত হয়ে যায়।

চতুর্থ সংশোধনী আইন : ক্ষতিপূরণ প্রদান সম্পর্কিত বিধানগুলিও একাধিক সংবিধান সংশোধনী আইনের দ্বারা বিশেষভাবে পরিবর্তিত হয়। **বেলা বন্দ্যোপাধ্যায় বনাম পশ্চিমবঙ্গ সরকার** মামলায় পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ প্রদানের ব্যাপারে আদালত নির্দেশ দেয়। এই নির্দেশকে অতিক্রম করার জন্য সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী আইন (১৯৫৫) প্রণীত হয়। বলা হয় যে, আইন নির্দিষ্ট ক্ষতিপূরণ পর্যাপ্ত হয়েছে কিনা তার ভিত্তিতে সম্পত্তি দখল সম্পর্কিত কোন আইনকে আদালত বাতিল করতে পারবে না। রাষ্ট্র জনস্বার্থে নামমাত্র ক্ষতিপূরণ দিয়েও ব্যক্তিগত সম্পত্তি দখল করতে পারবে। **সুবোধগোপাল বনাম পশ্চিমবঙ্গ সরকার** মামলার রায়ের পর চতুর্থ সংশোধনী আইন ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারকে আরও সঙ্কুচিত করে। ৩২ (২-ক) এই নতুন ধারায় বলা হয় যে আইনানুসারে কোন ব্যক্তিকে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করা হলেও সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির মালিকানা স্বত্ব যদি রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত প্রতিষ্ঠানের কাছে হস্তান্তরিত না হয় তা হলে তা দখল বা অধিগ্রহণ বলে গণ্য হবে না এবং এক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণের প্রশ্ন উঠবে না।

সপ্তদশ সংশোধনী আইন : ১৯৬৪ সালে সংবিধানের সপ্তদশ সংশোধনী আইন পাস হয়। এই আইনে 'ভূ-সম্পত্তি' (Estate) শব্দটির নতুন সংজ্ঞা দেওয়া হয়। তা ছাড়া বিভিন্ন রাজ্য আইনসভা কর্তৃক অনুমোদিত ভূমি সংস্কারমূলক আইনগুলিকে আদালত যাতে নাকচ করতে না পারে, তার ব্যবস্থা করা হয়। স্থির করা হয় যে, ব্যক্তির নিজস্ব মালিকানাধীন আইনানুযায়ী নির্দিষ্ট ঊর্ধ্বসীমার অন্তর্ভুক্ত জমি রাষ্ট্র যদি দখল করে তা হলে দখলীকৃত উক্ত সম্পত্তির জন্য ক্ষতিপূরণ দিতে হবে এবং বাজার-দাম অনুসারেই এই ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

শঙ্করীপ্রসাদ মামলায় (১৯৬২) এবং **সজ্জন সিং মামলায়** (১৯৬৫) সুপ্রীম কোর্টের সিদ্ধান্ত অনুসারে সংবিধান সংশোধন করে সম্পত্তির অধিকারে হস্তক্ষেপ করার ক্ষমতা পার্লামেন্টের আছে। কিন্তু **গোলকনাথ এবং অন্যান্য বনাম পঞ্জাব রাজ্য সরকার মামলায়** (১৯৬৭) গরিষ্ঠসংখ্যক বিচারপতির রায়ে সিদ্ধান্ত হয় যে, পার্লামেন্ট সংবিধান সংশোধন করে কোন মৌলিক অধিকার খর্ব করতে পারে না।

এই অবস্থায় সরকারের প্রগতিশীল অর্থনৈতিক কার্যক্রম বাধাপ্রাপ্ত হয়। প্রয়োজনমাফিক সংবিধানের তৃতীয় অধ্যায়ের মৌলিক অধিকারে হস্তক্ষেপ করার অধিকার তখন পার্লামেন্টের আর থাকল না। ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার সম্পর্কিত বিধানগুলিও দুষ্পরিবর্তনীয় হয়ে পড়ল। এই অবস্থাকে অতিক্রম করার জন্য সংবিধানের ২৪, ২৫, ও ২৬তম সংশোধনী আইন ১৯৭১ সালে এবং ২৯তম সংশোধনী আইন ১৯৭২ সালে প্রণয়ন করা হয়।

২৫তম সংশোধনী আইন : ২৫তম সংবিধান সংশোধনী আইনে স্পষ্ট বলা হল যে, পার্লামেন্ট মৌলিক অধিকার সমেত সংবিধানের যে-কোন অংশ পরিবর্তন করতে পারে। ২৫তম সংশোধনী আইনের উদ্দেশ্য হল সংবিধানের চতুর্থ অধ্যায়ের রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে নির্দেশমূলক নীতিগুলিকে কার্যকর করার ক্ষেত্রে মৌলিক অধিকারগুলি বিশেষতঃ সম্পত্তির অধিকার যাতে বাধার সৃষ্টি না করে তার ব্যবস্থা করা। এই সংশোধনীর দ্বারা বিভ্রান্তিকর 'ক্ষতিপূরণ' শব্দটি বাদ দিয়ে 'অর্থ' শব্দটি সাধারণভাবে ব্যবহৃত হয়। বলা হয় যে, দখলীকৃত সম্পত্তির জন্য প্রদত্ত অর্থের পরিমাণের পরিপ্রেক্ষিতে বা ১৯(১-চ) ধারা লঙ্ঘিত হয়েছে এই যুক্তির ভিত্তিতে সম্পত্তি দখল সম্পর্কিত কোন আইন আদালত বাতিল করবে না। এই সংশোধন অনুসারে ৩১(গ) নামে একটি নতুন ধারা সংবিধানে সংযুক্ত হয়। এই ধারায় বলা হয় যে, ৩৯(খ) এবং ৩৯(গ) ধারার নির্দেশমূলক নীতি (যা সম্পদ ও উৎপাদনের উৎসগুলোর মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত)-কে কার্যকর করার জন্য কোন আইন পাস করা হলে তা সংবিধানের ১৪, ১৯, বা ৩১ ধারার কোন অধিকারকে লঙ্ঘন করেছে—এই যুক্তির ভিত্তিতে তার বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগ দায়ের করা যাবে না।

তারপর **কেশবানন্দ ভারতী মামলায়** (১৯৭২) সংবিধানের ২৪, ২৫, ২৬ ও ২৯-তম সংশোধনী আইনের সাংবিধানিক বৈধতার বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টে আবেদন করা হয়। সুপ্রীম কোর্টের ১৩ জন বিচারপতির

মধ্যে ৯ জন বিচারপতির রায়ের সিদ্ধান্ত হয় যে ২৪তম সংশোধনী আইন বৈধ। কিন্তু ২৫তম সংশোধনী আইনের প্রথম অংশ বৈধ হলেও আদালতের এক্তিয়ার বিরোধী দ্বিতীয় অংশের ৩১ (গ) ধারা অবৈধ।

৪২তম সংশোধনে (১৯৭৬) নির্দেশমূলক নীতিকে পুনরায় মৌলিক অধিকারের উপরে স্থান দেওয়া হয়। বলা হয় যে, নির্দেশমূলক নীতিগুলিকে কার্যকর করার জন্য প্রণীত কোন আইন ১৪, ১৯ ও ৩১ ধারার মৌলিক অধিকারকে লঙ্ঘন করলেও তা বলবৎ হবে। সুপ্রীম কোর্ট **মিনার্ভা মিলস বনাম ভারত সরকার** মামলার (১৯৮০) রায়ে এই সংশোধনীটি বাতিল করেছে।

সমাজতান্ত্রিক ও জনকল্যাণমূলক তত্ত্বের পরিপ্রেক্ষিতে এবং জনগণের বৃহত্তর স্বার্থে ব্যক্তিগত সম্পত্তির উপর রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ সমর্থনযোগ্য। সংবিধানের প্রস্তাবনায় ঘোষিত আদর্শ অনুসারে ভারত সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা গড়ে তুলতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ধনবৈষম্য হ্রাস করে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করাই হল এই ধরনের সমাজব্যবস্থার লক্ষ্য। ভারতীয় সংবিধানের সম্পত্তির অধিকার সম্পর্কিত ধারাগুলির পরিবর্তন পর্যালোচনা করলে প্রতিশ্রুত লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার প্রচেষ্টা অনুধাবন করা যায়।

৬.১৩ শাসনতান্ত্রিক প্রতিবিধানের অধিকার (Right to Constitutional Remedies)

শাসনতান্ত্রিক প্রতিকারের গুরুত্ব : সংবিধানে মৌলিক অধিকারের উল্লেখমাত্রই যথেষ্ট নয়। অধিকার প্রয়োগের সুব্যবস্থা থাকা দরকার। তা না হলে অধিকার নিছক ঘোষণার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকে যাবে এবং অর্থহীন হয়ে পড়বে। সংবিধানে যে সকল ব্যবস্থাদির সাহায্যে সম্ভাব্য অধিকারভঙ্গের বিরুদ্ধে প্রতিকারের ব্যবস্থা করা যায় তাকে শাসনতান্ত্রিক প্রতিবিধানের অধিকার বলে।

অধিকারভঙ্গের বিরুদ্ধে শাসনতান্ত্রিক প্রতিকারের ব্যবস্থা না থাকলে অধিকারগুলি মূল্যহীন হয়ে পড়ে। তাই মৌলিক অধিকারের উল্লেখের সঙ্গে সঙ্গে সকল দেশের সংবিধানেই অধিকার সংরক্ষণের বিভিন্ন ব্যবস্থা লিপিবদ্ধ হতে দেখা যায়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইংল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে সাধারণ আইনের দ্বারা এই অধিকার নিয়ন্ত্রিত হয়। কিন্তু ভারতে একে একটি পৃথক এবং গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক অধিকার হিসাবে স্বীকার করা হয়েছে। সংবিধানের তৃতীয় অধ্যায়ে উল্লিখিত বিভিন্ন মৌলিক অধিকারের মধ্যে শাসনতান্ত্রিক প্রতিবিধানের অধিকারের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। সংবিধানের তৃতীয় অধ্যায়ে বিভিন্ন মৌলিক অধিকার ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে অধিকারভঙ্গের বিরুদ্ধে শাসনতান্ত্রিক প্রতিকারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে সংবিধানের যে-সমস্ত বিধিব্যবস্থা আছে সেগুলিকে শাসনতান্ত্রিক প্রতিবিধানের অধিকার বলে। অর্থাৎ মৌলিক অধিকার সংরক্ষণের এই ব্যবস্থাগুলিও নাগরিকদের মৌলিক অধিকার হিসাবে গণ্য হয়।

ভারতীয় সংবিধানের ৩২ থেকে ৩৫ ধারায় আদালতকে মৌলিক অধিকার প্রয়োগ সংক্রান্ত ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। ৩২ ধারায় ৪টি অংশ আছে।

(১) মৌলিক অধিকার বলবৎ করার জন্য নাগরিকগণ সুপ্রীম কোর্টের কাছে আবেদন করতে পারে [৩২ (১) ধারা]।

(২) ঐ অধিকারগুলি বলবৎ করার জন্য সুপ্রীম কোর্ট পাঁচ ধরনের আদেশ, নির্দেশ বা লেখ (writs) জারি করতে পারে। এই লেখগুলি হল: 'বন্দী প্রত্যক্ষীকরণ' (Habeas corpus), 'পরমাদেশ (Mandamus), 'প্রতিষেধ' (Prohibition), 'অধিকার পৃচ্ছা' (Quo-warranto) এবং 'উৎপ্রেষণ' (Certiorari) [৩২(২) ধারা]। সংবিধানের ২২৬ ধারা অনুসারে হাইকোর্টগুলিও সংবিধানের তৃতীয় অধ্যায়ের মৌলিক অধিকারগুলি বলবৎ করার জন্য এসব 'লেখ' জারি করতে পারে। সুপ্রীম কোর্ট সংবিধানের ৩২ ধারা অনুসারে কেবল মৌলিক অধিকার সংরক্ষণের স্বার্থে 'লেখ' জারি করতে পারে **[অমর শিংজী বনাম রাজস্থান রাজ্য (১৯৫৫)]**। কিন্তু সংবিধানের ২২৬ ধারা অনুসারে হাইকোর্ট মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ সমেত 'অন্যান্য প্রয়োজনে'ও 'লেখ' জারি করতে পারে। যেমন, সংবিধানের ২৮৬ ধারার বিধিনিষেধ অগ্রাহ্য করে কোন রাজ্য বিক্রয়কর ধার্য করলে তার বিরুদ্ধে রাজ্য-হাইকোর্ট 'লেখ জারি' করতে পারে **[বোম্বাই (মুম্বাই) রাজ্য বনাম ইউনাইটেড মোটরস (১৯৫৩)]**। সংবিধানের ৪২তম সংশোধনের (১৯৭৬) মাধ্যমে অন্যান্য প্রয়োজনে হাইকোর্টের লেখ জারির ক্ষমতা প্রত্যাহার করা হয়। তবে ৪৪তম সংশোধনে (১৯৭৮) এই বাড়তি ক্ষমতাটি পুনরায় হাইকোর্টকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। এ প্রসঙ্গে শ্রীদুর্গাদাস বসু বলেছেন: "In a sense, the power of the High Courts to issue these writs is wider than that of the Supreme Court." তবে ভৌগোলিক এক্তিয়ারগত বিচারে যে-কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের উপর সুপ্রীম কোর্ট 'লেখ' জারি করতে পারে। কিন্তু হাইকোর্টগুলি নির্দিষ্ট রাজ্য বা রাজ্যগুলির ক্ষেত্রেই 'লেখ' জারির ক্ষমতা ভোগ করে।

(৩) পার্লামেন্ট আইন প্রণয়ন করে অন্য কোন আদালতকেও নিজ এক্তিয়ারের মধ্যে এই সমস্ত লেখ জারি করার ক্ষমতা প্রদান করতে পারে [৩২ (৩) ধারা]। কিন্তু পার্লামেন্ট আজ অবধি এমন কোন আইন প্রণয়ন করে নি।

(৪) কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে এই অধিকারটি স্থগিত থাকলে তাও ৩২ ধারায় উল্লেখ করা হয়েছে। তার বাইরে অধিকার প্রয়োগের এই ক্ষমতাকে বাতিল করা যাবে না। [৩২(৪) ধারা]।

সংবিধানের ৩২ ধারায় তৃতীয় অধ্যায়ে উল্লিখিত মৌলিক অধিকারগুলি বলবৎ করার ব্যাপারে নিশ্চয়তার সৃষ্টি করা হয়েছে। শ্রীদুর্গাদাস বসু বলেছেন: "Article 32 is thus the cornerstone of the entire edifice set up by the Constitution." ৩২ ধারার প্রথম তিনটি অংশে উল্লিখিত ব্যবস্থাদি এ দেশে মৌলিক অধিকার ভোগ ও বলবৎকরণের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। আলোচ্য অধিকারের সাহায্যে কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার এবং স্বায়ত্তশাসনমূলক স্থানীয় সংস্থার অবৈধ হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে মৌলিক অধিকারসমূহ সংরক্ষণ করা যায়।

সংবিধানের ১৩ ধারাতেও মৌলিক অধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে প্রতিবিধানের ব্যবস্থা আছে। এই ধারায় আইন-বিভাগের অবৈধ হস্তক্ষেপ থেকে নাগরিক অধিকারগুলিকে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই ধারা অনুসারে কোন আইন যদি মৌলিক অধিকারের সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, তা হলে সংশ্লিষ্ট আইনের সেই অসামঞ্জস্যপূর্ণ অংশটি বাতিল বলে গণ্য হবে। 'আইন' বলতে এখানে আইনসভা কর্তৃক প্রণীত আইন সমেত উপ-আইন (bye-law), আদেশ (Order), অর্ডিন্যান্স, প্রচলিত প্রথা (custom), রীতিনীতি, (usage), নিয়মকানুন প্রভৃতি যা আইন হিসাবে বিবেচিত হতে পারে, এমন সব কিছুকেই বোঝাবে। কোন আইন মৌলিক অধিকারের বিরোধী কিনা আদালত তা বিচার করে দেখতে পারে [**এ. কে. গোপালন বনাম মাদ্রাজ রাজ্য** (১৯৫০)]।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা দরকার যে, জরুরী অবস্থা বলবৎ থাকাকালীন সময় ছাড়া অন্য কোন সময় শাসনতান্ত্রিক প্রতিবিধানের অধিকারকে ক্ষুণ্ণ করা যায় না। ৪৪তম সংবিধান সংশোধনী আইন (১৯৭৮) পাস হওয়ার পর জরুরী অবস্থাতেও রাষ্ট্রপতি কর্তৃক জারি করা আদেশের মাধ্যমে সংবিধানের ২০ ও ২১ ধারার জীবন ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অধিকারকে ক্ষুণ্ণ করা যায় না [৩৫৯ (১) ধারা]।

নাগরিকগণ মৌলিক অধিকার বলবৎ করার জন্য সংবিধানের ৩২ ধারা অনুসারে সুপ্রীম কোর্টের কাছে এবং ২২৬ ধারা অনুসারে হাইকোর্টের কাছে আবেদন করতে পারে। সুপ্রীম কোর্ট ও হাইকোর্ট অধিকারগুলি বলবৎ করার জন্য ইঙ্গ-মার্কিন শাসনব্যবস্থার অনুকরণে পাঁচ ধরনের 'লেখ' (Writ) জারি করতে পারে। 'লেখ' বলতে আদেশ, নির্দেশ বা পরোয়ানা বোঝায়। এই লেখগুলি হল: (১) বন্দী প্রত্যক্ষীকরণ (Habeas Corpus), (২) পরমাদেশ (Mandamus), (৩) প্রতিষেধ (Prohibition) (৪) অধিকার-পৃচ্ছা (Quo-warranto) এবং (৫) উৎপ্রেষণ (Certiorari)। 'লেখ'গুলি সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করা দরকার।

(১) বন্দী প্রত্যক্ষীকরণ (Habeas Corpus) : 'হ্যাবিয়াস করপাস' একটি ল্যাটিন শব্দ। এর ইংরাজী অর্থ হল 'Have the body present' অর্থাৎ সশরীরে হাজির করা। এই আদেশ- বলে আদালত আটককারী কর্তৃপক্ষকে আটক ব্যক্তিকে আদালতে হাজির করার নির্দেশ দেয়। আটক বিধিসম্মত না হলে আদালত আটক ব্যক্তিকে মুক্তি দেওয়ার নির্দেশ দেয়। বন্দী প্রত্যক্ষীকরণের উদ্দেশ্য হল বে-আইনীভাবে বা বৈধ কারণ ছাড়া আটক করা ব্যক্তিকে মুক্তি দেওয়া । এর দ্বারা অন্যায়কারীর কোন শাস্তির ব্যবস্থা করা যায় না।

আটককারী ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষের উপর এই 'লেখ' জারি করা হয়। সুপ্রীম কোর্ট ও হাইকোর্ট এই 'লেখ' জারি করতে পারে। সুপ্রীম কোর্ট একমাত্র রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে এই 'লেখ' জারি করতে পারে [**বিদ্যা ভার্মা বনাম শিব নারায়ণ** (১৯৪৬)]। কিন্তু হাইকোর্ট রাষ্ট্র ও ব্যক্তি উভয়ের বিরুদ্ধেই 'বন্দী-প্রত্যক্ষীকরণ' জারি করতে পারে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা দরকার যে কয়েকটি ক্ষেত্রে 'বন্দী প্রত্যক্ষীকরণ' জারি করা যায় না। সুপ্রীম কোর্ট ও হাইকোর্ট উভয়ের ক্ষেত্রেই এ কথা প্রযোজ্য। (১) আদালতের এক্তিয়ারের বাইরে যদি কোন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়, তা হলে এই 'লেখ' জারি করা যায় না। (২) ফৌজদারী অপরাধের কারণে আদালতের বিচারে কোন ব্যক্তির হাজতবাসের শাস্তি হলে সংশ্লিষ্ট দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তির মুক্তির জন্য এই 'লেখ' জারি করা যায় না [**জনারধন বনাম হায়দ্রাবাদ রাজ্য** (১৯৫১)]।

(২) পরমাদেশ (Mandamus) : 'ম্যাণ্ডেমাস' একটি ল্যাটিন শব্দ। এর ইংরেজী অর্থ 'We order' অর্থাৎ আমরা আদেশ করি। আদালত এ ধরনের আদেশের মাধ্যমে সরকার, ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি সর্বসাধারণের দায়িত্বযুক্ত কর্তৃপক্ষকে তার আইনানুগ কর্তব্য পালনের জন্য নির্দেশ প্রদান করে। কিন্তু রাষ্ট্রপতি বা কোন রাজ্যপালের বিরুদ্ধে 'পরমাদেশ' জারি করা যায় না।

(৩) প্রতিষেধ (Prohibition) : এর অর্থ হল 'নিষেধ করা'। উর্ধ্বতন আদালত নিম্নতন আদালতকে নিজ সীমার মধ্যে কাজ করতে নির্দেশ দেওয়ার জন্য এই লেখ জারি করে। তা ছাড়া স্বাভাবিক ন্যায়বিচার বিরোধী কাজ না করার জন্যও 'প্রতিষেধ' জারি করা যায়। উর্ধ্বতন আদালতের এই নির্দেশ লঙ্ঘন করলে লঙ্ঘনকারীকে আদালত অবমাননার দায়ে অভিযুক্ত করা যায়। 'প্রতিষেধ' একমাত্র আদালতের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা যায়। অর্থাৎ বিচার-বিষয়ক (quasi-judicial) ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রেই 'প্রতিষেধ' প্রযুক্ত হয়। আইন-বিষয়ক ক্ষমতার উপর এই 'লেখ' প্রয়োগ করা হয় না।

(৪) অধিকার পৃচ্ছা (Quo-warranto) : এর অর্থ হল 'কোন্ অধিকারে'। আইনসঙ্গতভাবে কোন বিশেষ পদে নিযুক্ত না হয়েও কোন ব্যক্তি সেই পদ দাবি করলে তার দাবির বৈধতা বিচারের জন্যে এই লেখ জারি করা হয়। দাবি আইনসঙ্গত না হলে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে পদচ্যুত করা হয়। তবে কেবলমাত্র সরকারী পদের ক্ষেত্রেই 'অধিকার-পৃচ্ছা' প্রযুক্ত হয়।

(৫) উৎপ্রেষণ (Certiorari) : এর অর্থ বিশেষভাবে জ্ঞাত হওয়া। নিম্নতন আদালত বা বিচারকার্যের ক্ষমতাযুক্ত প্রতিষ্ঠান নিজ এক্তিয়ারের বাইরে গেলে এই লেখ-র সাহায্যে মামলাকে উর্ধ্বতন আদালতে স্থানান্তরিত করা যায় এবং এক্তিয়ার বহির্ভূত সিদ্ধান্তকে বাতিল করা যায়। পৌর প্রতিষ্ঠানসমূহের উপরও 'উৎপ্রেষণ' জারি করা যায়।

উপরিউক্ত 'লেখগুলি' নাগরিক অধিকার সংরক্ষণের ক্ষেত্রে ভারতের সুপ্রীম কোর্ট ও হাইকোর্টগুলিকে অত্যন্ত ব্যাপক ক্ষমতা দিয়েছে। ইংল্যাণ্ডের আইন ব্যবস্থা থেকে উদ্ভূত এই লেখগুলিকে ভারতীয় পরিবেশের উপযুক্ত করার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধনের ক্ষমতা সুপ্রীম কোর্টের আছে (**রসিদ আমেদ বনাম মিউনিসিপ্যাল বোর্ড**)। এই সমস্ত পরিবর্তন সাধনের জন্য কোন আইন প্রয়োজন হয় না (**চরণজিৎলাল বনাম ভারত সরকার**)। এখানে আইনগত পদ্ধতি অপেক্ষা অধিকার রক্ষাকেই অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

তা ছাড়া, অধিকার লঙ্ঘনের হুমকি দেওয়া হয়েছে এরকম ক্ষেত্রেও আদালতে লেখ জারির আবেদন করা যায়। তবে বন্দী প্রত্যক্ষীকরণ ছাড়া অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকেই লেখ-এর জন্য আবেদন করতে হয়। অপরাধ সংঘটিত হতে পারে এই আশংকার ভিত্তিতে ব্যক্তিকে বিনা বিচারে আটক করার জন্য সংবিধানে রাষ্ট্রকে নিবর্তনমূলক আটকের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। তেমনি অধিকার লঙ্ঘিত হওয়ার আশংকার ভিত্তিতে 'লেখ' জারির মাধ্যমে প্রতিবিধানের জন্য আদালতের কাছে আবেদন করার অধিকার ব্যক্তিকে দেওয়া হয়েছে।

সংবিধানের অন্যান্য মৌলিক অধিকারগুলির মত শাসনতান্ত্রিক প্রতিবিধানের অধিকারও অবাধ নয়। এই অধিকারের উপরও কতকগুলি বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে।

বিচারপতিদের বদলি সম্পর্কিত মামলা সূত্রে জনস্বার্থ বিষয়ক মামলার নতুন ধারণা উল্লিখিত হয়। তদনুসারে মৌলিক অধিকার লঙ্ঘনজনিত কারণে যে কোন ব্যক্তি প্রতিকার প্রার্থনা করে আদালত আবেদন করতে পারেন। অর্থাৎ আবেদনকারীকে ব্যক্তিগতভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হবে এমন কোন বিধি-নিষেধ নেই। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ নিজে বা ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষের তরফে যে কোন ব্যক্তি প্রতিবিধানের জন্য আদালতে আবেদন করতে পারে। চিঠির মাধ্যমেও এই আবেদন করা যায় [**এস. পি. গুপ্ত বনাম ভারতের রাষ্ট্রপতি (১৯৮২)**]।

(ক) শাসনতান্ত্রিক প্রতিবিধানের অধিকার ভোগের ক্ষেত্রে ভারতের সকল শ্রেণির নাগরিক সম্পূর্ণ সুযোগ পান না। সশস্ত্র বাহিনী, পুলিশ বাহিনী প্রভৃতি জনশৃঙ্খলা রক্ষায় নিযুক্ত বাহিনীর কর্মীরা এই ব্যতিক্রমের উদাহরণ। যথাযথভাবে তাঁদের কর্তব্য সম্পাদন নিশ্চিত করার জন্য এ সকল বাহিনীর সদস্যগণ এই মৌলিক অধিকার কতটুকু ভোগ করতে পারবেন তা পার্লামেন্ট আইন করে ঠিক করে দেয় (৩৩ ধারা)। সংবিধানের ৫০তম সংশোধনী (১৯৮৪) আইন অনুসারে সরকারী সম্পত্তির রক্ষীবাহিনীর সদস্য এবং গোয়েন্দা বিভাগ ও টেলি-যোগাযোগ ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত কর্মীদের ক্ষেত্রেও সংবিধানের ৩৩ ধারার বিধান প্রযুক্ত হবে। অর্থাৎ রাষ্ট্র আইনানুসারে উল্লিখিত বাহিনী বা বিভাগের কর্মীদের মৌলিক অধিকারের ভোগকে সঙ্কুচিত বা নিয়ন্ত্রিত করতে পারে।

(খ) সকল রকম সরকারী কাজের বিরুদ্ধে প্রতিবিধানের সুযোগ-সুবিধা নাও থাকতে পারে। কোন অঞ্চলে সামরিক আইন বলবৎ থাকাকালীন সময়ে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে মৌলিক অধিকারের উপর বিধিনিষেধ আরোপিত হতে পারে। সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে কেন্দ্র বা রাজ্যসরকারের কোন কর্মচারী বা অন্য কোন ব্যক্তি শৃঙ্খলা রক্ষা বা পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য কোন অবৈধ কাজ করলেও তাকে বৈধ ঘোষণা করে পার্লামেন্ট আইন পাস করতে পারে (৩৪ ধারা)। একে দণ্ডনিষ্কৃতি আইন (Indemnity Act) বলে।

(গ) ৩৫৮ ধারা অনুসারে আপৎকালীন জরুরী অবস্থায় সংবিধানের ১৯ ধারার স্বাধীনতার অধিকারগুলি সাময়িকভাবে অকার্যকর হয়ে যায়। এই অবস্থায় আইন-বিভাগ যে-কোন আইন প্রণয়ন করতে পারে এবং শাসন-বিভাগ যে-কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। জরুরী অবস্থার ঘোষণাকাল উত্তীর্ণ হলে ১৯ ধারা পুনরায় বলবৎ হয়। তবে আপৎকালীন অবস্থায় অধিকারগুলি ক্ষুণ্ণ করে কোন কাজ করা হয়ে থাকলে তার বিরুদ্ধে প্রতিকারের ব্যবস্থা হয় না।

(ঘ) জরুরী অবস্থার ঘোষণা বলবৎ থাকাকালীন সময়ে রাষ্ট্রপতি বিশেষ আদেশ জারি করে শাসনতান্ত্রিক প্রতিবিধানের অধিকার স্থগিত রাখতে পারেন। অধিকারগুলিকে কার্যকর করার জন্য আদালতে আবেদন করার অধিকারকে রাষ্ট্রপতি স্থগিত রাখতে পারেন (৩৫৯ ধারা)। কোন্ কোন্ মৌলিক অধিকার বলবৎ করার অধিকার বাতিল করা হল তা রাষ্ট্রপতির আদেশে উল্লিখিত থাকে। এর ফলে সংশ্লিষ্ট অধিকারটি বিচারযোগ্যতা হারায়। এই সময় অধিকারটি অকার্যকর হয়ে থাকে। রাষ্ট্রপতির এই আদেশ সমগ্র দেশ বা কোন একটি অঞ্চলে প্রযুক্ত হতে পারে। জরুরী অবস্থার ঘোষণা উত্তীর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঐ অধিকার পুনরুজ্জীবিত হবে।

১৯৭৪ সালের নভেম্বর মাসে রাষ্ট্রপতি এ রকম একটি আদেশ জারি করেন। এতে বলা হয় যে 'আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা রক্ষা আইনে' [Maintenance of Internal Security Act (MISA)] আটক ব্যক্তিগণ ১৪, ২১ এবং ২২ ধারার অধিকার বলবৎ করতে পারবে। পরের বছর ২৭শে জুন রাষ্ট্রপতি ঐ তিনটি অধিকার বলবৎ করার অধিকার বাতিল করেন। ১৯৮০ সালে 'জাতীয় নিরাপত্তা আইন' [National Security Act. 1980 (NSA)] প্রণীত হয়। ১৯৮১ সালে 'অত্যাবশ্যক সংস্থাসমূহে কাজকর্ম চালু রাখা আইন' [Essential Service Maintenance Act, 1981 (ESMA)] প্রণীত হয় । এই দুটি আইনও অধিকার প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রতিকূলতার সৃষ্টি করেছে।

মূল্যায়ন (Evaluation) : সংবিধানের তৃতীয় অধ্যায়ে উল্লিখিত মৌলিকঅধিকারগুলির মধ্যে শাসনতান্ত্রিক প্রতিবিধানের অধিকারটি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এই অধিকারটির অস্তিত্ব অন্যান্য অধিকারগুলি ভোগের ব্যাপারে নিশ্চয়তার সৃষ্টি করে। মৌলিক অধিকারসমূহের সুরক্ষার উপযুক্ত বিধি-ব্যবস্থা এই মৌলিক অধিকারটির মধ্যে বহুলাংশে নিহিত আছে। শাসনতান্ত্রিক প্রতিবিধানের অধিকারটি তৃতীয় অধ্যায়ের নাগরিক অধিকারগুলিকে অর্থবহ করে তুলেছে। ভারতের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি গজেন্দ্রগাদকর (Gajendragadkar)-এর মতানুসারে সংবিধানের আলোচ্য অংশটি হল গণতান্ত্রিক কাঠামোর একটি ভিত্তি প্রস্তর ("…..a cornerstone of the democratic edifice raised by our constitution.")। ডঃ আম্বেদকর (Dr. Ambedkar) বলেছেন: "It is the very soul of the Constitution and the very heart of it."

সমালোচনা : শাসনতান্ত্রিক প্রতিবিধানের অধিকার সঙ্কুচিত করে সংবিধানে যে সমস্ত বিধিব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে তা তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছে। স্বদেশে ও বিদেশে এ নিয়ে বিরূপ সমালোচনার অভাব নেই। সমালোচকদের মতানুসারে জরুরী অবস্থার সময় মৌলিক অধিকারগুলি বিচার-বিভাগের সংরক্ষণ হারায়। তার ফলে অধিকারগুলি অর্থহীন হয়ে পড়ে। এই অবস্থায় ভারতের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বিপন্ন হয়ে পড়ে। দেশে একনায়কতান্ত্রিক ব্যবস্থা কায়েম হয়।

মার্কিন ও ব্রিটিশ দৃষ্টান্ত : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা ব্রিটেনে স্বাভাবিক অবস্থায় বন্দী প্রত্যক্ষীকরণের লেখকে স্থগিত রাখা যায় না। মার্কিন সংবিধান অনুসারে কেবল যুদ্ধ বা বহিরাক্রমণের সময় প্রয়োজন দেখা দিলে বন্দী প্রত্যক্ষীকরণ লেখকে স্থগিত রাখা যায়। কিন্তু যুদ্ধ বা আক্রমণের আশংকাজনিত কারণে তা করা যায় না। তা ছাড়া বন্দী প্রত্যক্ষীকরণ লেখ বন্ধ রাখার মত অবস্থা সত্যি সত্যি দেখা দিয়েছে কিনা মার্কিন আদালত তা বিচার করে দেখতে পারে। যুদ্ধের সময় ব্রিটিশ সরকার বিনা বিচারে আটক করার ব্যাপক ক্ষমতা ভোগ করে। কিন্তু অন্য কোন সময়ের জরুরী অবস্থায় বন্দীপ্রত্যক্ষীকরণ লেখকে স্থগিত রাখা যায় না।

কিন্তু ভারতে এ ক্ষেত্রে যুদ্ধ ও শান্তিকালীন অবস্থার মধ্যে পার্থক্য করা হয় নি। তা ছাড়া এ ক্ষেত্রে নাগরিক অধিকার সংরক্ষণের ব্যাপারে ভারতীয় আদালত মার্কিন আদালতের থেকে হীনবল। যুদ্ধ, বহিরাক্রমণ এবং আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে সশস্ত্র গৃহযুদ্ধ ঘটলে বা এই সমস্ত ঘটনার আশংকা দেখা দিলে রাষ্ট্রপতি জরুরী অবস্থার ঘোষণা জারি করতে পারেন (৩৫২ ধারা)। এই সময় মৌলিক অধিকার সংরক্ষণের ক্ষেত্রে আদালতের ক্ষমতা অকার্যকর হয়ে পড়ে।

তবে ৪৪তম সংবিধান সংশোধন (১৯৭৮)-এর পর অবস্থার বেশ কিছুটা উন্নতি হয়েছে। এই সংশোধনের মাধ্যমে ৩৫৮ ধারায় বলা হয়েছে যে কেবলমাত্র যুদ্ধ ও বহিরাক্রমণের ক্ষেত্রেই ১৯ ধারার স্বাধীনতার অধিকারগুলি বাতিল করা যাবে। আভ্যন্তরীণ জরুরী অবস্থার কারণে তা করা যাবে না। ৪৪তম সংশোধনের মাধ্যমে আরও বলা হয়েছে যে রাষ্ট্রপতি কোন অবস্থাতেই ৩৫৯ ধারা বলে ২১ ধারার জীবন ও ব্যক্তিগত

স্বাধীনতার অধিকারকে স্থগিত রাখতে পারবেন না। তা ছাড়া এই সংবিধান সংশোধনী আইনে রাষ্ট্রপতির জরুরী অবস্থা সম্পর্কিত ক্ষমতাসমূহ বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। তার ফলে মৌলিক অধিকার সঙ্কুচিত হওয়ার আশঙ্কা কিছুটা হ্রাস পেয়েছে।

উপসংহার : ডঃ আম্বেদকর গণপরিষদে বলেছেন যে, রাষ্ট্রীয় স্বার্থ ক্ষুণ্ন হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিলে বা জরুরী অবস্থায় মৌলিক অধিকার স্থগিত রাখার প্রয়োজন দেখা দেয়। পৃথিবীর সকল দেশেই জরুরী অবস্থায় মৌলিক অধিকার নিয়ন্ত্রণ করা হয়। এই সমস্ত দেশে মৌলিক অধিকারের নিয়ন্ত্রণগুলি সাধারণ আইনের মাধ্যমে কার্যকর হয়। তাই সমালোচকরা তা সব সময় বুঝতে পারেন না। কিন্তু ভারতে শাসনতান্ত্রিক প্রতিবিধানের অধিকারটির মত তার নিয়ন্ত্রণগুলিও সংবিধানে সংযোজিত আছে। তার ফলে সহজেই তা সকলের দৃষ্টিগোচর হয়। সর্বোপরি সংসদের অনুমোদন ছাড়া কোন মৌলিক অধিকার স্থগিত রাখা যায় না। জনগণের প্রতিনিধিপুষ্ট সংসদের সিদ্ধান্তকে অগণতান্ত্রিক বলা যায় না। সংসদের সমর্থনই হল এ ক্ষেত্রে সর্বশ্রেষ্ঠ রক্ষাকবচ। বস্তুতঃ ভারতের সংবিধানে নাগরিক অধিকার ও রাষ্ট্রের নিরাপত্তার মধ্যে দ্বিতীয়টিকে অধিকতর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

৬.১৪ মৌলিক অধিকারসমূহের সমালোচনা ও মূল্যায়ন (Criticism and Evalu-ation of Fundamental Rights)

ভারতীয় সংবিধানের তৃতীয় অধ্যায়ে মৌলিক অধিকারসমূহের উল্লেখ আছে। উল্লিখিত অধিকারগুলির প্রয়োগ স্থান, কাল, পাত্রের উপর নির্ভরশীল। সমালোচকরা অধিকারগুলির সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সরব। বিভিন্ন দিক থেকে ভারতীয় সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত মৌলিক অধিকারগুলির বিরূপ সমালোচনা করা হয়ে থাকে।

(১) বাধানিষেধের আধিক্য : তৃতীয় অধ্যায়ের মৌলিক অধিকারগুলি বিশেষভাবে সীমাবদ্ধ। কোন অধিকারই নিরঙ্কুশ বা অবাধ হতে পারে না। কোন রাষ্ট্রই তার নাগরিকদের অবাধে অধিকার ভোগের সুযোগ দেয় না। তাতে স্বৈরাচারের সৃষ্টি হয়। ভারতীয় সংবিধানেও তাই মৌলিক অধিকার ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে ঘোষিত অধিকারগুলির উপর বিভিন্ন বাধানিষেধের কথা বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে। সংবিধানের মাধ্যমেই কতকগুলি ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়েছে। আবার কতকগুলি ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ আরোপের ক্ষমতা পার্লামেন্টকে দেওয়া হয়েছে। সমালোচকদের মতানুসারে সংবিধানে মৌলিক অধিকারের সঙ্গে যে সমস্ত বিধিনিষেধের কথা বলা হয়েছে তা বিশেষভাবে ব্যাপক। সংবিধানে সরাসরি ও সুস্পষ্টভাবে অধিকারগুলির উপর বাধানিষেধ আরোপ করা হয়েছে। সংবিধানের ১৯ ধারায় ছটি স্বাধীনতার অধিকার স্বীকৃত হয়েছে এবং স্বীকৃত অধিকারগুলির উপর সুনির্দিষ্ট বাধানিষেধ আরোপিত হয়েছে। জরুরী অবস্থায় আদালত বাধানিষেধের বৈধতা বা যৌক্তিকতা বিচার করতে পারে না।

অন্য কোন গণতান্ত্রিক দেশে নাগরিকদের মৌলিক অধিকারের উপর বাধানিষেধের এমন আধিক্য দেখা যায় না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নিরাপত্তার কারণ দেখিয়ে আইনের মাধ্যমে ব্যক্তির অধিকারে হস্তক্ষেপ করা যায় না। মার্কিন আদালত নাগরিক অধিকারের উপর বাধানিষেধ আরোপের বিষয়টিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। ভারতের বিচার-বিভাগের ভূমিকা এ ক্ষেত্রে অত্যন্ত দুর্বল।

সমালোচকরা তৃতীয় অধ্যায়ের মৌলিক অধিকারগুলিকে 'সীমিত মৌলিক অধিকার' হিসাবে অভিহিত করেছেন। তাঁদের মতানুসারে আলোচ্য তৃতীয় অধ্যায়টির শিরোনাম হওয়া উচিত ছিল 'মৌলিক অধিকার ও তাদের উপর আরোপিত নিয়ন্ত্রণ'। তাঁদের আরও অভিমত হল এই অধ্যায়ে এক হাতে অধিকারগুলি প্রদান করা হয়েছে এবং অন্য হাতে অধিকারগুলি কেড়ে নেওয়া হয়েছে। অধিকারের স্বীকৃতির সঙ্গে সঙ্গে সংবিধানে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বহু ব্যতিক্রমের উল্লেখ করা হয়েছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ প্রয়োজনে রাষ্ট্রকে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণের অধিকার দেওয়া হয়েছে।

(২) জরুরী অবস্থার প্রতিকূলতা : মৌলিক অধিকারের উপর জরুরী অবস্থার প্রতিকূল প্রতিক্রিয়া বিরূপ সমালোচনার সৃষ্টি করেছে। জরুরী অবস্থা বলবৎ থাকাকালীন সময়ে তত্ত্বগতভাবে মৌলিক অধিকার বজায় থাকে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে সরকারের সদিচ্ছার উপর অধিকারগুলি নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। সংবিধানের ৩৫৮ ও ৩৫৯ ধারা অনুসারে রাষ্ট্রপতি মৌলিক অধিকার স্থগিত রাখার ব্যবস্থা করতে পারেন। সংবিধানের ৩২ ধারায় শাসনতান্ত্রিক প্রতিবিধানের অধিকার স্বীকার করা হয়েছে। এই অধিকারটি হল একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধিকার। জরুরী অবস্থার সময় এই গুরুত্বপূর্ণ অধিকারটির উপরও বাধানিষেধ আরোপ করার ক্ষমতা রাষ্ট্রকে দেওয়া হয়েছে। জরুরী অবস্থায় মৌলিক অধিকার বলবৎ করার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ক্ষমতা আদালতকে দেওয়া হয় নি। তাই জরুরী অবস্থায় ভারতীয় গণতন্ত্রের অপমৃত্যুর আশঙ্কা অমূলক নয়। জরুরী অবস্থা

সম্পর্কিত বিধিব্যবস্থা ভারতে একনায়কতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার পথকে সুগম করে। তাই এইচ. ভি. কামাথ (H. V. Kamath) মন্তব্য করেছেন: "I fear that by this single chapter we are seeking to lay the foundation of a totalitarian state."

(৩) **নিবর্তনমূলক আটক আইন :** স্বাভাবিক বা শান্তিপূর্ণ অবস্থায়ও আইনের মাধ্যমে নাগরিক অধিকারের উপর বাধানিষেধ আরোপ করার সুযোগ সংবিধানে দেওয়া হয়েছে। এ ক্ষেত্রে উদাহরণ হিসাবে নিবর্তনমূলক আটক আইন, আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা রক্ষা আইন, জাতীয় নিরাপত্তা আইন, অত্যাবশ্যক সংস্থাসমূহে কাজকর্ম চালু রাখা আইন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । বস্তুতঃ এই সমস্ত আইন প্রণীত ও প্রযুক্ত হওয়ার ফলে নাগরিক অধিকার ক্ষুণ্ণ হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। অন্য কোন গণতান্ত্রিক দেশে স্বাভাবিক অবস্থায় নিবর্তনমূলক আটক আইনের কথা ভাবা হয় না। ভারতীয় সংবিধানের এই ব্যবস্থা নিতান্তই অগণতান্ত্রিক। এ. কে. গোপালন বনাম মাদ্রাজ রাজ্য মামলায় (১৯৫০) বিচারপতি মহাজন (Justice Mahajan) মন্তব্য করেছেন: "Preventive Detention laws are repugnant to democratic constitution and they cannot be found to exist in any of the democratic countries of the world."

(৪) **সংসদীয় আক্রমণ :** সংবিধান অনুসারে সংসদ মৌলিক অধিকার পরিবর্তন করতে পারে। সংসদের এই ক্ষমতার পরিপ্রেক্ষিতে মৌলিক অধিকারগুলির অলঙ্ঘনীয় প্রকৃতি বিপন্ন হয়েছে। চূড়ান্ত বিচারে অধিকার অলঙ্ঘনীয় হতে পারে না। এ কথা ঠিক। কিন্তু মৌলিক অধিকারগুলি সংবিধানে লিপিবদ্ধ আছে। এই সংবিধান হল দেশের সর্বোচ্চ আইন। সংবিধানে লিপিবদ্ধ মৌলিক অধিকারগুলি হল ভারতীয় গণতন্ত্রের ভিত্তিস্বরূপ। এই মৌলিক অধিকারগুলি সংসদে উপস্থিত দেশের রাজনীতিবিদদের হাতের ক্রীড়নকে পরিণত হবে, তা মেনে নেওয়া যায় না। তার উপর এ ক্ষেত্রে বিচার-বিভাগীয় নিয়ন্ত্রণকে অতিক্রম করার জন্য সংসদ বহুবার সংবিধান সংশোধনের ব্যবস্থা করেছে। সব থেকে বেশী আঘাত এসেছে সম্পত্তির অধিকারের উপর। তার ফলে পরিণামে সম্পত্তির অধিকার মৌলিক অধিকারের তালিকা থেকে বাদ পড়েছে এবং সাধারণ আইনগত অধিকারে পরিণত হয়েছে। সুপ্রীম কোর্ট গোলকনাথ মামলায় সংশ্লিষ্ট সকলকে এ বিষয়ে সতর্ক করে দিয়েছে। সংসদকে মৌলিক অধিকার পরিবর্তনের ক্ষমতা না দেওয়ার পক্ষে মতপ্রকাশ করেছে। গোলকনাথ মামলায় সুপ্রীম কোর্টের সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে জোহারী ভিন্ন মত ব্যক্ত করেছেন। তিনি এ ক্ষেত্রে বিচার-বিভাগের রক্ষণশীল ভূমিকার প্রতিবাদ করেছেন। আবার সমাজতান্ত্রিক কাঠামো ও জনকল্যাণের অজুহাতে সম্পত্তির অধিকারের উপর সংসদীয় আক্রমণকে মৌলিক অধিকারের দিক থেকে কলঙ্কজনক বলে মন্তব্য করেছেন।

(৫) **বৈষম্যমূলক সংরক্ষণ :** মৌলিক অধিকারের পর্যালোচনা থেকে প্রতিপন্ন হয় যে তত্ত্ব ও বাস্তবের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ফাঁক আছে। ভারতের অনগ্রসর শ্রেণি ও সম্প্রদায়সমূহের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য সংবিধানে বৈষম্যমূলক সংরক্ষণ (Protective discrimination)-এর ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে সংবিধান রচয়িতাদের উদ্দেশ্য সফল হয়নি। বরং এই সমস্ত ব্যবস্থাদির ফলে নতুনভাবে সাম্প্রদায়িকতার আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। তফসিলী সম্প্রদায়ের মানুষেরা দীর্ঘদিন ধরে সরকারী সুযোগ-সুবিধাগুলি ভোগ করতে করতে এগুলি তারা তাদের অধিকার হিসাবে বিবেচনা করতে শুরু করেছে। দেশের অন্যান্য অনুন্নত ব্যক্তিবর্গ এই সমস্ত প্রয়োজনীয় সুবিধাদি ভোগ করতে পারে না। ফলে একটি বঞ্চনার মনোভাব সৃষ্টি হয়। এই সূত্রে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে সংরক্ষণ বিরোধী আন্দোলন সংগঠিত হতে দেখা যায়। দেশবাসীর মধ্যে এ ধরনের মানসিকতা জাতীয় ঐক্য ও সংহতির পরিপন্থী। অথচ রাজনৈতিক কারণে সরকারী ও বিরোধী কোন রাজনৈতিক দলই এই বৈষম্যমূলক সংরক্ষণ ব্যবস্থার অবলুপ্তির কথা মুখেও আনে না। এর ফলে দেশে কল্যাণের পরিবর্তে অকল্যাণই হচ্ছে অধিক।

(৬) **কতকগুলি ক্ষেত্রে সংবিধান নীরব :** ভারতীয় সংবিধান হল বিশ্বের বৃহত্তম লিখিত সংবিধান। সংবিধানের তৃতীয় অধ্যায়ে মৌলিক অধিকারগুলি যথেষ্ট বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। অথচ কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ ধারণাকে যথাযথভাবে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা হয় নি। কতকগুলি ক্ষেত্রে সংবিধান একেবারে নীরব। সংবিধানের এই নীরবতা ক্ষেত্রবিশেষে সঙ্কটের সৃষ্টি করে। এ ক্ষেত্রে উদাহরণ হিসাবে জনস্বার্থ, সংখ্যালঘু, ক্ষতিপূরণ প্রভৃতি ধারণাগুলির কথা বলা যায়। সংবিধানের নীরবতার সুযোগ নিয়ে সংসদ এই সমস্ত ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা প্রদানের ক্ষমতার অধিকারী হয়েছে। তেমনি আবার এই সমস্ত ধারণাগুলির ব্যাখ্যা সংবিধানসম্মত কিনা আদালত তা বিচার করে দেখতে পারে। এর ফলে এ নিয়ে আইন ও বিচার-বিভাগের মধ্যে মতবিরোধের সম্ভাবনার সৃষ্টি হয়।

(৭) **সঙ্গতিপূর্ণ দর্শনের অভাব :** সমালোচকদের অনেকের অভিযোগ অনুযায়ী মৌলিক অধিকার সম্পর্কিত সংবিধানের তৃতীয় অধ্যায়ের পিছনে সামঞ্জস্যপূর্ণ দার্শনিক চিন্তাধারার অভাব আছে। সুসঙ্গত দার্শনিক

নীতিসমূহের ভিত্তিতে মৌলিক অধিকার সম্পর্কিত অধ্যায়টি প্রণীত হয়নি। স্যার আইভর জেনিংস (Sir Ivor Jennings)-এর মতানুসারে ভারতীয় সংবিধানে সন্নিবিষ্ট মৌলিক অধিকারসমূহ সামঞ্জস্যপূর্ণ দার্শনিক ভিত্তিযুক্ত নয়। এই কারণে মৌলিক অধিকার ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে সুপ্রীম কোর্ট ও হাই কোর্টকে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়।

(৮) অধিকারগুলিকে কার্যকর করার ব্যবস্থা নেই : উল্লিখিত মৌলিক অধিকারগুলিকে বাস্তবায়িত করার জন্য কার্যকর পন্থাপদ্ধতির ব্যবস্থা সংবিধানে করা হয়নি। সমাজতান্ত্রিক দেশে মৌলিক অধিকার উল্লেখের সঙ্গে সঙ্গে অধিকারগুলিকে বাস্তবে রূপায়িত করার ব্যাপারে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ থাকে। প্রতিটি মৌলিক অধিকার কিভাবে কার্যকর করা হবে সে বিষয়ে পূবর্তন সোভিয়েত সংবিধানে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি সম্পর্কে উল্লেখ ছিল। কিন্তু ভারতের সংবিধানে মৌলিক অধিকার কার্যকর করার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থাদির উল্লেখ নেই।

(৯) অধিকার সংরক্ষণে আদালতের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ : সংবিধানের মৌলিক অধিকারগুলি বিচার-বিভাগ কর্তৃক সংরক্ষিত। কিন্তু এ ক্ষেত্রে আদালতের বিচার করার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। কারণ অধিকারসমূহের উপর আরোপিত বিধিনিষেধগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সংবিধানে বিস্তারিতভাবে উল্লিখিত আছে। তাই আদালতের ক্ষমতা এ ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে। আইন-বিভাগ ও শাসন-বিভাগ স্বাভাবিক অবস্থায় আইন প্রণয়ন করে এবং জরুরী অবস্থায় বিশেষ ক্ষমতার মাধ্যমে মৌলিক অধিকারের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করার সুযোগ পায়। তার ফলে অনেক ক্ষেত্রে আদালত অসহায় এবং মৌলিক অধিকার অর্থহীন হয়ে পড়ে। অনুরূপ ক্ষেত্রে মার্কিন সংবিধানে বিচার-বিভাগকে অনিয়ন্ত্রিত ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে।

(১০) অর্থনৈতিক অধিকারের অনুপস্থিতি : ভারতীয় সংবিধানের তৃতীয় অধ্যায়ের মৌলিক অধিকারগুলি প্রকৃতিগত বিচারে রাজনৈতিক ও আইনানুগ। ভারতে রাজনৈতিক গণতন্ত্র আছে; আর আছে মুষ্টিমেয় কিছু মানুষের হাতে অর্থনৈতিক ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণ (Economic Oligarchy)। অর্থাৎ তৃতীয় অধ্যায়ের মৌলিক অধিকারের মাধ্যমে এ দেশে অর্থনৈতিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় নি। মৌলিক অধিকারের অধ্যায়ে কাজের অধিকার, বিশ্রামের অধিকার, অবসর বিনোদনের অধিকার, সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার প্রভৃতি স্বীকার করা হয় নি। ভারতীয় সংবিধানে অর্থনৈতিক অধিকার-গুলিকে নির্দেশমূলক নীতি সম্পর্কিত চতুর্থ অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। নির্দেশমূলক নীতিগুলি অসংরক্ষিত। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মৌলিক অধিকারের অনুপস্থিতির ফলে জনগণ অর্থনৈতিক ন্যায়-বিচার ও অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে দুর্বল ও দরিদ্রদের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মৌলিক অধিকার অর্থহীন প্রতিপন্ন হয়। এই অবস্থায় মৌলিক অধিকারগুলি কাগুজে অধিকারে পরিণত হয়।

(১১) অস্বচ্ছতা : মৌলিক অধিকারসমূহের বিরুদ্ধে অস্বচ্ছতার অভিযোগ উত্থাপিত হয়। মৌলিক অধিকারগুলি অস্পষ্ট, অনির্দিষ্ট এবং দুর্বোধ্য বা দ্ব্যর্থবোধকভাবে অভিব্যক্ত হয়েছে। এমন কিছু কিছু শব্দ বা প্রত্যয় প্রয়োগ করা হয়েছে, যেগুলি ব্যাপকভাবে অর্থবহ বা বহু অর্থবোধক। এ ক্ষেত্রে উদাহরণ হিসাবে 'জনশৃঙ্খলা', 'জনস্বার্থ', 'যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধ', 'সংখ্যালঘু' প্রভৃতি শব্দ বা প্রত্যয়ের কথা বলা যায়। এই সমস্ত শব্দের অর্থ বা ব্যঞ্জনা সাধারণ মানুষের বোধবুদ্ধির অগম্য।

(১২) দারিদ্র্যের সীমাবদ্ধতা : ভারতের সাধারণ মানুষের ন্যায়-বিচারের সুযোগ গ্রহণের মত আর্থিক সঙ্গতি নেই। বিচারবিভাগীয় সমীক্ষার ব্যবস্থা বিশেষভাবে ব্যয়সাধ্য। তাই মৌলিক অধিকার লঙ্ঘিত হলেও দেশের দুর্বল ও দরিদ্র মানুষ বিচার-বিভাগীয় সংরক্ষণের সুযোগ গ্রহণ করতে পারে না। তাই এ দেশে বিচার-বিভাগীয় সংরক্ষণের ব্যবস্থা বড় একটা কার্যকর হতে পারে না।

মূল্যায়ন ও তাৎপর্য : ভারতীয় সংবিধানের তৃতীয় অধ্যায়ের মৌলিক অধিকারগুলির বিরুদ্ধে বহু ও বিভিন্ন সমালোচনা আছে। কিন্তু উল্লিখিত যুক্তিগুলি সর্বাংশে মেনে নেওয়া যায় না। সমালোচকদের বক্তব্য অনেক ক্ষেত্রে অতিরঞ্জিত এবং একদেশদর্শিতা দোষে দুষ্ট। তা ছাড়া সংবিধানের তরফ থেকেও বহু কথা বলার আছে।

(ক) ভারতীয় সংবিধানে জনসমাজের বৃহত্তর স্বার্থে তথা জাতীয় স্বার্থের পরিপ্রেক্ষিতে নাগরিক অধিকারসমূহের উপর যুক্তিসঙ্গত বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে সংবিধান ব্যক্তির অধিকার ও সামাজিক স্বার্থের মধ্যে উপযুক্ত সমন্বয় সাধনের ব্যবস্থা করেছে। **এ. কে. গোপালন বনাম মাদ্রাজ রাজ্য মামলায় (১৯৫০)** সুপ্রীম কোর্টের অভিমত হল আইনের উদ্দেশ্য বৃহত্তর সামাজিক স্বার্থ সাধন করলে, সামগ্রিক স্বার্থে মুষ্টিমেয় মানুষের অধিকারে হস্তক্ষেপ করা যায়। ভারতের বৃহৎ ও অতি জটিল সমাজব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অধিকারগুলির উপর আরোপিত নিয়ন্ত্রণ মোটেই অত্যধিক নয়।

(খ) জরুরী অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যে সমালোচনা করা হয়েছে তাও পুরোপুরি ঠিক নয়। দেশের শাসনব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার স্বার্থে জরুরী অবস্থা সম্পর্কিত বিধিব্যবস্থার গুরুত্ব ও তাৎপর্য অপরিসীম। তা ছাড়া জরুরী অবস্থা জারি হওয়া মানেই মৌলিক অধিকারের সঙ্কোচন এবং গণতন্ত্রের অপমৃত্যু এমন ধারণা ঠিক নয়। জরুরী অবস্থা জারি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মৌলিক অধিকার আপনা-আপনি সঙ্কুচিত হয়ে যায় না। তার জন্য রাষ্ট্রপতির পৃথক ঘোষণা দরকার হয়। ১৯৭১ সালে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধ বাধে। তখন জরুরী অবস্থা জারি করা হয়। এই সময় কিন্তু কোন মৌলিক অধিকার সঙ্কুচিত করা হয়নি।

(গ) নিবর্তনমূলক আটক আইন হল একটি সতর্ক মূলক ব্যবস্থা। দেশের নিরাপত্তা এবং দেশবাসীর সামগ্রিক স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য এমন আইনের প্রয়োজন হতে পারে। দেশবাসীর বৃহত্তর অংশের স্বাধীনতা ভোগকে নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত করার জন্য এ ধরনের আইনের উপযোগিতাকে অস্বীকার করা যায় না।

(ঘ) জরুরী অবস্থা এবং নিবর্তনমূলক আটক আইনের পরিপ্রেক্ষিতে সরকারের ক্ষমতা মাত্রাতিরিক্ত বলে মনে হয়। কিন্তু সদ্যস্বাধীন ভারতের অস্থির অবস্থা এবং বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে এ ধরনের ক্ষমতার প্রয়োজনীয়তার কথা অস্বীকার করা যায় না। ভারত বিভাগজনিত সামগ্রিক বিশৃঙ্খলা তো ছিলই, তদুপরি বিচ্ছিন্নতাবাদী কিছু শক্তি বা গোষ্ঠীও স্বাধীন ভারতের সাংবিধানিক কাঠামোকে সশস্ত্র পথে ধ্বংস করার লক্ষ্য ঘোষণা করেছিল। তা ছাড়া ভারত একটি বিশাল ও জনবহুল দেশ। বিভিন্ন গোষ্ঠী ও সম্প্রদায় এবং বহু ভাষাভাষী ও বহু ধর্মাবলম্বী মানুষের বাস এই ভারতভূমিতে। স্বভাবতই এর সমাজব্যবস্থা অত্যন্ত জটিল। এ রকম সরকারের হাতে কিছু বাড়তি ক্ষমতার প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করা যায় না।

(ঙ) নিবর্তনমূলক আটক আইন এবং জরুরী অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে জনগণের তরফে সর্বশ্রেষ্ঠ রক্ষাকবচ হল আইনের সমর্থন। সংবিধানে শাসন-বিভাগকে সরাসরি এই সমস্ত ক্ষমতা দেওয়া হয় নি। জনগণের প্রতিনিধিপুষ্ট আইনসভা সম্মতি জানালে তবেই শাসন-বিভাগ এই সমস্ত ক্ষমতা ভোগ করতে পারে। দেশের স্বাধীনতা, ঐক্য ও সংহতির স্বার্থে জনপ্রতিনিধিরা ব্যক্তির স্বাধীনতাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। আপাতদৃষ্টিতে তা অগণতান্ত্রিক মনে হতে পারে। কিন্তু প্রকৃত বিচারে তা অগণতান্ত্রিক বা একেবারে অসমর্থনযোগ্য নয়। অস্থির ও সঙ্কটকালীন অবস্থার কথা বিবেচনা করে সংবিধানে সরকারের হাতে এই সমস্ত ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে।

(চ) ১৯৭৮ সালের ৪৪তম সংবিধান সংশোধনী আইনের মাধ্যমে জরুরী অবস্থা এবং নিবর্তনমূলক আটক আইনের ক্ষেত্রে শাসন-বিভাগ ও আইন-বিভাগের ক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে সঙ্কুচিত বা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। তার ফলে বিরূপ সমালোচনার তীব্রতা বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছে।

(ছ) স্বাধীনতা লাভের প্রাক্কালে ভারতের আর্থিক অবস্থা ছিল অস্বচ্ছল। অর্থনৈতিক অধিকারকে মৌলিক অধিকার হিসাবে স্বীকার ও সংরক্ষণ করা তখন আর্থিক কারণের জন্য সম্ভব ছিল না। অর্থনৈতিক অধিকারগুলিকে কার্যকর করার মত আর্থিক সঙ্গতি সমকালীন ভারতীয় অর্থনীতির ছিল না। কিন্তু ভারতীয় সংবিধানের রচয়িতাদের ইচ্ছা ছিল রাজনৈতিক ও সামাজিক অধিকারের সঙ্গে নাগরিকদের অর্থনৈতিক অধিকার প্রদান করা। তাঁদের সাধ ছিল কিন্তু সাধ্য ছিল না। এই কারণে তাঁরা অর্থনৈতিক অধিকারগুলিকে একেবারে অগ্রাহ্য করেন নি। এই অধিকারগুলিকে তারা চতুর্থ অধ্যায়ের নির্দেশমূলক নীতির অন্তর্ভুক্ত করেছেন। বলা হয়েছে যে রাষ্ট্রের কাজে নীতিগুলিকে মৌলিক নীতি হিসাবে মান্য করতে হবে। নীতিগুলি অসংরক্ষিত বটে কিন্তু কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। বিভিন্ন মামলায় রায় দানের প্রাক্কালে আদালত কর্তৃক নীতিগুলির উল্লেখ ও সাহায্য গ্রহণ এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য । তা ছাড়া কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্যসরকারগুলিও বিভিন্ন আইনের মাধ্যমে বিভিন্ন নীতিকে বাস্তবে রূপায়িত করেছে এবং করছে।

(জ) নাগরিক অধিকার নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে সংবিধান আইনসভাকে কিছু অতিরিক্ত ক্ষমতা দিয়েছে। এ কথা অস্বীকার করা যাবে না। এখন নাগরিক অধিকারকে খর্ব করার জন্য আইন-বিভাগ যদি বিচার-বিভাগের কথাকে অন্যায়ভাবে নিয়ন্ত্রণ করে সে ক্ষেত্রে জাগ্রত জনমত হল জনগণের সর্বশ্রেষ্ঠ রক্ষাকবচ। পাইলী মন্তব্য করেছেন: "...in the ultimate analysis Fundamental Rights are not protected by courts of law but by public opinion."

ভারতীয় সংবিধানের তৃতীয় অধ্যায়ে মৌলিক অধিকারসমূহের গুরুত্ব ও তাৎপর্য নিম্নলিখিতভাবে বিন্যস্ত করা যায়।

(১) ভারতে আইনের অনুশাসন প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে মৌলিক অধিকারসমূহ সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

(২) মৌলিক অধিকারসমূহ ব্যক্তিগত স্বাধীনতা সংরক্ষণের অনুপন্থী এক ব্যাপক কর্মকাণ্ড।

(৩) মৌলিক অধিকার সরকারের অবাধ ক্ষমতার উপর সীমাবদ্ধতার নিগড় নিশ্চিত করে।

(৪) ভারতে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অন্যতম মেরুদণ্ড হিসাবে মৌলিক অধিকারের কথা বলা হয়।

(৫) সামাজিক সাম্য ও সামাজিক ন্যায়বিচারের ভিত্তি হিসাবে মৌলিক অধিকারসমূহের অস্তিত্ব বিশেষভাবে অর্থবহ।

(৬) মৌলিক অধিকারসমূহ রাজনীতিক এবং প্রশাসনিক প্রক্রিয়ায় জনসাধারণের অংশগ্রহণকে সহজ ও স্বাভাবিক করে।

(৭) মানুষের জাগতিক ও নৈতিক নিরাপত্তা-বিধানের ক্ষেত্রে মৌলিক অধিকারসমূহ সদর্থক ভূমিকা পালন করে।

(৮) মানুষের মর্যাদা ও সম্মান সংরক্ষণে মৌলিক অধিকারসমূহের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

(৯) ভারতীয় রাষ্ট্রব্যবস্থার ধর্মনিরপেক্ষ চেহারা-চরিত্র নিশ্চিত ও নিরাপদ করার ক্ষেত্রে মৌলিক অধিকারসমূহ অপরিহার্য পরিগণিত হয়।

(১০) সমাজের সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী এবং পিছড়ে বর্গের স্বার্থ সংরক্ষণে মৌলিক অধিকারসমূহের ভূমিকার গুরুত্ব বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

মানবাধিকার আন্দোলন (স্বাধীনতার পূর্বে)

ভারতে মানবাধিকার আন্দোলনের সূচনাও ঘটেছিল ব্রিটিশ আমলে। প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে মানবাধিকার আন্দোলন গড়ে উঠেছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের পটভূমিকায়। বাংলার নবজাগরণ যখন থেকে শুরু হয়েছে, অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে যখন শিক্ষার দাবি, বিশেষ করে নারীশিক্ষা এবং তাদের বিরুদ্ধে অমানবিক প্রথার বিরুদ্ধে এবং জাতিবৈষম্যের বিরুদ্ধে দাবি উঠেছিল, তখন থেকেই শুরু হয়েছিল মানবাধিকার আন্দোলন। জাতীয় আন্দোলনের মূল ধারাটির সঙ্গে মিশেছিল মানবাধিকার আন্দোলনের ধারা। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন প্রমাণ করে যে, স্বাধীনতা হল মানুষের অন্যতম মানবাধিকার। জাতীয় আন্দোলনের সময়ে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস মাঝে মাঝেই মানবাধিকার নিয়ে সোচ্চার হয়। ১৯১৮ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে পেশ করার জন্য কংগ্রেস একটি অধিকার সম্বলিত ঘোষণা প্রস্তুত করে। বাক স্বাধীনতা, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, সমাবেশের স্বাধীনতা, আইনানুগ বিচার পাওয়ার স্বাধীনতা, জাতিগত বৈষম্য থেকে মুক্তি প্রভৃতি ছিল অধিকার সম্বলিত ঘোষণার মূল দাবি। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী শাসকরা সেই দাবি উপেক্ষা করেছিল। এরপর ১৯২৮ সালে মোতিলাল নেহেরু কমিটি ভারতীয়দের যেসব অধিকার দেওয়া হত না এরকম কিছু মৌলিক অধিকারের দাবি প্রস্তুত করে। ১৯২৯ সালে সুভাষচন্দ্র বসুর উদ্যোগে 'নিখিল ভারত নিপীড়িত রাজনৈতিক কর্মী দিবস' পালন করা হয়। হিজলী কারাগারের বন্দীদের ওপর পুলিশের গুলি চালানোর প্রতিবাদে ১৯৩১ সালে কলকাতার মনুমেন্টের নীচে অনুষ্ঠিত হয় এক ঐতিহাসিক জনসভা। এতে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ প্রতিবাদী ভাষণ দিয়েছিলেন। ঐ জনসভার মঞ্চ থেকে রাজনৈতিক বন্দীমুক্তি এবং নাগরিক স্বাধীনতার দাবিতে একটি 'নাগরিক কমিটি' গঠন করা হয়। তবে ঐ কমিটি সক্রিয়তার অভাবে ব্যর্থ হয়। ১৯৩১ সালে করাচি কংগ্রেসেরও মৌলিক অধিকারের একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। ১৯৩৬ সালে নরেন্দ্রনাথ বসুর সভাপতিত্বে রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির দাবিতে অবিভক্ত বাংলায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বন্দীমুক্তি কমিটি। এর সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন মৃণাল কান্তি বসু। ঐ বছরই জওহরলাল নেহেরুর উদ্যোগে ভারতে প্রথম মানবাধিকার সংগঠনরূপে 'সারা ভারত পৌর স্বাধীনতা সংঘ' গড়ে উঠেছিল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঐ সংঘের প্রথম সভাপতি হন। ঐ সংগঠনের সম্পাদক ছিলেন কে. বি. মেনন। জাতীয় নেতাদের একটি অংশ এই আন্দোলন যোগ দিয়েছিলেন। পুলিশি অত্যাচার, রাজনৈতিক বন্দীদের ওপর নিপীড়ন, রাজনৈতিক ও গণসংগঠনগুলির ওপর সরকারী নিষেধাজ্ঞা, বিনা বিচারে আটক প্রভৃতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদী আন্দোলন সংগঠিত করা এবং গণসচেতনতা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ঐ সংঘ ঐকান্তিকভাবে প্রচেষ্টা চালিয়েছিল। ১৯৪০ এর দশকে বিভিন্ন সম্প্রদায় ও গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক অধিকার সংরক্ষণেরও দাবি তোলা হয়।

প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে মানবাধিকারের জন্য যে আন্দোলন হয়েছে তা অনেক ক্ষেত্রে ব্যাপক ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের মধ্যে মিশে যায়। রাউলাট বিল বিরোধী আন্দোলন, জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ, সাইমন কমিশন বয়কট আন্দোলন ইত্যাদি ছিল একাধারে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন ও মানবাধিকার আন্দোলন। ১৯৩০ দশকে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ ও কমিউনিস্ট আন্দোলন কংগ্রেস দ্বারা পরিচালিত আন্দোলনের অংশীদার ছিল না। কিন্তু মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে তারা প্রতিবাদ করেছিল। মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে যে সব আন্দোলন প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে ঘটেছে তাতে সাধারণ মানুষের ব্যাপক সমর্থন ছিল।[১৭] ১৯৩৮ সালে ও পরবর্তীকালে মানবাধিকার আন্দোলনের বিষয় ছিল বন্দীমুক্তি। বন্দীমুক্তি নিয়ে তখন ব্যাপক আন্দোলন গড়ে ওঠে। এই আন্দোলন কমিউনিস্ট পার্টিও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে।

---

১৭. বীরেন রায়, মানবাধিকার আন্দোলন, শুভেন্দু দাশগুপ্ত, প্রসঙ্গ মানবাধিকার এর মধ্যে, পৃষ্ঠা ৯৬।

Scanned with CamScanner

১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট ভারত স্বাধীন হয়। যারা এতদিন ধরে সরকারের সমালোচনা করার, সরকারের বিরোধিতা করার অধিকার দাবি করে এসেছিলেন, তাঁদের অনেকেই এবার দেশ শাসনের সুযোগ পেলেন। দেশের প্রধানমন্ত্রী হলেন জওহরলাল নেহরু। কিন্তু ক্ষমতায় এসে তিনি মানবাধিকার ও নাগরিক অধিকার সুরক্ষিত করার ব্যাপারে চূড়ান্ত নিস্পৃহতা দেখালেন। পরের অধ্যায়ে আমরা দেখব যে, স্বাধীন ভারতের শাসকরা স্বাধীনতা উত্তর ভারতে মানবাধিকার লঙ্ঘনকারী অগণতান্ত্রিক বিভিন্ন 'কালাকানুন' বা Black Act-এর ওপর কতটা নির্ভর করেছেন।

১৯৪৮ সালের জুলাই মাসে কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। কমিউনিস্ট পার্টি সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পথ নেওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে দেশ জুড়ে কমিউনিস্ট কর্মীদের ওপর চরম রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন চালানো হয়। পশ্চিমবঙ্গে কমিউনিস্ট অভ্যুত্থান দমন করার তাগিদে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস তীব্র রূপ নেয়। রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের প্রতিবাদে সরব হয়েছিলেন বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহা, আইনজীবী শরৎচন্দ্র বোস, বুদ্ধিজীবী ক্ষিতিপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের মতো ব্যক্তিত্বরা। তাঁদের উদ্যোগে ১৯৪৮ সালে পশ্চিমবঙ্গে 'সিভিল লিবার্টিস কমিটি' (Civil Liberties Committee) নামে একটি মানবাধিকার সংগঠন গড়ে ওঠে। ১৯৪৯ সালের ১৬ ও ১৭ জুলাই মাদ্রাজে নাগরিক অধিকার সম্মেলন (Civil Liberties

Scanned with CamScanner

Conference) অনুষ্ঠিত হয়। ভারতবাসীর মধ্যে মানবাধিকার ও নাগরিক অধিকার সংক্রান্ত সচেতনতা গড়ে তোলার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে এই সম্মেলন। এই সম্মেলনকে সফল করার ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন এ. কে. পিল্লাই, কৃষ্ণমূর্তি প্রমুখ।

তারপর দীর্ঘদিন ভারতীয়দের তরফ থেকে মানবাধিকার ও নাগরিক অধিকার সংক্রান্ত বিষয়ে উল্লেখযোগ্য কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। এই সময় রাষ্ট্রীয় নীতি যখন মানুষের অধিকারে হস্তক্ষেপ করেছে, প্রতিবাদ উঠে এসেছিল মূলত বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি থেকে।

১৯৬৭ সালে নকশালবাড়ির কৃষক অভ্যুত্থানকে কেন্দ্র করে উত্তাল হয়ে ওঠে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি। এই অভ্যুত্থানের ঢেউ নানাস্তরের মানুষকে স্পর্শ করেছিল। শুরু হয়েছিল ছাত্র ও যুবকদের প্রতিষ্ঠান বিরোধী বিদ্রোহ। নকশালপন্থীদের দমন করার জন্য রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস মারাত্মক হয়ে উঠেছিল পশ্চিমবঙ্গে। পুলিশ হেফাজতে মৃত্যু, ভুয়ো সংঘর্ষে হত্যা, বেআইনি আটক, জেলখানায় নিরস্ত্র রাজবন্দিদের ওপর আক্রমণ ১৯৭০-এর দশকের গোড়ার দিনগুলিতে দৈনন্দিন ঘটনায় পরিণত হয়েছিল। মানবাধিকার লঙ্ঘনের প্রতিবাদে এগিয়ে আসেন প্রমোদ সেনগুপ্ত, কপিল ভট্টাচার্য, ড. অমিয় বোস প্রমুখ বিবেকবান মানুষ। তাঁদের উদ্যোগে ১৯৭২ সালের ২৫ জুন জন্ম নেয় পশ্চিমবঙ্গের বৃহত্তম ও সবচেয়ে সক্রিয় মানবাধিকার সংগঠন 'গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি' বা Association for Protection of Democratic Rights (APDR)।

নকশালবাড়ির কৃষক অভ্যুত্থানের অনুসরণে অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীকাকুলাম অঞ্চলেও শুরু হয় জঙ্গি কৃষক বিদ্রোহ। এই বিদ্রোহকে কেন্দ্র করে অন্ধ্রের গণআন্দোলনও তীব্র রূপ নিয়েছিল। গণআন্দোলন দমন করার জন্য অন্ধ্রপ্রদেশেও নেমে এসেছিল নিষ্ঠুর রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস। রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে 'অন্ধ্রপ্রদেশ সিভিল লিবার্টিস কমিটি' নামে একটি মানবাধিকার সংগঠন গড়ে উঠেছিল ১৯৭৪ সালে। শ্রী শ্রী, চেরবান্দা রাজু প্রভৃতি প্রগতিশীল তেলেগু সাহিত্যিকরা এই সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হন।

১৯৭৫ সালের ২৬ জুন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধি ভারতে অভ্যন্তরীণ জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেন। জরুরি অবস্থার সময় একাধিক রাজনৈতিক সংগঠনকে নিষিদ্ধ করা হয়, সভা-সমিতি করার অধিকার হরণ করা হয়। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ করা হয়, প্রশাসনের তরফে বিচার বিভাগে হস্তক্ষেপ করা হয় এবং

Scanned with CamScanner

শাসকদলের বিরোধী মতাদর্শে বিশ্বাসী বহু নাগরিককে বিনাবিচারে আটক রাখা হয়। বিভিন্ন স্তরের মানুষ নাগরিক ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদ করেন। গণতান্ত্রিক অধিকার লঙ্ঘনকারী কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে জরুরি অবস্থার সময় জেহাদ ঘোষণা করেছিলেন সর্বোদয় নেতা জয়প্রকাশ নারায়ণ। আর এই সময় প্রতিবাদী মানবাধিকার সংগঠন হিসাবে সবচেয়ে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিল পশ্চিমবঙ্গের গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি বা এ.পি.ডি. আর.। ১৯৭৫ সালের ৫ আগস্ট সরকার এ.পি.ডি.আর.-কে বেআইনি সংগঠন হিসাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। তা সত্ত্বেও সমিতি গোপনে *ভারতীয় গণতন্ত্রের স্বরূপ* নামে একটি বিস্তৃত প্রতিবেদন প্রকাশ করে। এই প্রতিবেদনে সরকারের অগণতান্ত্রিক কার্যকলাপ ও মানবাধিকার লঙ্ঘনকারী ভূমিকার প্রকৃত স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হয়েছিল। আজও পশ্চিমবঙ্গে গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি একটি অত্যন্ত সক্রিয় সংগঠন। রাজনৈতিক বন্দিদের ওপর আক্রমণ, বন্দিদের ওপর দৈহিক অত্যাচার, পুলিশ হেফাজতে বা জেলে মৃত্যু, মৃত্যুদণ্ড ইত্যাদি মানবাধিকার লঙ্ঘনকারী যে কোনো ঘটনার বিরুদ্ধেই প্রতিবাদে অগ্রণী ভূমিকা নেয় গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি। সাম্প্রতিক অতীতে গড়ে ওঠা আর একটি মানবাধিকার সংগঠন 'মানবাধিকার সুরক্ষা মঞ্চ'ও পশ্চিমবঙ্গে মানবাধিকার রক্ষার বিভিন্ন বিষয়ে সক্রিয় হয়েছে।

Scanned with CamScanner

১৯৭৭ সালে কেন্দ্রে ও বিভিন্ন রাজ্যে অকংগ্রেসী সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রাধান্য বিস্তারকারী দলব্যবস্থার পরিবর্তন হয়। কিন্তু মানবাধিকার লঙ্ঘনের ব্যাপারে বামপন্থী দলগুলির এযাবৎকালে যে সহানুভূতিসম্পন্ন দৃষ্টিভঙ্গি ছিল তার পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। তারা অনেকটা নিস্পৃহ হয়ে থাকে।[১৮] বর্তমানে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ দমনের নামে বহু ক্ষেত্রে যে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস সৃষ্টি করা হয়েছে এবং হচ্ছে, তার ফলে ভারতীয় জনগণের মানবাধিকার বিপন্ন হয়ে পড়ছে বলে বিভিন্ন মানবাধিকার রক্ষা কমিটি ও ফোরামগুলি অভিযোগ তুলেছে। তবে একথাও ঠিক যে ভারতের বিভিন্ন সন্ত্রাসবাদী ও বিচ্ছিন্নতাবাদী কার্যকলাপও মানবাধিকারের পরিপন্থী। সাম্প্রতিককালে নারীবাদীরা নারীদের স্বমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন গণসংগঠন গড়ে তুলেছেন। ভারতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় এবং তফশিলী জাতি ও উপজাতিগুলিও বর্তমানে তাদের অধিকার সম্পর্কে অনেক সচেতন হয়ে উঠেছে। মানবাধিকার আন্দোলনকে সফল করে তুলতে গেলে সাধারণ মানুষকে তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে হবে এবং তাদের এই আন্দোলনে টেনে আনতে হবে।

Scanned with CamScanner

MDC
Human Rights

Topic: পরিবেশ আন্দোলন

পরিবেশ আন্দোলন

সাম্প্রতিক সময়ে পরিবেশ আন্দোলন-কে একটি অন্যতম 'নব্য সামাজিক আন্দোলন' হিসাবে গণ্য করা হয় বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে এবং আমাদের দেশে। ভারতের পরিবেশ আন্দোলনের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হোল পরিবেশের অবনমন ও দূষন রোধ করা, মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে সুসামঞ্জস্য স্থাপন, প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ ব্যবহার

Scanned with CamScanner

নিশ্চিত করা এবং দীর্ঘস্থায়ী', 'টেকসই উন্নয়ন গড়ে তোলা। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো ভারতেও আজ পরিবেশগত নানা সমস্যা গুরুতর আকার ধারণ করেছে। সেইসব সমস্যা নিরসনের লক্ষ্যেই ১৯৭০-এর দশক থেকে আমাদের দেশে শুরু হয় একাধিক পরিবেশ আন্দোলন।

প্রকৃতপক্ষে বিশ্ব জুড়েই ১৯৭০ এর গোড়া থেকে মানুষের মধ্যে পরিবেশগত সচেতনতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্য পূরণের তাগিদে প্রাকৃতিক সম্পদের বহুল ব্যবহার ও তার ফলে প্রাকৃতিক পরিবেশের ওপর তার নঞর্থক প্রভাব ক্রমশ লক্ষিত হতে থাকে। এ বিষয়ে প্রথম সাড়া জাগায় ১৯৬২ সালে প্রকাশিত মার্কিন জীববিজ্ঞানী Rachel Carson লিখিত গ্রন্থ *Silent Spring*। আঙুর ক্ষেতগুলিতে অধিক ফলনের জন্য কীভাবে নির্বিচারে DDT নামে এক কীটনাশক ব্যবহার করা হচ্ছিল, এবং তার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিল জমির উর্বরতা, বাস্তুতন্ত্র ও মানুষের স্বাস্থ্য, তার বিশদ ব্যাখ্যা তিনি তুলে ধরেন এই গ্রন্থে। ঐ একই বছরে (১৯৬২) গঠিত হয় 'Club of Rome' ও পরবর্তী সময়ে অন্যান্য পরিবেশবাদী সংঘ ও প্রতিষ্ঠান। ১৯৭০-এর দশকে ক্রমশ বৃদ্ধি পায় পরিবেশগত সচেতনতা ও বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে – আমাদের দেশেও – সংঘঠিত হতে থাকে বিভিন্ন পরিবেশগত আন্দোলন। পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধি এবং পরিবেশ অবনমন ও পরিবেশ দূষণ রোধের প্রয়াসে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয় সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ। ১৯৭২ সালে সুইডেনের রাজধানী স্টকহোম শহরে জাতিপুঞ্জ-এর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় প্রথম বিশ্ব বসুন্ধরা সম্মেলন – The Stockholm Conference on Environment and Development। এই ধারা অনুসরণ করে পরবর্তী দশকগুলিতেও হয়েছে একাধিক শীর্ষ সম্মেলন – যেমন, ১৯৯২ সালের রিও বসুন্ধরা সম্মেলন, ২০০২ সালের জোহানেসবার্গ সম্মেলন ইত্যাদি।

ভারতেও গত শতাব্দীর সাতের দশক থেকে শুরু হয় একাধিক পরিবেশ আন্দোলন। ১৯৬০-এর শেষ ভাগ থেকেই আমাদের দেশে প্রাকৃতিক পরিবেশের ওপর তথাকথিত 'উন্নয়ন প্রক্রিয়ার নেতিবাচক প্রভাব লক্ষিত হতে থাকে। প্রাকৃতিক সম্পদের যথেচ্ছ ব্যবহার ডেকে আনে পরিবেশ অবনমন ও দূষনের সমস্যা। এর বিরুদ্ধেই দানা বাঁধতে থাকে পরিবেশ সংক্রান্ত ভাবনা-চিন্তা ও পরিবেশ আন্দোলন। তবে পরিবেশগত সমস্যা কিন্তু স্থান পায়নি রাজনীতির মূলস্রোতে থাকা রাজনৈতিক দলগুলির কর্মসূচীতে। পরিবেশ' কখনোই তাদের আন্দোলনের বিষয় হয়ে ওঠে নি। পরিবেশের দ্রুত অবনমনের ফলে মানুষ হারাচ্ছিল তাদের পরিবেশের অধিকার' (Right to Environment)। এই অধিকার সুরক্ষিত করতে শুরু হয় প্রতিবাদ, প্রতিরোধ, আন্দোলন। তবে, তা রাজনৈতিক দলগুলির ছত্রছায়ায় নয়। বিভিন্ন গোষ্ঠী, সংগঠন প্রভৃতির উদ্যোগে ও নেতৃত্বে। পরিবেশ আন্দোলন শুরু হয় ও বিস্তার লাভ করতে থাকে 'অ-দলীয় রাজনৈতিক প্রক্রিয়া (non-party political process) হিসাবে। নব্য সামাজিক আন্দোলনের যা কিনা একটি অন্যতম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। ভারতে পরিবেশ আন্দোলন-কে বুঝতে হবে এই নব্য আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে।

Scanned with CamScanner

ভারতে পরিবেশ আন্দোলন তুলে ধরেছে বিভিন্ন বিষয়কে, যেগুলি সবই কোনও না কোনও ভাবে মানুষের পরিবেশের অধিকার-এর সঙ্গে সম্পর্কিত। কিছু আন্দোলন চেষ্টা করে প্রাকৃতিক সম্পদকে – জল, জমি, বনাঞ্চল, শস্য বীজ – যথেচ্ছ ব্যবহার-এর গ্রাস থেকে রক্ষা করতে। কোনও আন্দোলন প্রতিরোধ ও প্রতিবাদ-এর আন্দোলন – যেমন, বড় বাঁধ, জলবিদ্যুৎ প্রকল্প, খনিজ সম্পদ ও সমুদ্র সম্পদের নির্বিচার শোষণ – এ সবের বিরুদ্ধে আন্দোলন। কারণ এইসব কর্মকাণ্ডের ফলে এক বিশাল সংখ্যক মানুষ বাস্তুচ্যুত হয় ও হারায় তাদের জীবন ও জীবিকা। আবার, কিছু আন্দোলনের লক্ষ্য হোল 'উন্নয়ন'-এর নানা কুফল যেমন, পরিবেশ দূষণ, সামাজিক ব্যাধি ইত্যাদির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো। আমাদের দেশে এই নানাবিধ পরিবেশ আন্দোলন সংগঠিত হয়ে থাকে একাধিক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ও গোষ্ঠীর উদ্যোগে। এক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এই নিবন্ধের পরবর্তী অংশে আমরা ভারতের কয়েকটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য পরিবেশ আন্দোলন সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব।

সাইলেন্ট ভ্যালি আন্দোলন

স্বাধীনতা-উত্তর ভারতে এটি একদম গোড়ার দিকের একটি পরিবেশ আন্দোলন। ১৯৭০ সালে কেরালায় এই আন্দোলন গড়ে ওঠে। বাস্তুতান্ত্রিক দিক থেকে সমৃদ্ধ সাইলেন্ট ভ্যালি অঞ্চলে কুন্তী নদীর ওপরে জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের নির্মাণকে কেন্দ্র করে এই আন্দোলনের সূত্রপাত। এই উপত্যকাটি চারিদিকে পরিবৃত নীলগিরি, নীলাম্বুর ও আত্তাপপাড়ি বনাঞ্চল দ্বারা, যার মোট আয়তন ৪০,০০০ হেক্টর। জীববৈচিত্র্যে অত্যন্ত সমৃদ্ধ এই উপত্যকা ও বনাঞ্চল। উদ্দিষ্ট বিদ্যুৎ প্রকল্প-র জন্য প্রযুক্তিগত পরীক্ষা নিরীক্ষা চালানো হয় ১৯৫৮ সালে এবং প্রাথমিক নির্মাণ কার্য শুরু হয় ১৯৭০ সালে। যদিও, অর্থাভাবের কারণে মাঝপথে বন্ধ হয়ে যায় কাজ। তিন বছর পরে National Committee on Environmental Planning and Coordination-এর উদ্যোগে গঠিত একটি Task Force পশ্চিমঘাট পর্বতমালার ঐ অঞ্চলে প্রকল্পটির কারণে সম্ভাব্য পরিবেশগত ও বাস্তুতান্ত্রিক সমস্যার ওপরে একটি সমীক্ষা করে। সমীক্ষার রিপোর্টে ভয়াবহ পরিণতির কথা উল্লেখ করা হয়। পরিবেশবিদরা আতঙ্কিত হয়ে পড়েন যে, প্রস্তাবিত বিদ্যুৎ প্রকল্পটি নির্মিত হলে, তা ঐ অঞ্চলের একটি প্রাচীনতম ক্রান্তীয় বনাঞ্চল (tropical forests) – যা কিনা জীববৈচিত্র্যে অতি সমৃদ্ধ – ধ্বংসের অন্যতম কারণ হয়ে উঠবে। তারা আরও একটি বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন – একটি বিপন্ন প্রজাতির বানর - lion tailed macaque – ক্রমশ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে ঐ বনাঞ্চল থেকে জীববৈচিত্র্যের ক্ষতি হওয়ার ফলে।

এই সবের বিরুদ্ধেই ১৯৭৮ সালের জানুয়ারি মাসে সাইলেন্ট ভ্যালি আন্দোলন শুরু হয় Kerala Sastra Sahitya Parishad (KSSP) নামক সংগঠনের নেতৃত্বে। বিদ্যুৎ প্রকল্পটি নির্মাণের বিরুদ্ধে গণস্বাক্ষর অভিযান শুরু হয়। প্রায় ছয়শো-র কাছাকাছি ছাত্রছাত্রী, শিক্ষাবিদ, সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সই সম্বলিত প্রতিবাদ পত্র পাঠানো হয় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী-কে উদ্দেশ্য করে। সংগৃহীত তথ্যের উপর ভিত্তি করে

Scanned with CamScanner

KSSP এই যুক্তি পেশ করে যে, প্রস্তাবিত প্রকল্পটি কেবলমাত্র আংশিক ভাবে রাজ্যের বিদ্যুতে চাহিদা মেটাতে সক্ষম হবে। কিন্তু তার জন্য পরিবেশগত মাশুল গুণতে হবে অনেক বেশি। কারণ ঐ উপত্যকার বিস্তীর্ণ অঞ্চলের পরিবেশগত ভারসাম্য বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হবে। আন্দোলনকারীরা এই বিষয়টিও তুলে ধরেন যে, নদীর বুকে বাঁধ নির্মাণ না করেও, অন্য উপায়েও ঐ অঞ্চলের বিদ্যুতে চাহিদা মেটানো সম্ভব।

সাইলেন্ট ভ্যালি আন্দোলন-এর জনভিত্তি ক্রমশ বিস্তৃত হতে থাকে। নাগরিক সমাজের বিভিন্ন সংগঠন – দেশের ও বিদেশের — এই আন্দোলনের সমর্থনে এগিয়ে আসে। যদিও, দেশের প্রায় সব রাজনৈতিক দলগুলিই ছিল প্রস্তাবিত প্রকল্পটির পক্ষে, এবং রাজ্য সরকারের মনোভাবও ছিল অনড়।

তারা এমনকি ব্যঙ্গের ছলে একথাও বলতে শুরু করে যে, এই আন্দোলনের লক্ষ্য হচ্ছে মানুষের ওপরে বানর-কে স্থান দেওয়া' – "monkey over man mission"। যাই হোক, আন্দোলনের তীব্রতা ক্রমশ বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে শেষ পর্যন্ত প্রকল্পটি বন্ধ করে দেওয়া হয় ১৯৮৪ সালে এবং সাইলেন্ট ভ্যালি-কে ঘোষণা করা হয় একটি জাতীয় উদ্যান (National Park) হিসাবে।

চিপকো আন্দোলন

১৯৭০-এর দশকেই এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পরিবেশ আন্দোলনটি সংগঠিত হয় হিমালয়ের গাড়োয়াল ও কুমায়ুন-এ (বর্তমানের উত্তরাখণ্ড)। চিপকো' শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ – 'দুই হাতে জড়িয়ে ধরা' (hugging or embracing)। উপরোক্ত অঞ্চলের গ্রামবাসীরা অরণ্যের গাছগুলিকে দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে সেগুলিকে কেটে ফেলার থেকে রক্ষা করে। সেই ঘটনা থেকেই এই আন্দোলনের নাম হয় চিপকো আন্দোলন।

বড় বড় কাঠ ব্যবসায়ীদেরও অন্যান্য কায়েমি গোষ্ঠীর বাণিজ্যিক স্বার্থ রক্ষার তাগিদে ঐ অঞ্চলের বিস্তৃত ও সমৃদ্ধ বনাঞ্চলে নির্বিচারে চলছিল বৃক্ষছেদন। যার কুপ্রভাব বিশেষভাবে অনুভূত হচ্ছিল এলাকার বাস্তুতন্ত্র, অর্থনীতি ও পাহাড়ে বসবাসকারী মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায়। এর বিরোধিতা করেই গড়ে ওঠে চিপকো আন্দোলন। গোপেশ্বর, তেহরি, চামোলি ও নরেন্দ্রনগর এলাকাগুলি ছিল এই আন্দোলনের মূল কেন্দ্রবিন্দু। ১৯৭০-এর শেষভাগে আন্দোলন তার শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছায়।

চিপকো আন্দোলনের প্রধান কারণ ছিল স্থানীয় অধিবাসী ও সরকার নিযুক্ত বহিরাগত ঠিকাদারদের মধ্যে অরণ্য সম্পদের অধিকার ও ব্যবহার নিয়ে সংঘাত। ১৯৬০-এর দশক থেকে চামোলি জেলায় Dasuauli Gram Swaraj Sangha নামে একটি সমবায় সমিতি গঠিত হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল স্থানীয় যুবকদের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা। ১৯৭০ এর গোড়ায় এই সমিতি দাবি জানায় যে অরণ্য সম্পদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে স্থানীয় ক্ষুদ্র শিল্প সংস্থাগুলিকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। সরকার সেই দাবি মানে না। আন্দোলনকারীরা তখন সংগ্রামী গণসমর্থন ও অভ্যুত্থানের প্রস্তুতি নেয়। রাষ্ট্র

Scanned with CamScanner

কঠোরভাবে তা দমন করতে বদ্ধপরিকর হয়। সরকারের তরফ থেকে নতুনভাবে বিস্তীর্ণ বনাঞ্চল লিজ দিয়ে দেওয়া হয় বহিরাগত কোম্পানিদের এবং তাদের অনুমতি দেওয়া হয় বৃক্ষছেদনের। গ্রামবাসীরা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে সরকারি এই পদক্ষেপে। গোপেশ্বর-এর মন্ডল বনভূমিতে তারা সিদ্ধান্ত নেয় গাছগুলিকে দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে তাদের বৃক্ষ নিধনকারীদের কুঠারঘাত থেকে রক্ষা করার। এইভাবেই 'চিপকো' শুরু হয়। তীব্র জন প্রতিরোধের ফলে ক্রমশ প্রশাসন ও কোম্পানিগুলি পিছু হটতে বাধ্য হয়। রেনি গ্রামে গ্রামীণ মহিলারা বনের গাছগুলিকে রক্ষা করার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। গৌরা দেবী নামে এক সাধারণ মহিলা এই প্রতিরোধের নেতৃত্ব দেন, যিনি পরবর্তী সময়ে হয়ে ওঠেন চিপকো আন্দোলনে মহিলাদের ক্ষমতায়নের অন্যতম প্রতীক।

গণ প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়ে রাজ্য সরকার তাৎক্ষণিক কতগুলি সন্তোষজনক প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করে। কিন্তু বাস্তবে তার প্রায় কোনওটিই রক্ষিত ও কার্যকরী হয় না। আন্দোলন ধীরে ধীরে অন্যান্য অঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়ে। রাজ্য বনদপ্তর একটি বড় ধরনের পরিকল্পনা গ্রহণ করে বাদিয়ারগড় অঞ্চলের অরণ্যে বৃক্ষছেদনের। এই খবর ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথেই আন্দোলন আরও তীব্র আকার ধারণ করে। গান্ধীবাদী পরিবেশবিদ সুন্দরলাল বহুগুণা সরকারি সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে ১৯৭৯ সালের ৯ জানুয়ারি থেকে আমরণ অনশন শুরু করেন। শত সহস্র মানুষ ক্রমে তার সমর্থনে সংগঠিত হতে থাকে। সরকার বহুগুণা এবং তার কিছু সমর্থকদের গ্রেপ্তার করে। সরকারি এই পদক্ষেপ আরও বেশি ইন্ধন জোগায় চিপকো আন্দোলনকে। শেষ অবধি সরকার ও বহিরাগত ঠিকাদারেরা পিছু হটতে বাধ্য হয়। বহুগুণা ও তার সমর্থকদের মুক্তি দেওয়া হয়। গাড়োয়াল ও কুমায়নের পাহাড়ি অঞ্চলে একটি নির্দিষ্ট উচ্চতার উপরের অংশের বনাঞ্চলে বৃক্ষছেদনের ওপর সরকারি নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়।

চিপকো আন্দোলন পরবর্তীকালে হয়ে দাঁড়ায় ভারতীয় পরিবেশবাদ-এর (Indian Environmentalism) এর অন্যতম প্রতীক। এই আন্দোলন অনুপ্রাণিত করেছিল দেশের বিভিন্ন প্রান্তে অন্যান্য সমধর্মী আন্দোলনকে। চিপকো কোনও হঠাৎ করে গজিয়ে ওঠা বা বিচ্ছিন্ন আন্দোলন ছিল না। গাড়োয়াল কুমায়ুন অঞ্চলের কৃষকদের ছিল তাদের অধিকার রক্ষার জন্য সংগ্রামের এক দীর্ঘ ঐতিহ্য – ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে এবং স্বাধীনতা-উত্তর ভারতে রাজনৈতিক ক্ষমতাশালীদের বিরুদ্ধে। চিপকো আন্দোলন তাই এক দীর্ঘ সংগ্রামী ঐতিহ্যেরই ফসল। এই আন্দোলন বিপুল জনসমর্থন জোগাড় করতে সক্ষম হয়েছিল কারণ তা খুব কার্যকরী ভাবে ব্যবহার করতে পেরেছিল সনাতনি ও চিরাচরিত কিছু আন্দোলন পদ্ধতি – যেমন সত্যাগ্রহ, পদযাত্রা, গীতার শ্লোক আবৃত্তি, অনশন, রাখীবন্ধন ইত্যাদি। একই সাথে চিপকো হয়ে উঠেছিল বিভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শের সমন্বয়ের অন্যতম উদাহরণ।

Scanned with CamScanner

নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন

ভারতে পরিবেশ আন্দোলনগুলির মধ্যে এটি একটি অন্যতম দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলন, যা শুরু হয়েছিল নর্মদা নদীর ওপর বাঁধ নির্মাণের বিরোধিতা করে। নর্মদা নদীর উৎস মধ্যপ্রদেশের অমরকন্টক-এ। প্রায় ১৩০০ কি.মি. পথ পাড়ি দিয়ে, মহারাষ্ট্র রাজ্য-কে ছুঁয়ে নর্মদা আরব সাগরে গিয়ে মিশেছে গুজরাটের প্রান্তে। আনুমানিক ২৫ মিলিয়ন মানুষের বসবাস এই নদীর অববাহিকায়। যারা বেশিরভাগই জীবন ধারণের জন্য নির্ভর করে থাকে এই নদীসম্পদ ও তার চারপাশের বনসম্পদের ওপর। ১৯৪০-এর দশকের শেষভাগেই রাষ্ট্র পরিকল্পনা গ্রহণ করে নর্মদা নদীর ওপর একাধিক বাঁধ নির্মাণের – ৩০ টি বড়, ১৩৫ টি মাঝারি ও ৩০০০ টি ছোট বাঁধ তৈরির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সরকারের তরফে যুক্তি দেখানো হয় যে এই প্রকল্প বহুল পরিমাণে জল সরবরাহ ও বিদ্যুৎ উৎপাদনে সক্ষম হবে। যা কিনা উন্নয়ন-এর জন্য একান্ত জরুরী। প্রকল্পটির সরকারি নামকরণ হয় The Narmada Valley Development Project। এটিই এখনও পর্যন্ত আমাদের দেশের সবচেয়ে বড় ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী নদী-উপত্যকা প্রকল্প। এই প্রকল্পে আজ অবধি কিছু বাঁধ নির্মিত হয়েছে। কিছুর নির্মাণকার্য চলছে, আর কিছু বাঁধের কাজ এখনও শুরু হয়নি।

স্বাধীনতা-উত্তর ভারতে 'উন্নয়ন'-এর যে মডেল অনুসরণ করা হোল – যা নেহরু-মহলানবিশ মডেল' নামে সুপরিচিত – তাতে বড় বাঁধ নির্মাণ-কে গণ্য করা হোল উন্নয়নের অন্যতম প্রধান সূচক ও মাইলফলক হিসাবে। নেহেরু স্বয়ং তাদের আখ্যায়িত করলেন "temples of modern India" নামে। যদিও, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এই ধরনের বড় নদীবাঁধ প্রকল্পগুলি সরকার ঘোষিত লক্ষ্যের যথার্থতা পূরণ করতে ব্যর্থ হয়। বরং সেগুলি সৃষ্টি করে প্রাকৃতিক পরিবেশের ওপর নানা কুপ্রভাব। লক্ষাধিক মানুষ হয় বাস্তুহারা, হারায় তাদের জীবন ও জীবিকা। সবথেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয় গ্রামীণ ও বনাঞ্চলে বসবাসকারী দরিদ্র আদিবাসী মানুষেরা। এই কারণে, আমাদের দেশে পরিবেশবাদীরা দীর্ঘদীন ধরেই বড় বাঁধ নির্মাণের বিরুদ্ধে কোনও না কোনও ধরণের প্রতিবাদ ও প্রতিরোধে সামিল হয়েছেন। নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন সেগুলির মধ্যে সর্বাধিক পরিচিত ও বিতর্কিত।

নর্মদা নদীর ওপর যে ৩০টি বড় বাঁধ তৈরির পরিকল্পনা করা হয়, তার মধ্যে বৃহত্তম প্রকল্পটি হোল Sardar Sarobar Project। এই সর্দার সরোবর বাঁধটির প্রস্তাবিত উচ্চতা ১৩৬.৫ মিটার (৪৫৫ ফিট)। সরকারের তরফে দাবি করা হয় যে এই প্রকল্পটি গড়ে তোলা একান্ত প্রয়োজনীয় কারণ, এর ফলে গুজরাটের (এবং আংশিকভাবে রাজস্থানের) খরাপ্রবণ এলাকায় চাষের জন্য জল সরবরাহ, জলবিদ্যুৎ উৎপাদন, এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণ সম্ভবপর হবে। অর্থাৎ, ঐ দুটি রাজ্যের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য প্রকল্পটি আবশ্যিক।

এই বড় বাঁধটি নির্মাণের বিরোধিতা করেই ১৯৮৬ সালে মেধা পাটেকর-এর নেতৃত্বে গড়ে ওঠে নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন। আন্দোলনকারীরা সরকারের তথাকথিত

Scanned with CamScanner

'উন্নয়ন'-এর দাবি-কে নাকচ করেন সেগুলির অসারতা নির্দেশ করে। তারা বলেন, সরকারি বক্তব্য অতিরঞ্জিত এবং তা কখনওই বাস্তবায়িত করা সম্ভব নয়। প্রকৃতপক্ষে এই প্রকল্পটি রূপায়িত হলে তা ৩২০,০০০-এরও বেশি মানুষকে বাস্তুচ্যুত করবে এবং কেড়ে নেবে বহু মানুষের জীবন ও জীবিকা। এই বহুল পরিমাণ মানুষের উচ্ছেদের আশঙ্কায়, নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন গোড়ার দিকে প্রচার শুরু করে উচ্ছেদ হওয়া মানুষদের যথাযথ পুনর্বাসনের দাবিতে। যদিও শীঘ্রই তারা বুঝতে পারে যে সরকার যে 'জমির বদলে জমি' (land-for-land) পুনর্বাসনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, তা প্রকৃতপক্ষে অবাস্তব। ফলে এই আন্দোলনের চরিত্র ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হতে থাকে একটি বড়-বাঁধ বিরোধী আন্দোলন রূপে। আন্দোলনকারীদের বক্তব্য ছিল যে প্রকল্পটি ঐ অঞ্চলের ভূ-গর্ভস্থ জলের উৎস এবং ভূকম্পন সংক্রান্ত সঠিক জ্ঞানের ওপর নির্ভর করে গড়ে ওঠে নি। উপরন্তু এই বাঁধ নির্মাণের ফলে এক বিপুল সংখ্যক মানুষের মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে। আন্দোলন এই দৃষ্টান্তও তুলে ধরে যে ভারতে একাধিক বড়-বাঁধ প্রকল্প ব্যর্থ হয়েছে এবং সর্দার সরোবর প্রকল্পেরও সাফল্যের সম্ভাবনা নেই। প্রকল্পটি রচনা ও রূপায়ণ করা হয়েছে অগণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে - কারণ সাধারণ মানুষকে জানানো হয়নি প্রকল্পটির বিশদ বিবরণ এবং পরিকল্পনা ও রূপায়ণের কোনও স্তরেই জনগণের অংশগ্রহণ-কে নিশ্চিত করার কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ওপর আলোকপাত করে – প্রথম, আদৌ এই ধরনের কোনও বড় বাঁধ নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা; দ্বিতীয়, যথাযথ পুনর্বাসনের ব্যবস্থা এবং তৃতীয়, উন্নয়নের এক বিকল্প মডেলের অনুসন্ধান, যা হবে অনেক বেশি পরিবেশ বান্ধব।

নর্মদা বাঁচাও আন্দোলনের ওপর নেমে আসে কঠোর পুলিশি দমন পীড়ন। ১৯৯০-৯১ সময়কাল ব্যাপী আন্দোলনকারীরা গড়ে তোলে নানা প্রতিরোধ ও প্রতিবাদ। ধর্ণা, সত্যাগ্রহ, সড়ক অবরোধ, মিছিল, সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও আন্তর্জাতিক সংগঠনের কাছে স্মারকলিপি পেশ প্রভৃতির মাধ্যমে বাস্তুচ্যুত মানুষদের দুর্দশা ও সর্দার সরোবর প্রকল্পের অসাড়তা তুলে ধরা হয়। ক্রমবর্ধমান জনমতের চাপে বিশ্ব ব্যাঙ্ক (এই প্রকল্পে অর্থসাহায্যকারী সংস্থা) বাধ্য হয় একটি নিরপেক্ষ রিভিউ কমিটি গঠন করতে প্রকল্পটির খুঁটিনাটি পর্যালোচনার জন্য এবং কার্যত সহমত প্রকাশ করে আন্দোলনের মূল দাবিগুলির সঙ্গে। এই আন্দোলনের তিন দশকেরও বেশি সময়ের ইতিহাস অনুসন্ধান করলে দেখা যায় আন্দোলনটি কেবলমাত্র কিছু আংশিক ও সাময়িক সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। গুজরাতে একাধিক রাজ্য সরকার তাদের রাজনৈতিক মতাদর্শ নির্বিশেষে এই আন্দোলনের বিরোধিতা করে। আমাদের দেশের সবকটি প্রধান রাজনৈতিক দল-ই আন্দোলনের বিপক্ষে অবস্থান গ্রহণ করে। আন্দোলনের প্রাথমিক পর্যায়ে আদালতের তরফ থেকে আন্দোলনকারীদের পক্ষে সুবিধাজনক কিছু রায়দান করা হয়, এবং সাময়িকভাবে বাঁধ নির্মাণ-এর ওপর স্থগিতাদেশ জারি হয়। কিন্তু পরবর্তী সময়ে বিচার বিভাগের অবস্থান ও ভূমিকার পরিবর্তন ঘটে। নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন এখনও পর্যন্ত সর্দার সরোবর প্রকল্প বন্ধ

Scanned with CamScanner

করতে সক্ষম হয় নি। উচ্চতম আদালত সরকারের পক্ষে রায় দেওয়ার ফলে প্রকল্পটির নির্মাণকার্য আবার পুরোদমে শুরু হয়েছে। বড় বাঁধ বিরোধী নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন অনেকটাই স্তিমিত হয়ে এসেছে। বর্তমানে বাঁধের উচ্চতা এবং বাস্তুচ্যুত মানুষদের যথাযথ পুনর্বাসনের বিষয়-ই আন্দোলনের মুখ্য ইস্যু হয়ে উঠেছে। পরিশেষে বলা যায়, নর্মদা বাঁচাও আন্দোলনের সাফল্য সীমিত হলেও, এর তাৎপর্য ও গুরুত্ব হল এই যে, এই আন্দোলন অনুপ্রাণিত করেছে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে পরিবেশ ধ্বংসকারী উন্নয়ন প্রকল্পের বিরোধিতা করে গড়ে ওঠা একাধিক পরিবেশ আন্দোলনকে।

মৎস্যজীবীদের আন্দোলন

১৯৬০-এর দশকের গোড়া থেকে আমাদের দেশের মৎস্য-শিকার ভিত্তিক অর্থনীতিতে (fishing economy) কিছু লক্ষনীয় পরিবর্তন ঘটে। গভীর সমুদ্রে মাছ ধরার ক্ষেত্রে জোর দেওয়া হতে থাকে রপ্তানির ওপর, ব্যবহৃত হতে থাকে আধুনিক প্রযুক্তি। মৎস্য-আহরণ ও মৎস্য চাষ ক্রমে একটি শিল্প হিসাবে পরিগণিত হয়। সরকারের তরফ থেকে উদ্যোগ নেওয়া হয় অত্যাধুনিক প্রযুক্তি (ট্রলার ইত্যাদি) ব্যবহারের, যাতে গভীর সমুদ্রে মৎস্য আহরণের পরিমাণ অনেক বৃদ্ধি পায়। অধিক মুনাফা লাভ করাই প্রধান লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। দীর্ঘদীন ধরে এই প্রক্রিয়া অনুসরণ করার ফলে বিপন্ন হয়ে পড়েছে আমাদের দেশের সামুদ্রিক সম্পদ। ভারতে মৎস্যজীবীদের সংখ্যা আনুমানিক ৭ মিলিয়ন। এই জনসংখ্যার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ সামুদ্রিক মৎস্য আহরণের ওপর নির্ভর করে জীবিকা নির্বাহের জন্য। বাকিরা মৎস্য চাষ করে থাকে অন্য নানা ধরনের জলাভূমিতে। মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের অধিকাংশই অর্থনৈতিক দিক থেকে দুর্বলতর শ্রেণী। মৎস্য ব্যবসায় আধুনিক ও যন্ত্রভিত্তিক প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে ক্রমে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়েছে সনাতনি ও আধুনিক এই দুটি ক্ষেত্র। কিছু সংখ্যক মৎস্যজীবী – আর্থিকভাবে অধিকতর স্বচ্ছল যারা – রপ্তানি ভিত্তিক মৎস্যচাষ শিল্পের সুযোগ নিয়ে যথেষ্ট পরিমাণ মুনাফা অর্জন করতে সমর্থ হয়। কিন্তু অধিকাংশ দরিদ্র মৎস্যজীবী – যাদের পক্ষে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ও মেশিন ব্যবহার সম্ভব নয় তা অত্যন্ত ব্যয়বহুল বলে – ক্রমশ আবদ্ধ হয়ে পড়ে অভ্যন্তরীণ মৎস্য বাজার-এর ওপর। কমতে থাকে তাদের মৎস্য আহরণের পরিমাণ, ঘটতে থাকে। আর্থিক অবনতি।

১৯৭০ এর দশকে একাধিক সংঘাত ও সংঘর্ষ ঘটে এই দুই পক্ষের মৎস্যজীবীদের মধ্যে জলসম্পদের অধিকার ও বন্টনকে কেন্দ্র করে। মৎসজীবীদের দাবিদাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে সরকার Majumdar Comittee নামে একটি কমিটি গঠন করে। কমিটি প্রস্তাব করে Marine Fishing Regulation Bill। অন্যদিকে মৎস্যজীবীরা উদ্যোগ নেয় স্থানীয় ও রাজ্যস্তরে নিজেদের সংগঠিত করার। এর ফলে গঠিত হয় মৎস্যজীবীদের শ্রমিক সংগঠন। পরবর্তী সময়ে ১৯৭৯ সালে একাধিক মৎস্যজীবীদের সংগঠন একত্রিত হয়ে গড়ে তোলে 'National Fish Workers Forum'। এইভাবে

একটি সর্বভারতীয় সংগঠন তৈরি হয় মৎস্যজীবীদের স্বার্থরক্ষা করা এবং তাদের আন্দোলনকে সমর্থন জানানোর জন্য। ১৯৯০ এর দশকের গোড়ায় (১৯৯২) সংগঠিত হয় মৎস্যজীবীদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি আন্দোলন – "চিল্কা বাঁচাও আন্দোলন'। Chilka Matsyajibi Mahasangha এর নেতৃত্বে এই আন্দোলন গড়ে ওঠে চিল্কা হ্রদের জলসম্পদ বড় ব্যবসায়ী স্বার্থের প্রয়োজনে নির্বিচারে ব্যবহারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসাবে।

জল স্বরাজ আন্দোলন

এই আন্দোলন গড়ে উঠেছিল ১৯৮০-র দশকে রাজস্থানের আলোয়াড় জেলার গোপালপুরা গ্রামে জল সংরক্ষণ-কে কেন্দ্র করে। এই আন্দোলনের পুরোধা ছিলেন রাজিন্দর সিং।

গোপালপুরার প্রাকৃতিক পরিবেশ রুক্ষ ও শুষ্ক। বৃষ্টিপাতের পরিমাণ অত্যন্ত কম। যার ফলে ব্যাহত হয় কৃষিকাজ। গ্রামবাসীরা ভোগ করে অবর্ণনীয় জলকষ্ট। বিশেষত গ্রীষ্মকালে। এই প্রত্যন্ত গ্রামে আদিবাসী দরিদ্র নিরক্ষর মানুষের বসবাস।

রাজিন্দর সিং চিন্তাভাবনা শুরু করেন কীভাবে গ্রামের এই জলসঙ্কট দূর করা যায়, কীভাবে জল সংরক্ষণ করা যায়। গ্রাম প্রধান আদিবাসী মাঙ্গু বুড়োর কাছ থেকে তিনি জানতে পারেন জল সংরক্ষণের চিরাচরিত প্রাচীন পদ্ধতির কথা। যা এক সময়ে তাদের গ্রামেও চালু ছিল, কিন্তু যা এখন অব্যবহারে বিলুপ্তপ্রায়। তা হোল ছোট ছোট বাঁধ বা জলাধার তৈরি করে তাতে জল সংরক্ষণ করা – 'জল ভরা। ১৯৮৪ সালে রাজিন্দর সিং ও তাঁর সহযোগীরা মিলে গোপালপুরার রুখাশুখা মাটিতে মাটি ও পাথর দিয়ে ছোট ছোট জলাধার তৈরি করে তাতে জল ধরা শুরু করেন। কিছুদিনের মধ্যেই এর বিস্ময়কর ফল দেখা দেয়। গ্রামের কুঁয়োর জলস্তর অনেক বেড়ে যায়। গ্রামের পাশ দিয়ে যে শীর্ণকায় নদী বয়ে গেছে তা জলে ভরে ওঠে। বৃষ্টির জল সংরক্ষণের ফলে প্রায় মরুসদৃশ একটি গ্রাম শস্য শ্যামল হয়ে ওঠে।

গোপালপুরার এই ঘটনার কথা দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে আশপাশের গ্রামাঞ্চলে। বিভিন্ন জায়গায় শুরু হয় এই পরীক্ষা নিরীক্ষা। জল স্বরাজ আন্দোলন ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ে বিভিন্ন প্রান্তে।

উপরোক্ত আন্দোলনগুলি ছাড়াও আমাদের দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন সময়ে সংগঠিত হয়েছে আরও নানা গুরুত্বপূর্ণ পরিবেশ আন্দোলন। যেমন, গঙ্গা দূষণ-এর প্রতিবাদে বিহারে 'গঙ্গা মুক্তি আন্দোলন'; নির্বিচার খনন কার্যের বিরুদ্ধে খনি বিরোধী আন্দোলন (যেমন উড়িষ্যায় 'অ্যান্টি বক্সাইট' আন্দোলন ও ঝাড়খণ্ডের যাদুগোড়ায় ইউরেনিয়াম খনি বিরোধী আন্দোলন); মধ্যপ্রদেশে রাসায়নিক শিল্প স্থাপনের প্রতিবাদে 'অমরাবতী বাঁচাও অভিযান'; তামিলনাড়ুতে পরামাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের বিরোধীতা করে কুড়ানকুলাম আন্দোলন; পশ্চিমবঙ্গে সুন্দরবন, নয়াচর ও হরিপুর অঞ্চলে পরিবেশ আন্দোলন, ইত্যাদি।

Scanned with CamScanner

পরিবেশ আন্দোলনের যে নেতৃবৃন্দের কথা আমরা আগে উল্লেখ করেছি তারা ছাড়াও আরও অনেকে। – যেমন বাবা আমতে, সরলা বেন, মীরা বেন, বাঁকাবিহারী দাশ, চণ্ডীপ্রসাদ ভাট উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছেন আমাদের দেশের পরিবেশ আন্দোলনে। এঁদের নেতৃত্বে ভারতে পরিবেশ সংরক্ষণের বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব লাভ করেছে।

Scanned with CamScanner

MDC
Human Rights

দলিত আন্দোলন

দলিত আন্দোলনের আলোচনার শুরুতেই প্রথমে আমাদের জেনে নেওয়া দরকার দলিত বোঝাতে আমরা কাদের বুঝি। অন্যান্য বিস্তারিত সংজ্ঞা বাদ দিয়ে ১৯১১ সালের আদম সুমারি রিপোর্ট অনুযায়ী বলা যায়।

১। এরা ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব মানে না।

২। কোন উচ্চবর্ণের লোকেরর কাছ থেকে মন্ত্র বা দীক্ষা নেন না।

৩। ব্রাহ্মণের কর্তৃত্বকে স্বীকার করেন না।

৪। ব্রাহ্মণরা তাদের কোন সেবা করেন না।

৫। এদের কোন ব্রাহ্মণ পুরোহিত থাকে না।

৬। সাধারণ হিন্দু মন্দিরে এদের প্রবেশ অধিকার নেই।

৭। এরা মৃতদেহ কবর দেয়।

৮। এরা গোমাংস ভক্ষণ করে।

যদিও সরকারী ভাবে দলিতদের সংজ্ঞা প্রদানের ক্ষেত্রে এটিই সর্বপ্রথম প্রচেষ্টা তবুও পুরোপুরি স্পষ্ট ছবি আমরা এতে পাইনি। সাধু বাংলায় তফশিলী জাতিকে বলা হয় 'হরিজন' অর্থাৎ ঈশ্বরের সন্তান। ১৯৩৩ সালে মহাত্মা গান্ধী এই শব্দটির প্রবর্তন করেন। কিন্তু ব্রিটিশ যুগে এই হরিজনদের 'দলিত' বলে ডাকা হোত।

এই দলিতরা ভারতীয় জমসংখ্যা শতকরা ১৮ ভাগ। ২০০১ সালের আদমসুমারী অনুযায়ী তারা সংখ্যায় ১৬৮০ লাখ। এদের মধ্যে শতকরা ৩৬ ভাগ হচ্ছে শ্রমিক

যাদের মধ্যে শতকরা ৪৮ জন কৃষি শ্রমিক। এদের মধ্যে অনেক ঝাড়ুদার, মুচি, মেথর, ডোম প্রভৃতি আছেন। তবে উত্তর পূর্বাঞ্চলে এরা সংখ্যায় খুবই কম। পাঞ্জাবের চুরহা, রাজস্থানের ভাঙ্গিমেহতর, বাংলার হাড়ি প্রভৃতি জাত একই ধরণের এবং এরা অস্পৃশ্য। তবে দাক্ষিণাত্যে তারা আরো একধাপ এগিয়ে। তেলেগু মালা এবং তামিল পরায়ণ এক অপবিত্র অস্পৃশ্য জাত। এদের ছায়া মাড়ালেই মানুষ অপবিত্র হয়ে যাবে, এমনই ধারণা প্রচলিত ছিল।

নিম্নবর্ণিত লেখচিত্রের সাহায্যে হিন্দুসমাজে দলিতদের অবস্থান বোঝানোর চেষ্টা হয়েছে-

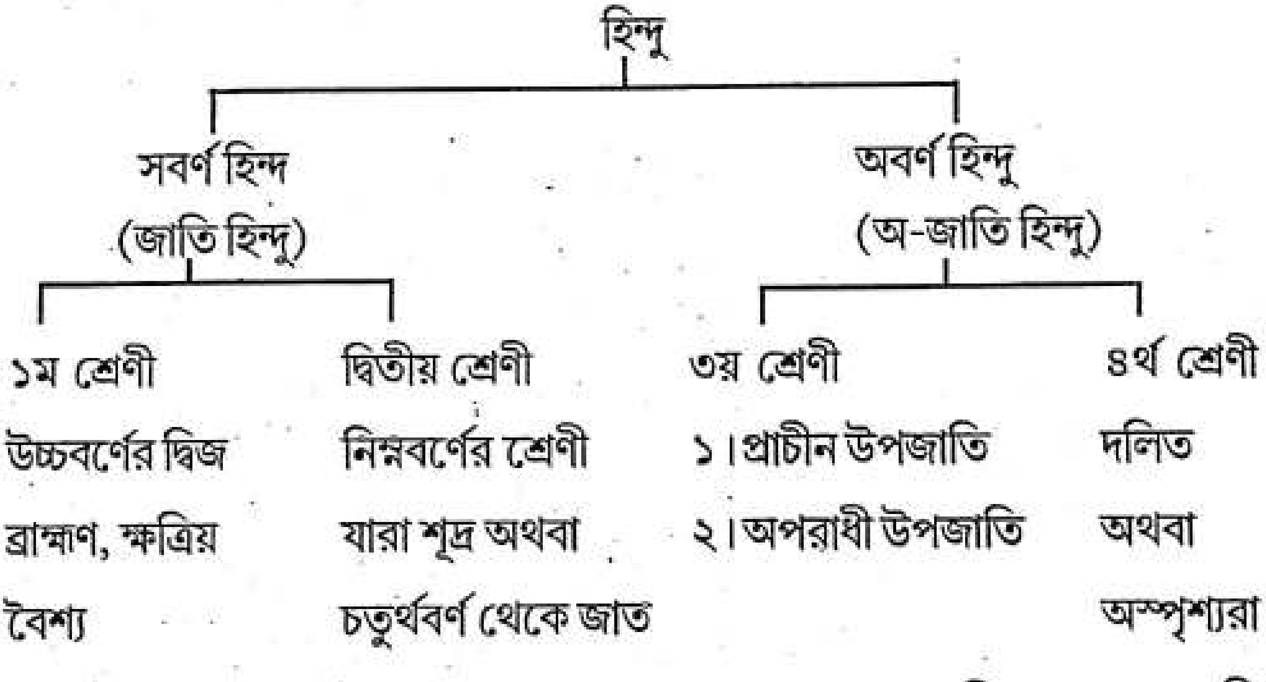

যাইহোক, এ প্রসঙ্গে একথাও মনে রাখা দরকার যে মনুস্মৃতি, কাত্যায়ন স্মৃতি নারদ অথবা নারদ স্মৃতি এরা সবাই দলিতদের প্রচন্ডভাবে পৃথক করেছেন এবং সম্মানের এতটুকু জায়গা তাদের জন্য রাখেননি।

Scanned with CamScanner

২। এরা গাছতলা অথবা কবর স্থানের পাশেই প্রধানত বসবাস করে।

৩। কুকুর এবং গাধা প্রধানত এই পশুরাই এই সব দলিত অন্ত্যজদের সম্পত্তি বলে গণ্য হবে।

৪। তারা লোহার গহনা পরবে এবং এক জায়গা থেকে আর এক জায়গা ঘুরবে।

৫। ধার্মিক কোন ব্যক্তি কখনও তাদের সংস্পর্শ আসবে না।

৬। তাদের খেতে দেওয়া হবে ভাঙা বাসনে।

৭। নিম্নবর্গের কোনো লোকের সাথে উচ্চবর্গের কারোর কোন যোগাযোগ থাকলে তাকে মৃত্যুদন্ড দেওয়া হবে।

অলবিরুণীর লেখাতেও চন্ডালদের উল্লেখ আছে। তিনি জাতব্যস্থায় মধ্যে পরে না এরকম দুই ধরণের জাতের লোকের কথা বলেছেন, প্রথম শ্রেণীর লোক হলো অন্ত্যজ, যাদের গ্রামের বাইরে থাকতে যেত যেমন, নাবিক, জেলে, শিকারী প্রভৃতি পেশার লোকজন।

এছাড়া আছে চন্ডাল ও ডোম। এই দুই শ্রেণীর লোকেরা গ্রামের আবর্জনা পরিস্কার করার কাজ করতো। ডোমের আর একটা কাজ ছিলো সেটা হল গান বাজনা করা।

বাংলায় চন্ডালরা নমঃশূদ্র হিসেবে পরিচিত। ১৯০১ সালের আদমসুমারী অনুযায়ী বাংলায় চন্ডালরা ছিলো বৃহত্তম জাত, যার সংখ্যা ছিলো কুড়ি লক্ষ। এদের অস্পৃশ্য হিসেবে মনে করা হতো। এরা সরকারি তফশীলের অন্তর্ভুক্ত। এদের আটটি বিভাজন ছিলো এবং এরা নিজেদের মধ্যেই খাওয়া দাওয়া ও সামাজিক আচরণ করতো। এরা কৃষি বা নৌ চালনার কাজে বিশেষভাবে দক্ষ ছিলেন।

১৯৫২ সাল থেকে ডোম, যারা চন্ডাল হিসেবেও পরিচিত, পশ্চিমবঙ্গে একটি অপবিত্র জাত হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। নৌকা চালনা, কৃষি এছাড়া ছুতোর মিস্ত্রী প্রভৃতি কাজে তারা নিযুক্ত ছিলেন। এছাড়া মূলত মৃতদেহ সৎকার, আবর্জনা পরিস্কার ইত্যাদি কাজও এরা করে থাকে। পাঞ্জাবের চুরহা, রাজস্থানের ভাঙ্গি মেতের বাংলায় হাড়ি এই ধরণের জাতগুলি একই ধরণের।

এছাড়া জাতকের গল্পেও এদের উল্লেখ পাওয়া যায়। উজ্জয়িনীর কাছে তক্ষশীলার গ্রামে বা নগরে তারা থাকত। তাদের জাতবৃত্তি ছিলো ঝাড়ু দিয়ে রাস্তা পরিস্কার করা।

বংশগত দিক দিয়ে বিচার করলে বলা যায় প্রায় সমস্ত দলিতদেরই উৎস অনার্য। তারা ইন্দো আর্য ভাষার কথা বললেও তাদের চেহারা এবং আচরণ ছিলো পূর্বপুরুষদেরই মতন।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ তাদের উদার কায়েমী স্বার্থসম্পন্ন মানসিকতা দ্বারা অবদমিত শ্রেণীগুলির উন্মেষের পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন। প্রতিষ্ঠানিক পরিবর্তন, সংস্কৃতিগত পরিবর্তন, ইংরাজী শিক্ষা, অর্থনৈতিক পরিবর্তন এগুলি সবই নিম্নবর্গের লোকেদের এগিয়ে চলার পথে সহায়তা করেছিলো।

প্রকৃতপক্ষে হিন্দুসমাজে মূলস্রোতে কিন্তু তাদের প্রচুর অবদান রয়েছে। সমাজের মূলস্রোতে অবস্থিত ব্যক্তিদের পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া পরিস্কার রাখা এবং যুদ্ধে প্রধান সেনার পদে প্রধানত তারাই থাকতেন তবুও তারা ছিলেন অস্পৃশ্য অবহেলিত।

একথা সত্যি যে পরিস্থিতির অনেক পরিবর্তন হয়েছে কিন্তু আশানুরূপ নয়। এখনও আমরা এই সব অবহেলিত অস্পৃশ্যদের প্রতি অত্যাচারের খবর পাই। বিশেষ করে তামিলনাড়ু ও মহারাষ্ট্রে। তবে বাংলায় এই প্রথার খুব একটা অস্তিত্ব দেখা যায় না, কারণ দেশভাগের পর যখন আমরা সবাই সংগ্রাম করে এদেশে এসেছি সেখানে আমরা জাতির উৎসকে মনে রাখে নি। দ্বিতীয়ত, এই বাংলাতেই আমরা পেয়েছি শ্রীচৈতন্য, রাজারামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর এবং শ্রীরামকৃষ্ণ-যাঁরা মানুষকে দেবতা হিসেবে জ্ঞান করেছিলেন। তৃতীয়ত বৌদ্ধ ধর্মের একটা ইতিবাচক প্রভাব আছে এই সমাজে যার ফলেও অস্পৃশ্যতার ধারণা এখানে দুর্বল। এবং সবশেষে বলা যায় স্বাধীনতার আগে ও পরে এদেশে কমুউনিষ্টদের প্রভাবে সাম্যর ধারণা প্রচলিত।

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে অনেকগুলি দলিত রয়েছেন। যেমন মহারাষ্টে, মহার মধ্যভারতের বালাশিস, তামিলনাড়ুতে পরিহাস, পনীনস মাহরন, ক্যানকাস ইত্যাদি কেরালা শহরে চন্ডাল, হাড়ি, ডোম, চামার, মেথর ইত্যাদি। সবচেয়ে বিস্ময়কর এই যে অস্পৃশ্যতাকে দূরে না সরিয়ে এই সব দলিতেরা তাদের নিজেদের মধ্যেই অস্পৃশ্যতাকে বজায় রাখেন যেমন ডোম অথবা বাগ্দী ভাঙ্গী অথবা চামারদের অস্পৃশ্য বলে মনে করেন।

দলিত আন্দোলনকে যদি আমরা জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে প্রাক্তন অস্পৃশ্যদের জেহাদ ঘোষণা বলি-তাহলে সেটি ব্রিটিশ শাসনের পূর্বে দেখা যায়নি এই ভাবেই

প্রতিফলিত হয়। যদি আমরা বিস্তারিত অর্থে বলতে চাই যে ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে অস্পৃশ্যদের ক্ষোভ ঘোষণা তাহলে জাতিভেদ প্রথার সাথেই এটির একত্রে অবস্থান হওয়া উচিৎ। অথবা আরেকভাবে আমরা এটিকে বলতে পারি জাতিভেদ প্রথার দ্বারা সৃষ্ট সেই আন্তসামাজিক বিচ্ছিন্নতা দলিত আন্দোলনে যার মূর্ত প্রকাশ।

প্রধানত সেই কারণগুলি যাকে কেন্দ্র করে দলিত আন্দোলন গড়ে উঠেছিলো Colonial এবং Post colonial সময়ে সেগুলি সাধারণত অস্পৃশ্যতাকে কেন্দ্র করে। এবং সেগুলি প্রধানত অস্পৃশ্যতা বিরোধী আন্দোলন অন্যান্য আন্দোলনগুলি সংগঠিত হয়েছিল কৃষি শ্রমিকদের দ্বারা তারা আন্দোলন করেছিলেন সরকারী কাজ এবং সংগঠনমূলক কাজ কর্মের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক সংরক্ষণের বিরুদ্ধে।

সামগ্রিক ভাবে দেখতে গেলে বলা যায় দলিত অথবা তফশিলী জাতির সামাজিক রাজনৈতিক অবস্থান নিয়ে প্রচুর লেখা হয়েছে। মহারাষ্ট্রের মাহার আন্দোলন সর্বভারতীয় আন্দোলন হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করলো। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে ডঃ আম্বেদকর যিনি জাতিতে মাহার ছিলেন একজন সর্বভারতীয় নেতা, কিন্তু মহারাষ্ট্রের বাইরে তিনি খুব একটা জনপ্রিয় হননি।

আম্বেদকর মনুস্মৃতিকে অস্বীকার করে একথা যে মনু এতজন সমাজতান্ত্রিক ছিলেন না, সেজন্য সমাজে তার প্রনীত নীতির প্রভাব কী সেকথা বোঝার মত দূরদৃষ্টি তার ছিল না। তিনি মনুস্মৃতিকে অবিচারের প্রতীক বলে মনে করেন যার দ্বারা সমস্ত দলিত সম্প্রদায় দলিত হয়েছে।

আম্বেদকর বিখ্যাত পুস্তক "Who were the Shudras" লিখে জ্যোতিবা ফুলের স্মৃতির উদ্দেশে উৎসর্গ করেন। জ্যোতিবা ফুলেকে তিনি বর্ণনা করেছেন 'আধুনিক ভারতের শ্রেষ্ঠ শূদ্র' বলে - যিনি নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের তাদের দাসত্ব সম্পর্কে সচেতন করে দিয়েছিলেন এবং তিনি এবাণীরও প্রচার করেছিলেন ভারতের পক্ষে বিদেশী শাসনের থেকে মুক্ত হওয়া অপেক্ষা সামাজিক গণতন্ত্র আরো অনেক বেশী প্রয়োজন।

Scanned with CamScanner

আম্বেদকর এই নীতির উপর ভিত্তি করে সমাজ পুনর্গঠনের কাজে নিজেকে নিযুক্ত করেছিলেন।

১। হিন্দুধর্মের একটি নির্দিষ্ট ধর্মগ্রন্থ থাকবে অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ যথা বেদ, পুরান, শাস্ত্র সেগুলিকে পবিত্র বলে গণ্য হবে না এবং তারা কোন নীতি চালু করতে পারবে না।

২। ব্রাহ্মণত্বে বংশানুক্রমিকতা থাকবে না। ব্রাহ্মণ পদে উত্তীর্ণ হবার জন্য তাদের পরীক্ষা দিতে হবে।

৩। "সনদ" ব্রাহ্মণের থাকবেনা তাঁর কোন পূজা অর্চনা অধিকারও থাকবেনা।

৪। পুরোহিত অবশ্যই রাষ্ট্রের ভৃত্য হবেন। এবং তাকে যে কোন ধরণের অন্যায় কাজের জন্য শাস্তি দেবার অধিকার থাকবে।

৫। রাষ্ট্রর প্রয়োজন অনুযায়ী পুরোহিতের সংখ্যা সীমিত থাকবে।

পরবর্তীকালে শ্রীমতী অ্যানিবেশান্তের সাথেও আম্বেদকরের কিছুটা মনোমালিন্য হয়েছিলো কারণ শ্রীমতী ব্যাসান্ত "The uplift of the Depresed class" নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছিলেন অবদমিত শ্রেণীর জন্য পৃথক বিদ্যালয় স্থাপনের কথা। কারণ তিনি মনে করতেন যে শিক্ষা অপেক্ষাও সুস্বাস্থ্য অধিক প্রয়োজনীয় এবং অপরিচ্ছন্ন ও অস্পৃশ্য ছেলেমেয়েদের সাথে পরিচ্ছন্ন পরিবারের সন্তানেরা একসাথে শিক্ষালাভ করলে তাদের বিভিন্ন ধরণের রোগ আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা থেকে যায়।

আম্বেদকারের All India Depressed Class Federation এই সবকিছুর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ১৯৩৭ সালে কংগ্রেস সরকারগুলি এই জাতগুলির উন্নয়নকল্পে কিছু কিছু কাজ করেন। বম্বের কংগ্রেস সরকার Bombay Harizon Temple Worship Act প্রণয়ন করে। হরিজনদের জন্য অবৈতনিক শিক্ষা চালু করলেন উত্তরপ্রদেশ সরকার ও বিহার সরকার।

প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় দলিত আন্দোলন একটি মুখ্য গণতান্ত্রিক আন্দোলন হিসেবে পরিগণিত। স্বাধীনতার পূর্বে এই জাতি বিরোধী আন্দোলনটি একটি শক্তিশালী অ-ব্রাহ্মণ আন্দোলন বলে পরিচিত ছিল। মহারাষ্ট্র এবং পাঞ্জাবের এটি দলিত আন্দোলন, উত্তরপ্রদেশ আদি হিন্দু আন্দোলন, বাঙলায় নমঃ শূদ্রের আন্দোলন, তামিলনাড়ুতে আদি দ্রাবিড় আন্দোলন বলে পরিচিত ছিলো। পরবর্তীকালে ১৯৭০

সালে একটি বিক্ষোভের সূচনা দেখা যায় এবং ১৯৭২ এ এটি দলিত প্যান্থার বলে আখ্যায়িত হলো। এই সময়ে সমগ্র দলিত এবং তাদের সংগঠন চলে এসেছে নেতৃত্বের সারিতে, তাদের সাথে রয়েছে অব্রাহ্মণ জাতি এখন যাদের আমরা বলি OBC অর্থাৎ অন্যান্য পিছিয়ে পড়া শ্রেণী।

এই দলিত এবং অব্রাহ্মণ আন্দোলনকে Anti Systematic আন্দোলন হিসেবে আখ্যা দেওয়া যায়। মার্ক্সীয় তাত্ত্বিকদের ভাষায় অথবা কর্মনির্বাহী তাত্ত্বিকদের মত অনুযায়ী এগুলি Value oriented movement বা Norm oriented movement এর বিরোধী। অর্থাৎ তারা ভারতীয় সমাজব্যবস্থার মূল কাঠামোকে পরিবর্তিত করতে চেয়েছিলেন। এদের মধ্যে অবশ্যই কিছু কিছু সংস্কারমূলক ধারা রয়েছে।

এই দলিত আন্দোলনকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় প্রাথমিক অবস্থায় এটি হলো সেই আন্দোলন যা হিন্দুধর্ম থেকে নিজেদের পৃথক বা স্বতন্ত্র করতে চেয়েছিলেন এবং যারা একটি সংহতির কথা ভাবছিলেন।

প্রাথমিক ক্ষেত্রে নেতৃত্বে আমরা দেখি হায়দ্রাবাদের ভাগ্যরেড্ডীবর্মা, দ্বিতীয়টিতে হায়দ্রাবাদের আরিয়ায় রামস্বামী এছাড়া নাগপুরে জি. এ. গভাই এর নাম উল্লেখযোগ্য। এবং সবকিছু ছাপিয়ে যার নেতৃত্ব অবশ্যই উল্লেখযোগ্য তিনি হলেন ভীমরাও রামজী আমবেদ্‌কর।

আমবেদ্‌কর প্রসঙ্গে বলতে গেলে বলা যায় যে ১৯১৭ সালে আমরা দেখলাম হিন্দুধর্মের পৃষ্ঠপোষকতার ক্রমাবনতি এবং একটি নতুন আন্দোলনের উত্থান যা দলিত আন্দোলন নামে পরিচিত। দেশে সেই সময় ১৯১৭-২০ সালের রাজনৈতিক সংকট।

যে তরুণ তুর্কী এই সময়ের আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন তিনি হলেন তরুণ স্নাতক ভীমরাও রামজী আমবেদ্‌কর। আমবেদ্‌কর এলফিনস্টোন কলেজ থেকে স্নাতক হলেন এবং পরবর্তী তিন বছর কলোম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় এবং এক বছর লন্ডন স্কুল অফ ইকোনমিকসে অধ্যায়ন করেন। তিনি কিছু দিনের জন্য বরোদার কাজ করেন এবং সেখানে তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে কাজ ছেড়ে দেন এবং সিদেহাম কলেজেং অধ্যাপনায় নিযুক্ত হন। উচ্চশিক্ষিত এবং সুবিন্যস্ত বলে সম্প্রদায় থেকে তাকে নেতা হিসেবে মনোনীত করা হয়।

মহারাষ্ট্রের উচ্চশ্রেণীরা তখন সংশোধিত হয়ে অস্পৃশ্যদের সমর্থন চাইলেন কিন্তু তাদের পরিকল্পনা সার্থক হোলনা। প্রথমসভা ১৯১৭ সালে যেটি চন্দ্রভারকরের নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত হয়েছিলো তারা আমবেদকরকে মহর স্নাতক বলে সম্মান জানাতে চেয়েছিলেন। আমবেদকর সেই সম্মান প্রত্যাখ্যান করেন।

দ্বিতীয় সভাটি বরোদার যেখানে আমরা বিপিনচন্দ্র পাল, প্যাটেল, লোকমান্য তিলক এবং শঙ্করাচার্য্য ও গান্ধীর টেলিগ্রাফ পাই। কিন্তু সেই সম্মেলনও সার্থক হয়নি। তৃতীয় সভাটি ১৯২৮ সালে ৫-৮ মে মাসে যখন আমরা কংগ্রেসের নেতৃত্বে অস্পৃশ্যতার দূরীকরণে সভা, যা বীজ পুরে অনুষ্ঠিত হয়েছিলো। সভাটিতে গান্ধীজি উপস্থিত থেকে যখন সম্মেলন উপস্থিত সমস্ত হরিজনদের হাত তুলে সমর্থন জানাতে বলেছিলেন বিস্ময়ে দেখা গেল একজনও হরিজন সেখানে উপস্থিত নেই। সেই সভাও বাতিল বলে ঘোষিত হলো।

এই ঘটনাগুলিকে পর্যালোচনা করলে বোঝা যাবে যে রাজনৈতিক ভাবে সচেতন সেই সব অস্পৃশ্যরা একথা বুঝলেন যে হিন্দুদের দ্বারা তারা ব্যবহৃত হচ্ছেন। এই সময় আমবেদকর বিকল্প নেতৃত্বের দাবী জানান প্রধানত তিনটি পদক্ষেপের দ্বারা প্রথমত, তিনি একটি দলিল পেশ করেন। দ্বিতীয়ত - ১৯২০ সালের দুটি সম্মেলনেই তিনি উপস্থিত হলেন এবং তৃতীয়ত- একটি পত্রিকা প্রকাশ করলেন যার নাম সূত্র নায়ক।

এরপর আসছে সেই ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণ ১৯১২ সাল দ্বিতীয় গোল টেবিল সম্মেলন পুনাচুক্তি এবং মহাত্মা গান্ধী।

দলিত আন্দোলনের ইতিহাসে ১৯৩০-১৯৩৬ সাল হচ্ছে একটি যুগান্তকারী ঘটনা। এই সময়েই গান্ধীর সঙ্গে আবার তার মনোমালিন্য হয় এবং বিখ্যাত সেই উক্তি "I have been born a Hindu but I will not die as a Hindu" এরপরই দলিত আন্দোলনের নেতা হিসেবে আমবেদকর স্বীকৃতি পান।

প্রধানত তামিলনাড়ু, কেরালা এবং পশ্চিমবঙ্গে দলিত সংগঠনের বিশ্লেষণ করলে বোঝা যাবে যে দলিত আন্দোলন একটি বহু বিস্তৃত আন্দোলন, নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তগুলি দলিত আন্দোলনকে কেন্দ্র করে নেওয়া যেতে পারে।

১। দলিত আন্দোলন শুধুমাত্র মহারাষ্ট্রেই নয় অন্যান্য অঞ্চলেও কিছু কিছু মাত্রার দলিত আন্দোলন হয়েছিল।

Scanned with CamScanner

২। এই আন্দোলনটি জাতি বিরোধীই ছিল জাতি সংস্কার মূলক নয়।

৩। শোষিত শ্রমিক কৃষক হিসেবে সর্বদাই অর্থ বা শ্রেণী তাদের কেন্দবিন্দুতে ছিল।

অর্থাৎ আমরা একথা বলবো যে এটি একটি প্রমাণিত সত্য যে স্বাধীন ভারতের সংবিধান নির্মাতাগণ দেশের দুর্বল শ্রেণীর প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিয়েছেন এবং তাদের বিকাশেরও নানান ব্যবস্থা করেছেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অন্তরযোজনা, ইত্যাদি। তবে, তা সত্ত্বেও দূর্বল শ্রেণীগুলির সমস্যার সমাধান ভালোভাবে হয়নি এছাড়া আমাদের সামাজিক বিধিনিষেধ তাদের এখনও সমাজের মূলস্রোতের প্রবাহিত হতে দেয়নি।

প্রকৃতপক্ষে যে প্রকার অস্তিত্ব যুগান্তব্যাপী তাকে শুধুমাত্র আইন প্রনয়ন করে বন্ধ করা যাবে না। তারজন্য এই ঘুনধরা সমাজের পরিবর্তন দরকার এবং দরকার সার্বিক শিক্ষার প্রচলন। এবং সেই ক্ষমতায় আসীন হবার জন্য দলিত শ্রেণীর পক্ষে প্রয়োজন নিরলস সংগ্রাম।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী ঃ

1. Ghosh G.K Shukla Ghosh, 1997, Dalit Women, APH Publishing Corporation.
2. Chanda Mauli V, 1994, B.R Ambedkar, Deep & Deep Publication
3. Tel Fumbde Anand, Theorising Dalit Movement Http#www.ambedkar.org/research.
4. Rao Ghanashyam. The Structure of south India Untouchable Caste, Sage.
5. Omvet Gail, Dalit and Democratic Revolution, Sage.

নারী আন্দোলন

ডঃ মল্লিকা সেনগুপ্ত

ভারতের নারী আন্দোলন সূত্রপাত হয়েছিল উনিশ শতকে, মার্কিন ও ইউরোপীয় নারী আন্দোলনের ধাক্কায় উজ্জীবিত পুরুষ সংস্কারকদের হাত ধরে। কিন্তু এই আন্দোলনে প্রকৃত জোয়ার এসেছে বিশ শতকের শেষ তিন দশকে যখন থেকে নারীবাদী কর্মসূচির ভিত্তিতে ভারতের নারী সংগঠনগুলি বিশেষভাবে সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। গত উনিশ শতক থেকে বিশ শতক পর্যন্ত কয়েক দশকে নারী জাগরণ ও নারীর সমানাধিকারের প্রয়োজনীয়তা সামাজিকভাবে যত স্বীকৃত হয়েছে, ততই আন্দোলনে ও অন্যান্য কাজে নারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ বেড়েছে। পূর্ব ও পশ্চিমের মেয়েদের সমস্যাগুলি অনেকাংশে আলাদা হলেও কিছু সর্বজনীন সমস্যায় তারা সমান অংশীদার এবং সেইকারনেই ভারতের নারী আন্দোলনের প্রতিটি পর্বের প্রেরণা হিসাবে পশ্চিমী নারী আন্দোলনের প্রভাব লক্ষ করা যায়।

পশ্চিমী নারী আন্দোলন ঃ

ঐতিহাসিকভাবে গড়ে ওঠা নানা মতের এক সম্মিলিত শক্তি নারীবাদ, যা নারীকে পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থায় পুরুষের অধীনে বিশেষভাবে পদানত একটি সামাজিক গোষ্ঠী বলে চিহ্নিত করে এবং সেই অবস্থায় অবসান করে সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে চায়। এই মানবী চেতনার প্রথম লিখিত প্রকাশ লক্ষ করা যায় ১৭০০ সালে মারি আস্টেলের 'সাম রিফ্লেকশনস আপন ম্যারেজ' শীর্ষক একটি লেখায়। তবে নারীবাদী আন্দোলনের প্রথম সংগঠিত প্রকাশ হয়েছিল ১৮৪০ সালে আমেরিকা ও ব্রিটেনের পার্লামেন্টে মেয়েদের দাবী পেশ করা এবং আইনের মাধ্যমে লিঙ্গসাম্য প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের

Scanned with CamScanner

মধ্য দিয়ে। মেয়েদের ভোটাধিকারের রক্তাক্ত লড়াই বহুদিন চলার পর অবশেষে ১৯১৮ সালে ব্রিটেনে এবং ১৯২০ তে আমেরিকায় বহু প্রতিক্ষিত সেই নাগরিক অধিকার তারা অর্জন করে। পরবর্তী তিন দশকে ইউরোপ ও আমেরিকায় নারীবাদী আন্দোলন কিছুটা স্তিমিত অবস্থায় থাকলেও সত্তর দশকে মেয়েদের উত্তাল, বিদ্রোহী উদ্দীপক লেখালেখির জোয়ারে প্রথমে পশ্চিমে এবং পরে সারা পৃথিবীতেই শুরু হয় বিপুল শক্তি ও বৈচিত্রে ভরা নারীবাদী আন্দোলনের এক আগুনঝরা পর্ব।

পশ্চিমী নারীবাদের সক্রিয় আন্দোলন ও তাত্ত্বিক বিকাশের ধারাকে তিনটি পর্বে ভাগ করা হয়।, ফার্স্ট ওয়েভ বা প্রথম তরঙ্গ, সেকেন্ড ওয়েভ বা দ্বিতীয় তরঙ্গ এবং সাম্প্রতিক বা তৃতীয় তরঙ্গ। কিন্তু প্রথম তরঙ্গের আনুষ্ঠানিকতায় অনেক আগে থেকেই শুরু হয়েছিল মেয়েদের সক্রিয়, লিখত প্রতিবাদের ইতিহাস। শুধু ইউরোপ আমেরিকাতেই নয়, ভারতে, এমনকি বাংলাতেও উন্মেষ ঘটেছিল সেই মানবীচেতনার, যার প্রমান ছড়িয়ে আছে আটের ও উনিশ শতকের বেশ কিছু দিশারী নারীর রচনায়। ১৭০০ সালে মারি আস্টেলের 'সাম রিফ্লেকশান আপন ম্যারেজ' এবং ১৭৭৬ সালে অ্যাবিগিল এডামসেব স্বামীর প্রতি লেখা একটি ঐতিহাসিক চিঠি মেয়েদের অধিকার চাওয়ার ক্ষেত্রে মাইলফলক হিসেবে কাজ করেছে। অ্যাবিগিল এডামসের স্বামী ছিলেন আমেরিকার ভাবী প্রেসিডেন্ট এবং সেই সময়ের এক প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতা। নারীবাদের প্রথম ঐতিহাসিক বই মেরি উলস্টোনক্র্যাফকটের লেখা 'এ ভিন্ডিকেশন অফ দি রাইটস অফ উইমেন' প্রকাশ হয় ১৭৯২ সালে। তিনিই প্রথম নারী যিনি স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেন, 'আমি পুরুষকে ভালবাসি আমার সহযোগী হিসেবে, কিন্তু তার শাশনদন্ড, বৈধ হোক বা অবৈধ, তা কখনই আমার প্রতি প্রসারিত হতে পারে না।' তেমনই উল্লেখযোগ্য ১৮৬২ সালে সোমপ্রকাশ পত্রিকায় প্রকাশিত স্ত্রীলোকের পরাধীনতা বিষয়ক বামাসুন্দরীর চিঠি বা ১৮৭৬ সালে লেখা রামসুন্দরী দেবীর আত্মকথা 'আমার জীবন'। ১৮৮০ সালে মারাঠি মহিলারা নিজেদের পৃথক সংগঠন তৈরী করে স্ত্রীশিক্ষা ও নারী অধিকার বিষয়ে সচেতনতা প্রসারের কাজ শুরু করেন এবং ১৮৮২ সালে নারী সম্বন্ধে পুরুষের হীন ধারণা ও অসম ব্যবহারের লিখিত প্রতিবাদ করেন কান্তিবাই কানিতকার। শিক্ষা ও চেতনায় পশ্চিমের তুলনায় ভারতীয় মেয়েরা যে প্রায় এক শতাব্দী পিছিয়ে ছিলেন তার কারণ ভারতীয় পুরুষদের কানে ইউরোপীয় উদারবাদ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র ও সাম্যের মন্ত্র অনেক দেরীতে পৌঁছেছিল।

Scanned with CamScanner

ঔপনিবেশিক ভারতে নারী আন্দোলনের সূত্রপাত ঃ

পশ্চিমী নারী আন্দোলনের তৃতীয় পর্বে তৃতীয় বিশ্বে নানা নারীবাদের উত্থানের মধ্যেই ভারতীয় পটভূমিতে, সমস্ত ভিন্নতা স্বাতন্ত্র ও নিজস্বতা নিয়ে গড়ে উঠেছে এই উপমহাদেশের নিজস্ব নারীবাদ। উপমহাদেশের ঐতিহ্যের মধ্যে নারীশক্তির যে সম্ভবনা বহুদিন ধরে প্রবল পিতৃতন্ত্রের ইঁটের তলায় চাপা পড়া ঘাসের মতো পড়ে ছিল, তার পুণরাবিষ্কার ও পুণরুত্থান শুরু হয় সুলতানা রাজিয়ার মসনদ আরোহণে, ঝাঁসির রানি লক্ষ্মীবাঈ -এর বীরত্বে, সিপাহী বিদ্রোহে ও স্বাধীনতা সংগ্রামে বিপুল নারীর অংশগ্রহণে, রামমোহন রায়ের সতীদাহ ও বাল্যবিবাহ বিরোধী অন্দোলনে, বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ ও স্ত্রীশিক্ষা প্রচলনের উদ্যোগে, উনিশ শতকের শেষ থেকে বিশের প্রথমার্ধে শিক্ষিত বাঙালী মেয়েদের অসংখ্য লেখা বিভিন্ন সাময়িক

Scanned with CamScanner

পত্রে প্রকাশ হওয়ার মাধ্যমে, সরোজিনী নাইডু বা এনি বেশান্তের মতো নারী নেতৃত্বের উদ্ভবে, মহারাষ্ট্রের মেয়েদের, বিশেষত পন্ডিতা রমাবাইয়ের স্বাতন্ত্রকামী আন্দোলনে এবং সর্বোপরি, স্বর্ণকুমারী দেবী ও বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের প্রতিবাদী কলমে নারীসচেতনতার মর্মস্পর্শী প্রকাশে ও আশাপূর্ণা দেবীর লেখায় নারী অভিজ্ঞতার উন্মোচনে। ব্রিটিশ পরবর্তী সময়ে উপমহাদেশের মেয়েদের আর্থ-সামাজিক অবস্থানের আংশিক পরিবর্তনের পেছনেও নারী আন্দোলন, সচেতন নারী লেখনীর বিস্তার ও নারীবাদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব অনস্বীকার্য।

উনিশ শতকের নারী আন্দোলনের প্রধান কর্মসূচী ছিল স্ত্রীশিক্ষার প্রসার, বাল্যবিবাহ ও বিধবাদের ওপর নিষ্ঠুরতা বন্ধ করার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে সচেতনতা এবং বহির্জগতে মেয়েদের অংশগ্রহণ। উনিশ শতকের শেষ থেকে বিশের প্রথমার্ধের মধ্যে মহারাষ্ট্রের সমাজ সংস্কারক নেত্রীরা এই আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন এবং বাংলার মেয়েরা অসংগঠিত একক প্রয়াসে সেইসময়ের একুশটি সাময়িকপত্রে প্রায় চারশতাধিক লেখায় বিভিন্ন বিষয়ে নিজেদের মতামত ও অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছিলেন।

একদিকে চলছিল স্ত্রীশিক্ষা ও বিধবাবিবাহ চালুর চেষ্টা আর অন্যদিকে তার প্রবল বিরোধিতা। শিক্ষিত নারীর বিয়ে হবেনা, হলেও বিধবা হবে, নারীত্ব নষ্ট হবে এরকম অনেক গুজব সেই সময়ে ছড়ানো হচ্ছিল। গোলাম মুরশিদ লক্ষ করেন, স্ত্রী শিক্ষার প্রসারে বাঙালি মেয়েরা প্রথমে কিছুটা দ্বিধান্বিত হলেও ক্রমশ উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এসে অনেকেই শিক্ষায় আগ্রহী হয়ে ওঠে এবং সার্বিকভাবে বাঙালি নারীর প্রতিকৃতি পাল্টাতে থাকে। পরিবারে ও সমাজে মেয়েদের ভূমিকারও ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটে। একদিকে নারীর আধুনিকীকরণের অনিবার্য শর্ত হিসেবে স্ত্রী শিক্ষার প্রসার আর অন্যদিকে আধুনিকতার এই ধারনার সঙ্গে ঐতিহ্যের বিরোধ চলতে থাকে। এর পর আধুনিকীকরণের দ্বিতীয় পর্বে অবরোধ থেকে মেয়েদের বের করে আনা শুরু হয়। কিন্তু মেয়েরা বাইরে পা রাখতেই পুরুষেরা অস্বস্তিতে পড়লেন। মুরশিদের মতে, কিছুদুর পর্যন্ত স্ত্রী স্বাধীনতার উৎসাহ দেওয়ার পর বাঙালী ভদ্রলোকেরা পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে দেখে অস্বস্তি বোধ করতে শুরু করলেন এবং হঠাৎ চুপ করে গেলেন। সুমিত সরকারের ভাষায়, সেই সময়ের সমাজ সংস্কারকরা 'সীমায়িত ও নিয়ন্ত্রিত স্ত্রী স্বাধীনতায়' বিশ্বাসী হলেও পরিবারের মধ্যে নারীর শুদ্ধ, সতী, পতিব্রতা, কল্যাণী মূর্তির প্রথাগত ধারণায় আস্থাশীল ছিলেন। প্রকাশ্যে কর্মক্ষেত্রে নারীর পা দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা তারা সমর্থন করেননি। অধিকাংশ সংস্কারক নারী ও পুরুষের

Scanned with CamScanner

আলাদা কর্মজগতে আস্থাশীল ছিলেন, মেয়েদের উচ্চাকাঙ্খার সমর্থক ছিলেন না। তারা চেয়েছিলেন এমন শিক্ষিত সহধর্মিনী যারা স্বামীর বশ ও নির্ভরশীল থাকবে এবং স্বামীর দোষবা অন্যায়ের সঙ্গে মানিয়ে নেবে। মুরশিদের মতে, এই কারনেই উনিশ শতকে নারীর অগ্রগতিতে পুরুষের যে অগ্রণী ভূমিকা ছিল বিশশতকে নারীর সমানাধিকারের সোচ্চার দাবীর পাশে আর তা খঁজে পাওয়া যায়নি।

উত্তর ঔপনিবেশিক ভারতের নারী আন্দোলন ঃ

উনবিংশ শতকে পুরুষ সমাজ সংস্কারকদের হাত ধরে নারী জাগরণের সূত্রপাত হলেও বিশশতকের সত্তরদশকের মাঝামাঝি থেকে নারীবাদী কর্মসূচির ভিত্তিতে ভারতের নারী সংগঠনগুলি বিশেষভাবে সক্রিয় হয়ে ওঠে। স্বাধীনতার আগে মহাত্মা গান্ধীর ডাকে বহু মহিলা স্বদেশী সংগ্রামে অংশ নিয়েছেন এবং স্বাধীনতার পর থেকে রাজনৈতিক দলগুলির মহিলা শাখাগুলি সক্রিয় হয়ে নারীর ভোটাধিকার ও সংসদে উপস্থির দাবী তোলে। যদিও এই পর্বে সংস্কারমুখী নারী আন্দোলনে মেয়েরা ক্ষমতাকাঠামোকে চ্যালেঞ্জ না করে পূর্বপ্রচলিত শাস্ত্রীয় অধিকারগুলির পুনঃপ্রচলন চাইছিল। পাশাপাশি সশস্ত্র স্বাধীনতা যুদ্ধ, অহিংস আন্দোলন, নানা আদিবাসী অআন্দোলন, তেভাগা ও তেলেঙ্গানা আন্দোলনে মেয়েদের অংশগ্রহণ তাদের ভূমিকা সম্বন্ধে নতুন ধারণা দিচ্ছিল। ১৯৫৪ -এ বামপন্থী দলের শাখা হিসেবে ন্যাশানাল ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান উইমেন (এন এফ আই ডব্লু) প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য আন্দোলনের একটা নতুন দিক উন্মোচিত হলো, শহরে মধ্যবিত্ত শ্রেণির মহিলাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে এই নারী আন্দোলন গ্রামগঞ্জে, কলকারখানায়, চাষের ক্ষেতে সাধারণ অশিক্ষিত মহিলাদেরও আন্দোলনের আওতায় আনতে থাকে। পশ্চিমবঙ্গের নারী আন্দোলনের ইতিহাসে রাজনৈতিক উত্থানপতনের একটা বড় ভূমিকা আছে। ব্রিটিশদের রাজধানী হওয়ার সুবাদে উনিশ শতকের সংস্কার আন্দোলনের বেশিটাই এখানে শুরু হয়। বাঙালি মেয়েরা স্বদেশী আন্দোলনে সক্রিয় অংশ নেয় এবং স্বাধীনতার পরেও তেভাগা আন্দোলন (১৯৪৬-৪৭), খাদ্য আন্দোলন (১৯৬০) ও ১৯৬৯-৭০ -র নকশাল বিপ্লবে তাদের সক্রিয় ভূমকা লক্ষ করার মতো। ১৯৬৭ .-এ বামপন্থী রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় আসে এবং বামদলের মহিলা শাখাগুলি মধ্যবিত্ত ভদ্রমহিলার পরিধি ছাড়িয়ে গ্রামগঞ্জে, কলকারখানায়, চাষের ক্ষেতে সাধারণ অশিক্ষিত মহিলাদেরও আন্দোলনের আওতায় আনে এবং তাদের স্বার্থের কথা দাবীসনদে প্রতফলিত হয়।

Scanned with CamScanner

ভারতের নারী আন্দোলনে নতুন জোয়ার আসে সত্তরের মাঝামাঝি সময়ে। নানা কারণে ঐ সময় থেকেই সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে প্রান্তিক ও অবহেলিত নারীদের অবস্থার উন্নতির জন্য বিভিন্ন আন্দোলনের কর্মসূচি ও পরিকল্পনা শুরু হয়। ১৯৭৪ -এ আন্তর্জাতিক নারী দশক ঘোষণার ঠিক আগে ইউনাইটেড নেশনস বা বিশ্ব জাতিসংঘের অনুরোধে, ভারত সরকারের 'স্ট্যাটাস অফ উইমেন কমিটি' ভারতের মেয়েদের অবস্থার ওপর গবেষণার ভিত্তিতে প্রকাশ করে 'টুয়ার্ডস ইকোয়ালিটি', যা মেয়েদের প্রান্তিকীকরণ সম্বন্ধে সবার চোখ খুলে দেয়। জাতসংঘ থেকে ১৯৭৫ কে বিশ্ব নারীবর্ষ ও ১৯৭৫-৮৫ কে আন্তর্জাতিক নারী দশক ঘোষণা করার ফলেও নারীর অধিকারের জন্য আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা নতুন করে উঠে আসে। ১৯৭৪ -এ বম্বের এস এন ডি টি বিশ্ববিদ্যালয়ে চালু হয় আদিবাসী কিশোরীর বিরুদ্ধে রায় দিলে মেয়েদের অধিার রক্ষার ক্ষেত্রে রায়ের বিরুদ্ধে দেশজোড়া আন্দোলন শুরু হয়। তৈরী হয় ঐতিহাসিক বিশাখা আইন। এর ফলে সুপ্রিম কোর্টের লিঙ্গবৈষম্যবাদী দৃষ্টিকোন উন্মোচিত হয় ও ধর্ষণ আইন পরিবর্তিত হয়। মুখ বুঁজে মার সহ্য করার বদলে নারীর সরব হওয়ার প্রায়োজনীয়তা প্রতিষ্ঠিত করে চলেছে নারী সংগঠনগুলি।

সত্তর দশকের মাঝামাঝি থেকে ভারতীয় নারী সংগঠনগুলি নারীর কোনঠাসা অবস্থার জন্য সরাসরি পিতৃতন্ত্রকে দায়ী করতে শুর করে, যা এই আন্দোলনকে বিশ্বব্যাপী নারী আন্দোলনের সঙ্গে একসূত্রে যুক্ত করে। যখন ১৯৭৪ -এ হায়দ্রাবাদের প্রোগ্রেসিভ অরগানাইজেশন ফর উইমেন ও ১৯৭৫ -এ মহারাষ্ট্রের দলিত সমতা সৈনিকদল নারী নিপীড়নের কারণ হিসেবে সমাজের পিতৃতান্ত্রিক কাঠামো ও লিঙ্গশোষণকে চিহ্নিত করে, তখন থেকেই ভারতের নারী আন্দোলনের তাত্ত্বিক দিকনির্ণয় শুরু হয়। (কুসুম দত্ত, উইমেন স্টাডিজ অ্যান্ড উইমেনস মুভমেন্ট ইন ইন্ডিয়া, এসিয়াটিক সোসাইটি অফ ইন্ডিয়া, ২০০৭, পৃ-১৩৪-১৭৩)। এর সঙ্গে চোখে পড়তে থাকে বিভিন্ন সামাজিক আন্দোলন ও বিক্ষোভে বিরাট সংখ্যায় নারীদের অংশগ্রহণ। গুজরাট ও মহারাষ্ট্রে ব্যাপক খরা, দুর্ভিক্ষ, শস্যহানি ও দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে অনেকগুলি নারী সংঘ সংগঠিত হয়। এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয় বিহারের জয়প্রকাশ নারায়নের সর্বোদয় আন্দোলন ও বিনোবা ভাবের ভূদান আন্দোলন। সর্বোদয় মহিলাদের ছোট ছোট স্বয়ংসম্পূর্ণ সমবায়গোষ্ঠী গড়ে তুলতে সাহায্য করে। মহারাষ্ট্রের ভিল সম্প্রদায়ের মহিলারা জমি কেড়ে নেওয়ার প্রতিবাদে শ্রমিক সংগঠন নামে সমবেত হয়ে জঙ্গী আন্দোলনে অংশ নেয়। অন্ধ্রপ্রদেশে তেলেঙ্গানা আন্দোলনের

Scanned with CamScanner

ও তার পরবর্তী ঘেরাও, মিছিল হরতালেও মহিলাদের অংশগ্রহণ ছিল চোখে পড়ার মত। রাষ্ট্রের দমননীতি ও মূল্যবৃদ্ধির প্রতবাদে এইসময়ের আন্দোলনগুলিতে মেয়েদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের পেছনে সরাসরি কোল নারীবাদী দাবী না থাকলেও এই বিপুল প্রকাশ পরবর্তীকালের নারীর প্রতি হিংস্রতা বিরোধী আন্দোলনের ভিত প্রস্তুত করেছিল। ১৯৭৫-এ জরুরী অবস্থা ঘোষিত হলে রাষ্ট্রীয় দমননীতির বিরুদ্ধে নাগরিক আন্দোলনেও নারীশক্তি অগ্রনী ভূমিকা নেয়।

সত্তরের নারী আন্দোলন ছিল প্রধানত হিংস্রতার বিরুদ্ধে। গার্হস্থ্য হিংসা জাতপাতের হিংসা, হিংস্র সাম্প্রদায়িকতার আক্রমণের মূল শিকার মেয়েরা। এমনকি বিজ্ঞান প্রযুক্তির হিংস্রতাও নারীর বিরুদ্ধে কাজ করে। প্রজনন ও জন্মনিয়ন্ত্রণ সক্রান্ত অধিকাংশ পরীক্ষানিরীক্ষার গিনিপিগ হিসেবে ব্যবহার করা হয়। জন্মনিরোধের প্রযুক্তি অধিকাংশক্ষেত্রে মেয়েদের শরীরের ওপরেই প্রয়োগ করা হয়। ভ্রুণের লিঙ্গনির্ণয় প্রযুক্তি মেয়েদের ব্যবহার হয় কারণ এর মাধ্যমেই বেছে বেছে কন্যাভ্রুণহত্যার প্রশ্রয় পায়। নারীর প্রতি এই ক্রমবর্ধমান হিংস্রতার বিরোধিতাই সত্তরের নারী আন্দোলনের প্রথম অ্যাজেডা হয়ে ওঠে। কিন্তু আশির দশকে বিভিন্ন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এই আন্দোলনের ক্ষেত্র ক্রমশ আরো প্রসারিত হয়েছে। ১৯৮৪ -র দিল্লি দাঙ্গা, ১৯৯২ -এর বাবরি মসজদ ধ্বংস ও ২০০২ -এর গুজরাট দাঙ্গার পরবর্তী ত্রাণবন্টন, নথিকরণ, গণমাধ্যমে প্রচার ও সচেতনতা তৈরির ক্ষেত্রে নারী সংগঠনগুলি অগ্রণী ভূমকা নেয়। দাঙ্গায় ধর্ষিতা মেয়েদের আইনি লড়াই ও মানসিক সমর্থন জোগানোর ক্ষেত্রেও তাদের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। সসদে ৩৩ শতাংশ সংরক্ষণের জন্য প্রস্তাবিত মহিলা বিলের সমর্থনেও রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক বিভিন্ন সংগঠন ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন শুরু করে, যদিও এই দাবী এখনো আদায় করা যায়নি। সাম্প্রতিককালের নারী আন্দোলনের দুটি প্রধান অ্যাজেন্ডা হল সাম্প্রদায়িকতা ও বিশ্বায়নের চাপের বিরুদ্ধে লড়াই কারণ এই দুটি চাপে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় মেয়েরাই।

নারী আন্দোলনের প্রভাবে গত একশো বছরে এবং বিশেষত গত তিন দশকে ভারতীয় মেয়েদের যে বিপুল অগ্রগতি হয়েছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। অন্দরের সব কাজ সামলেও বহির্জগতে মেয়েরা এখন পুরুষের সঙ্গে সমান তালে পা মিলিয়ে চলেছে, যদিও সেই সমকক্ষ মেয়েদের সংখ্যা খুব কম। শতাশের হিসেবে আজো শিক্ষায়, স্বাস্থ্যে, নিরাপত্তায়, কর্মক্ষেত্রে পুরুষের তুলনায় ভারতীয় নারী অনেক পিছিয়ে। তাই ভারতীয় সমাজে গতিময় নারী আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা আজও খুব বেশি।

Scanned with CamScanner